প্রবোধকুমার সান্যাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

প্রিয় বান্ধবী

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রণীত

প্রিয় বান্ধবী	৪৲
নিশি-পদ্ম	২.৫০
দিবাস্বপ্ন	২৲
অবিকল	১.২৫
কলরব	২৲
তরুণী-সঙ্ঘ	২৲
নবীন যুবক	১.৫০
ঘুম ভাঙার রাত	.৫০
দুই আর দু'য়ে চার	২.৫০
কয়েক ঘণ্টা মাত্র	২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১, বিধান সরণী,

কলিকাতা—৬

কলিকাতা নগরীর প্রান্তে শীতের সূর্য অস্ত যাইতেছিল। চারিদিকে কুয়াশার সহিত ধোঁয়া মিশিয়া ইহারই মধ্যে ঘোরালো অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। কোথাও আলো জ্বলিয়াছে, কোথাও জ্বলে নাই। দূর হইতে শহরের অস্পষ্ট কলরোল ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

ঘরের মধ্যে একটু-একটু করিয়া অন্ধকার দল পাকাইতেছে। একটি দরজা ও একটি মাত্র জানালা—জানালাটি খোলা। তাহারই বাহিরের মুখ করিয়া জহর চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। হাওয়ার চলাচল নাই, অন্ধকারে মশার উৎপাত, ইতিমধ্যে অনেকবার এপাশ-ওপাশ করিয়াছে, এইবার চোখ ছাড়াইয়া উঠিয়া বসিল। বসিল বটে কিন্তু ঘুমের নেশা না কাটাইতে পারিয়া আব একবার সে ঠাণ্ডা দেওয়ালের গায়ে কাৎ হইয়া শুইল। শীতের ঠাণ্ডায় হাত-পা-গুলা তাহার তখনও কন্-কন্ করিতেছে, ঘুমাইয়াও সেগুলি গরম হয় নাই। ঠিক অমনি করিয়া বসিযা কতক্ষণ নাক ডাকাইযা এক সময় সে চোখ খুলিয়া চাহিল। চাহিযা প্রথমেই মনে হইল, আজ সে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে।

ছেঁড়া জামার সেলাই করা পকেটে হাত ঢুকাইয়া অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া সে আধখানা পোড়া সিগারেট বাহির করিল। জীবনে সে পুরা একটি সিগারেট কখনও এক সঙ্গে খায় নাই। অন্য পকেটে হাত দিয়া সে একটা দেশলাই বাহির করিল, কিন্তু হাত নাড়া দিয়া দেখিল তাহার মধ্যে একটি মাত্র কাঠি খড়্-খড়্ করিতেছে। এই কাঠিটি খরচ করিয়া ফেলিয়া সিগারেট ধরাইতে তাহার ভরসা হইল না। এখনও সমস্ত রাত্রি বাকি!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পায়ের শব্দ পাইয়া একটা বড় ই"

মুড়িগুলা ভাল নয়, নরম হইয়া গেছে, মাটির দুর্গন্ধ মাখা, চিবাইতে গেলে দাঁতে জড়াইয়া যায়, বমি উঠিয়া আসে। রাস্তার উপর জহর সেগুলি ছড়াইয়া দিল। সুস্বাদু খাদ্য যখন আহারের অযোগ্য হয় তখন সে নরক। কিন্তু উপবাস করিয়া তাহার চলিবে আর কেমন করিয়া? আর কতদিন? জহরের রাগ হইল না, জগৎটা যে অত্যন্ত কৌতুকময় এ ধারণা তাহার হইয়াছে। বাস্তবিক পৃথিবীতে বাস করা আজকাল অতি সহজ, কারণ মানুষ সহজ হইয়া বাঁচিতে ভুলিয়া গেছে।

একটা পানের দোকানের সুমুখ দিয়া পার হইয়া যাইবার সময় সে একবার আয়নাটা দেখিয়া লইল। কিছুদূর গিয়া মুখের উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, মুখ তাহার দাড়িতে ভরিয়া গিয়াছে। মনে হইল, মুখখানিতে তাহার আর স্বাস্থ্য নাই, চোখের কোল বসিয়াছে, শুষ্ক শীর্ণ মুখের জৌলুস চলিয়া গিয়াছে। নিজের মুখখানার উপর তাহার মমতা হইল। নিজেকে একদা সে সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসিত।

কে যেন তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল। মুখ ফিরিয়া তাকাইয়া জহর হাসিয়া ফেলিল। বন্ধুটি কহিল, 'অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলে হে?'

জহর বলিল, 'ভাবছিলাম, পূর্বস্মৃতি আলোচনা ক'রে মানুষ সান্ত্বনা পায় কি না।'

'সাবাস্। কোথায় চলেছো?'

'এই তোমাদের এখানেই। আজ খেলা হবে না?'

বন্ধুটি সভয়ে বলিল, 'চুপ, পুলিশের নজর আছে। খেলা অনেকক্ষণ শুরু হয়েছে। তোমার বুঝি—'

'হ্যাঁ, নেশা লেগে গেছে। মন কেবল মন্দ কাজ খুঁজে বেড়ায়।' জহর পুনরায় কহিল, 'চল।'

ফুটপাত কাটিয়া দুইজনে একটা অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে

কিলের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রবেশ করিল। কিছু দূর গিয়া আর একটা সুড়ঙ্গের মতো পথ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কলিকাতা শহর যেন ভোজবাজীর মতো মিলাইয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া একটা চালার মধ্যে ঢুকিলে প্রথমেই সেই ভিখারী-বুড়িকে দেখা যায়. বুড়ির সঙ্গে ইহাদের চুক্তি আছে, মাসে একটাকা করিয়া বক্‌শিস্ পায়।

একটা কেরোসিনের ডিবে মাঝখানে রাখিয়া তাহার চারিদিকে কয়েকজন লোক বসিয়া বসিয়া তাসগুলি নাড়া-চাড়া করিতেছিল, পায়ের শব্দ পাইয়া হঠাৎ তাহারা কয়েক মুহূর্ত থামিয়া গেল। পরে সুমুখে ইহাদের দুইজনকে দেখিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইয়া আবার গোলমাল শুরু করিল। ঘরের ও-কোণে আর একটি কেরোসিনের ডিবে রাখিয়া জন-চারেক লোক একটা ফুটো হাঁড়ি ও গোটা-কয়েক কড়ি লইয়া খেলিতে বসিয়াছিল। হাঁড়ি-খেলাটা জহর ভাল করিয়া শিখিতে পারে নাই। বিড়ি ও গাঁজার ধোঁয়ায়, কেরোসিনের ভূষোয়. ময়লা কাপড় ও গায়ের দুর্গন্ধে ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। তাস খেলার কাছে আস্তে আস্তে জহর বসিয়া গেল। নিঃসঙ্কোচে দুষ্প্রবৃত্তির কাছে আত্মদান করিতে তাহার কোনদিন আটকায় নাই।

রোসেদ মিঞা কহিল, 'কি জোহরবাবু. প'সা কড়ি এনেছ ? বসে' যাও চেপে। ক'টাকা আছে ?'

জহর কহিল, 'টাকা নেই, দুর্ভাগ্য আছে।' বলিয়া হাসিল।

রোসেদ মিঞা অত বুঝিল না, কিন্তু বুঝিবার ভাণ করিয়া বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িল।

কানাই মিস্ত্রি কহিল, 'জহর, বসে যা।'

জহর বলিল. 'আজ স্রেফ্ পকেট খালি।'

'ধারে খেলে যা এক হাত।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'ধারে খেলা আর ধারে খাওয়া—এর পয়সা কিন্তু শোধ দিতে ইচ্ছে হয় না।'

বাঁ-দিকে গায়ে গা ঘেঁসিয়া পানওয়ালা বিরিজলাল বসিয়াছিল, সে একটা অশ্লীল মন্তব্য করিয়া জহরকে টানিয়া খেলিতে বসাইল।

খানিকক্ষণ খেলার পর ক্ষুধায় জহরের আর ধৈর্য রহিল না। দুইবার হারিয়া একবার সে জিতিয়াছে, এইবার একেবারে মোটা-রকম দুই আনা সে জিতিল। দু' আনিটি কানাই মিস্ত্রির নিকট হইতে লইয়া সে উঠিয়া পড়িল। সবাই জুয়াখেলায় মত্ত, জহর আর ফিরিয়া চাহিল না। সকল খেলাতেই তাহার মোহ আছে কিন্তু মমতা নাই—সকলের অলক্ষ্যেই সে দরজা পার হইয়া আসিল। পাশেই বুড়ি ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখের উপরকার কাঁথা সরাইয়া কহিল, 'কে যাচ্ছ ?'

জহর কহিল, 'আমি গো বুড়িমা।'

'হার না জিত ? পয়সা দাও—চার আনায় দু'পয়সা।'

'হার হয়েছে যে ?'

'রোজ-রোজ তোমার হার হয় গা ?'

'রোজ নয়, চিরদিন।' বলিয়া হাসিয়া জহর অন্যপথে অন্ধকারে আঁকিয়া বাঁকিয়া বাহির হইয়া আসিল।

রাত বোধ করি বেশি হয় নাই। পকেটের মধ্যে ফেলিয়া চৌকা দু' আনিটি জহর বার-বার অনুভব করিয়া দেখিতেছিল। আজিকার রাত্রি তাহার চোখে সুন্দর ও সুখদায়ক মনে হইতে লাগিল। দুইদিন তাহার পরমানন্দে চলিয়া যাইবে। গোপাল সরকারের হোটেলের কথা মনে করিয়া তাহার মুখের মধ্যে জল আসিয়া পড়িল। কি কি খাইবে হিসাব করিতে করিতে সে অগ্রসর হইয়া চলিল। বড় রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া লোকজন যেন তাহাকে ঘিরিয়া নাচিতে-নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, আনন্দে জহরের গা রোমাঞ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিল। ভাত কিম্বা পুরি—কোনটি খাওয়া সমীচীন তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। ভাত এবং

তরকারী সুস্বাদু সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরি গুরুপাক, জীর্ণ হইতে দেরী লাগে। সুস্বাদের চেয়ে গুরুপাকেই তাহার বেশি প্রয়োজন জহর একটা খাবারের দোকানে আসিয়া উঠিল।

এক আনার উপর আর একটি পয়সা হিসাব করিয়া সে আহার সমাপ্ত করিল। হাত ধুইয়া দোকানের ছোট রেকাব হইতে কাটা-সুপারী তুলিয়া লইতেই কে একজন কহিল, 'ঠাকুরমশাই, চিন্‌তে পারেন?'

জহর মুখ তুলিল। লোকটার দিকে তাকাইয়া কহিল, 'কে বল ত?'

লোকটা কহিল, 'বোম্বে গিয়েছিলেন না আপনি? সেই ধর্ম-শালায় দেখা হয়েছিল? আপনি ত জাহাজে কাজ করতেন।'

জহর শুধু বলিল, 'তোমার খবর ভাল?' বলিয়া পকেট হইতে দু' আনিটি বাহির করিয়া ম্যানেজারের টেব্‌লের উপর রাখিল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল। আমি এই দোকানে চাকরী করি।' বলিয়া সে জহরের আপাদমস্তকের দিকে একবার চোখ বুলাইয়া আবার নিজের কাজে চলিয়া গেল।

'দোয়ানিটা চল্‌বে না মশাই, বদ্‌লে দিন।'

জহর চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইল। তারপর দু'আনিটি হাতে করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'চল্‌বে না? এই যে নিয়ে এলাম। ভয়ে তাহার পা দুইটা যেন ভারী হইয়া উঠিল। পেটের মধ্যে খাবারগুলি হঠাৎ যেন জীবন্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

'নকল দোয়ানি মশাই, বদ্‌লে দিন না?

'নকল? নকলই ত চলে বেশি।'

ম্যানেজার কহিল, 'পয়সাকড়ির বেলায় নয়। ওটা সবাই বাজিয়ে দেখে।'

জহর একটু কৌতুক অনুভব করিল। বলিল, 'যারা বাজায় তারা প্রায়ই বাজে না!'

ম্যানেজারের অত কথা বলিবার সময় নাই, দোকানে ভিড় হইয়াছিল। বলিল, 'কত হয়েছে আপনার?'

'পাঁচ পয়সা। কিন্তু দোয়ানিটি ছাড়া আর আমার কাছে কিছু নেই মশাই।'

'তার মানে? আপনি অচল দোয়ানি নিয়ে দোকানে বসে খেতে এলেন?'

জহর হাসিয়া কহিল, 'তাই ত এসেছিলাম দেখ্‌চি। হায় রে লটারির পয়সা!'

'তা হ'লে কি করবেন এখন? ও দোয়ানি আমি নেবো না।'

'বেশ ত, আমিও দিতে চাচ্ছি নে।'

আগেকার পরিচিত লোকটি সেখান হইতে তখন ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। ম্যানেজার কহিল, 'ধার আমরা রাখি নে; কাল মনে ক'রে দিয়ে যাবেন। আপনি ত প্রায়ই এখান দিয়ে যাতায়াত করেন।'

জহর দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পথে নামিয়া না হাসিয়া সে থাকিতে পারিল না। দু' আনিটি বাহির করিয়া আর একবার সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল; এই মুদ্রাটি যে আত্মবিক্রয় করিয়া তাহার উদরপূর্তি করে নাই, এজন্য সে খুশি হইল। আত্মবিক্রয় করিয়া উদরপূর্তি করা এখনকার রীতি।

ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। তুহিন শীতল রাত্রি, কুহেলিকাচ্ছন্ন যন্ত্রণাদায়ক কঠিন রাত্রি। ছেঁড়া জামা-কাপড়ের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকিয়া হাড়ের মধ্যে কন্‌-কন্‌ করিতেছিল। এমনি করিয়া পথ চলার মধ্যে জহর আগে একটি নিবিড় দুঃখের সুর অনুভব করিত। কোনো অবলম্বন এবং বন্ধন নাই—এই কথাটি আগে তাহার তরুণ মনে একটি ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি

করিত। আজকাল দুরবস্থায় পড়িয়া তাহার হৃদয়ের কোমলতার আবেগের তন্ত্রাগুলি আর তেমন ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠে না।

বাসার কাছাকাছি আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। সদর দরজার বাঁ-দিকের ঘরে কিসের গোলমাল চলিতেছিল। আলো জ্বালিয়া কর্তা একখানা তক্তার উপর বসিয়া আছেন, সুমুখে আর দু'টি লোক, একজন বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছে।

'মিথ্যেবাদী, বুঝলে সাধন, জোচ্চোর!'

'তুমি এতদিন রাখলে কেমন ক'রে যজ্ঞেশ্বর? চার মাসের ভাড়া বাকি, এই কলকেতা শহরে······এত খরচ তোমার—'

'ওসব লোককে বাড়ি ঢুকতে না দেওয়াই ভাল। ঘরের জিনিস-পত্র টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার ভাড়া বসাও! রান্নার জায়গা আলাদা আছে ত? ব্যাস্, কল-পায়খানা এক, ভাড়া পনেরো টাকা। দেখি কোন্ শালা—'

কর্তা কহিলেন, 'আরে ভাই, বলে গেলাম দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর, এই আসি। ফিরে এসেই দেখি ভোঁ ভোঁ! নবাবপুত্তুর, একটু দাঁড়াতে পারে না? ওকে তাড়াতেই হবে, এই আমি এখানে বসে রইলাম, আসুক, আসুক একবার!'

জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া জহর তাহাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল।

'আজ একটা যা হোক হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল যজ্ঞেশ্বর। চাল নেই, চুলো নেই, ওর কাছে ভাড়া আদায় হবে কেমন ক'রে? ছেলেমেয়ে নিয়ে যে-লোক ঘর করে না, তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।'

যজ্ঞেশ্বর কহিল, 'তাড়াবো বলেই ত ব'সে আছি।'

জহর আর সেখানে দাঁড়াইল না, জানালার কাছ হইতে সরিয়া সে আবার হাঁটিতে শুরু করিল। কিন্তু রাত্রিবাস করিবার জায়গা আর কোথাও তাহার ছিল না! কয়েকদিন আগে এক পার্কের

বেঞ্চে শুইতে গেলে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—জীবন ধারণ করিবার উপযোগী তাহার নাকি কোনো সদুপায় নাই। ইহার পর অসদুপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই বলিয়া পুলিশ হয়ত পুনরায় গ্রেপ্তার করিবে।

উত্তর কলিকাতায় কোথায় নাকি একটা বড মন্দির তৈয়ারি হইতেছিল, এ-সংবাদ জহরের জানা ছিল। রাত্রে তাহার নাটমন্দিরে পড়িয়া ঘুমাইলে কেহ কিছু বলে না। যারা নিশাচর তাহাদের গতিবিধি সন্দেহজনক, কিন্তু একবার কোথাও শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাদের অর্ধেক অপরাধ কমিয়া যায়। একটা গল্প জহরের মনে পড়িয়া গেল। একবার সমুদ্রপথে সে জাহাজে করিয়া আসিতেছিল। জাহাজের মধ্যেই একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়া সে পালাইবার পথ পায় নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্বিবাদে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া সে প্রমাণ করিয়াছিল—সে নিরপরাধ। সেই জাহাজেই একজন জার্মান ব্যবসায়ীর নিকট সে নানারকমের যাদুবিদ্যা শিখিয়াছিল।

সাধারণত শহরের বড়-বড় রাস্তা ধরিয়া জহর হাঁটিতে চায় না, গলি ঘুঁজি দিয়া সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করিয়া সে চলিতে ভালবাসে। এ-যুগে অধ্যবসায়ের চেয়ে সুবিধাবাদ অনেক বড়। জহরও জীবনে অনেক সুবিধা আবিষ্কার করিয়াছে। সুবিধার সঙ্গে বুদ্ধির যোগাযোগ ঘটিলে রাজ্য পর্যন্ত জয় করা চলে। যাক্ সে-কথা। গলি পথ দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া জহর চলিতেছিল। অত রাত্রে আশে-পাশে বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিদ্রিত, নিশুতি রাত। মাঝে মাঝে হু-হু করিয়া উত্তরের বাতাস ধূলি-জঞ্জাল উড়াইয়া বহিয়া চলিয়াছিল। সকলেই বোধ করি লেপ গায়ে দিয়া ঘুমাইতেছে। লেপ গায়ে দিলে ধীরে ধীরে হাত পা গরম হইয়া উঠে। অতিরিক্ত আনন্দ এবং অতিরিক্ত তৃপ্তি হইতেছে অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক। অনাবিল আরামের মত অভিশাপ জীবনে কি আর

কিছু আছে? তরুণ বয়সে জহর দুঃখ পাইয়া হাসিত, সুখের আন.
তাহার চোখে জল আসিত। অবারিত স্রোতের চেয়ে উপলাহত
স্রোতের সৌন্দর্য অনেক বেশি।

দূরে কোথায় একটা পাহারাওয়ালা গৃহস্থকে সাবধান হইতে বলিয়া নিজে অতি সাবধানে চলিয়া যাইতেছিল। তাহার নাল্ দেওয়া বুট্-এর খট্ খট্ শব্দ এত দূর হইতেও কানে আসিতেছিল। শীতের প্রথমরাত্রে গৃহস্থঘরে চুরি করিবার সুবিধা, গ্রীষ্মকালে শেষরাত্রে। পাহারাওয়ালার বুট্-এর শব্দ যে দিক হইতে আসিতেছিল জহর তাহার অপরদিকে চলিতে শুরু করিল। 'একশ দশ ধারায়' অভিযুক্ত হইয়া সে আর 'বিপজ্জনক ও মরিয়া ব্যক্তি' বলিয়া আদালতের জনতার সম্মুখে অভিহিত হইতে চাহে না। বহুলোকের নিন্দা শুনিয়া যাহারা বিখ্যাত বলিয়া নিজেদের গৌরব করিয়া বেড়ায়, জহর সে আধুনিক মনকে ঘৃণা করে। পথের প্রদীপের সারি ও উপরের অন্ধকার আকাশের অগণ্য তারকা একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার পথের দিকে তাকাইয়াছিল। সে একবার উপরের দিকে চাহিল। এই নিঃশব্দ নির্বাক আকাশকেই মানুষ সকলের চেয়ে সমীহ করে। পৃথিবীর সকল পাপ ও অন্যায় ঘরের মধ্যে বসিয়া সৃষ্টি, যত কলুষ কালিমা মানুষ আকাশের দৃষ্টি হইতে লুকাইতে চায়। অবারিত প্রান্তরের মাঝখানে মানুষ হত্যা করে, হানাহানি করে, কিন্তু বিষাক্ত মস্তিষ্ক খেলাইয়া অন্যায় ও নীচতার কুৎসিত কৌশল আবিষ্কার করে না। মণি, রত্ন, অর্থ, অলঙ্কার মানুষের গোপন প্রলোভনের প্রতীক, তাই তাহাদের স্থান খোলা আকাশের আলো বাতাসের নীচে নয়, লৌহ আধারের নিশ্বাসরোধী অন্ধকূপের মধ্যে।

পাহারাওয়ালার পায়ের শব্দ কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। জহর সেই দিকে একবার তাকাইয়া চট্ করিয়া একটা চালার বেড়ার পাশে উঠিয়া লুকাইল। জীবনে তাহাকে অনেকবার অনেক অবস্থায় লুকাইতে হইয়াছে। একবার সে ট্রেনে লুকাইয়া থাকিয়া মধুপুর

স্টেশনে কানপুর পর্যন্ত গিয়াছিল। আর একবারের আত্মগোপনের কথা মনে করিয়া সে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

পাহারাওয়ালাটা ঘুমাইতে ঘুমাইতে চলিয়া গেলে সে আবার বাহির হইয়া আসিল। হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাহার শরীর একটু গরম হইয়াছিল। পরিশ্রম করিয়া শরীর যাহাদের গরম করিতে হয়, পৃথিবীর ভরণপোষণের ভার তাহাদেরই উপর। জহর বাঁ দিকে মোড় ফিরিল। কিন্তু মোড় ফিরিয়া দেখিল, যেখান হইতে সে পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল আবার সেইখানেই সে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে? বুঝিল পথ সে ভুল করিয়াছে, আবার ওই মাঠকোঠার পাশ দিয়া না গেলে সে মন্দিরে গিয়া পৌঁছিতেই পারিবে না। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে চলিতে লাগিল। শীতের রাত, বারোটা না বাজিতেই পথঘাট নিস্তব্ধ এবং জনবিরল। পথ চলিতে চলিতে কোথাও কিছু তাহার দৃষ্টি এড়ায় না, এদিকে ওদিকে বহুদূর পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি সজাগ থাকে। কাছাকাছি আসিতেই সে লক্ষ্য করিল, একখানা চওড়া পাড় কাপড়ের একটা ধার হাওয়ায় নড়িতেছে, কাপড়খানি আলোয় একবার চক্‌চক্ করিয়া উঠিতেছে। জহর আর একবার পর্যবেক্ষণ করিল। দেখিল শুধু কাপড় নয়, কাপড় পরিয়া গ্যাসের আলো হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া যে দরজায় দাঁড়াইয়া আছে সে মানুষ, এবং সে শুধু মানুষও নয়, সে নারী।

নারী দেখিয়া বিপন্ন হইয়া সে পা বাড়াইল। পা বাড়াইল বটে কিন্তু বেশি দূর তাহাকে যাইতে হইল না। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার যে ফিরে এলে?'

জহর ফিরিয়া তাকাইল। বলিল, 'ও, তুমি? ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় এলে কেন? ফিরে আমি আসি নি, পথটা ভুল হয়েছিল, যাচ্ছিলাম এই দিক দিয়ে।' বলিয়া সে আবার পা বাড়াইল।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি কহিল, 'তখন দেখলাম মাথা হেঁট করে চলে যাচ্ছ। শোনো, দাঁড়াও। কোথায় যাবে তুমি?'

'মন্দিরে।'

'মন্দিরে?' বড়-বড় চোখে মেয়েটি তাহার দিকে তাকাইল। তারপর কহিল, 'তোমাকে নিতান্ত জুয়াড়ি বলে আমার একদিনো মনে হয় না। সেদিন তোমাকে 'তুমি' বলে ডেকেছি, ক্ষমা করো। দয়া করে আমার একটি উপকার করবে?'

জহর একটু হাসিয়া কহিল, 'মেয়েদের উপকার অল্প বয়সে করে বেড়াতাম, এখন সে রুচি গেছে। যাক্ গে, শুনেই যাই তুমি কি বলতে চাও; তাড়াতাড়ি বল।'

'বলি।' বলিয়া মেয়েটি একেবারে পথে নামিয়া আসিল, বলিল, 'আর একটু এগিয়ে চল বল্‌চি। ওরা হয়ত এখুনি এসে পড়বে।'

তাহার চকিত ও ত্রস্ত অবস্থা দেখিয়া জহর বিস্ময় বোধ করিল, কহিল, 'ওরা কারা?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির ঝি। ওর মতলব ভাল নয়।'

'কি রকম?'

মেয়েটি কহিল, 'সে অনেক কথা, আগে এগিয়ে চল। তুমি না এসেও এখনই আমাকে চলে যেতে হতো।'

জহর চিন্তিত হইয়া কহিল, 'কোথায় যেতে?'

'যেতাম যেখানে হোক্। আচ্ছা, তুমি রায়বাগানের রাস্তাটা চেনো?'

'চিনি, কেন বলত?'

'মেয়েদের নতুন বোর্ডিংটা?'

জহর কহিল, 'আগে ওসব চিনতাম, যখন গোঁফ উঠছিল, এখন সব ভুলে যাচ্ছি একটু-একটু করে।'

'চালাকি করো না, বল। মেয়েমানুষের বিপদকে নিয়ে যারা খেলা করে তারা পশুর মত অসচ্চরিত্র।'

কিছুদূর দ্রুতপদে দুইজনে আসিয়া একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। চলিতে-চলিতে জহর কহিল, 'মেয়েরা মরে ত মর্যাদা ছাড়ে না। কিন্তু শোনো, এসব আমি পারি নে। জগতে একটা কাজ এড়িয়ে চলা উচিত, সে হচ্ছে মেয়েমানুষের উপকার করা। তুমি যে এত লোক থাকতে আমাকেই কেন বেছে নিলে এ আমি বুঝলাম না। আমি যে লোক ভাল নয় তা নিশ্চয় তুমি এ-ক'দিনে—'

'সে আমি জানি।' মেয়েটি কহিল।

'জানো? কী জানো?'

'জানি যে, গরম চাটু থেকে আগুনে পড়চি। অপমান থেকে হয় ত নেমে যাচ্ছি অধঃপতনে।'

জহর বলিল, 'তা হ'লে জানতে পারো নি। চাটু থেকে পড়েছ বটে কিন্তু আগুনে নয় ছাইয়ের গাদায়।'

অত দুঃখেও মেয়েটি কৌতুকের হাসি হাসিল। বলিল, 'আমি কি জন্যে পালিয়ে এসেছি শুনবে?'

'না।' জহর কহিল, 'আমি তরুণ মাসিকপত্র নই যে, তোমার কেচ্ছা আমি বইতে পারবো। সাবধানে এসো, পাহারাওয়ালাটা হাঁক দিচ্ছে।'

মেয়েটি বলিল, 'দিলেই বা, ধরবে আমাদের?'

'নিশ্চয়ই ধরবে, একেবারে হাতে-হাতে, ধরলে আর ছাড়বে না।'

'অপরাধ?'

'বলবে আমি তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

মেয়েটা হাসিয়া কহিল, 'বোধ হয় অন্যায় বলবে না।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, 'ওই বাঁ-হাতি বেঁকলেই রায়বাগানের বোর্ডিং পাবে, যাও। ভাল লাগচে না তোমার সঙ্গে পথ হাঁটতে। এ সব আমি অপছন্দ করি।'

পাহারাওয়ালার পায়ের শব্দ অন্যদিকে চলিয়া গেল। মেয়েটি কহিল, 'অপছন্দ? আজকালকার ছেলেদের নতুন ফ্যাসান, মেয়েদের

করে ঘৃণা। দায়িত্ব নেবার অক্ষমতা, ভীরুতা আর বেকারবৃত্তি এই তিনে মিলে নারী বিদ্বেষ। আমি যাবো না।'

জহর প্রমাদ গণিল। বলিল, 'এত রাতে কেলেঙ্কারি ক'রো না। যাবে না ত এলে কেন ছলনা ক'রে? আমাকে ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার!'

সে কহিল, 'না। ভেবে দেখ্‌চি এত রাতে মেয়েদের বোর্ডিংয়ে গিয়ে ওঠা উচিত হবে না!'

'তবে কোথা যেতে চাও এখন?'

'এখানে যদি ধর্মশালা কোথাও থাকে ত দেখিয়ে দাও আজকের রাতটা সেখানে পড়ে থাকবো।'

'ধর্মশালা এত রাতে কোথায় খুঁজবো? কলকাতায় ধর্ম আর ধর্মশালা দুটোরই বড় অভাব।'

মেয়েটি এবার একটু আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, 'ক'দিন তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারচো না।' চলিতে চলিতে সে পুনরায় কহিল, 'একলাই আমি চলে আসতে পারতাম। কিন্তু অবলম্বন দেখলেই মেয়েমানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। ওরা এতক্ষণ হয় ত খোজাখুঁজি করচে।'

'কেন? মেয়েমানুষ হারালে ত খোঁজবার কথা নয়!'

'হ্যাঁ, খুঁজচে। স্ত্রীলোক যখন স্বার্থের গন্ধ পায় তখন সে সাপের মতো কুটিল। ঝি-এর বাড়িতে এসে ওঠাই আমার অন্যায় হয়েচে।'

'এলে কেন?'

'সহজেই বুঝতে পারো, অত্যাচারী স্বামী, মাতাল—'

জহর তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, 'এই জন্যে এদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে নেই। মেয়েদের রুচিজ্ঞান আর সম্মানবোধ যদি জন্মায় তাহ'লে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে হাহাকার উঠবে তা কি ভেবে দেখেচ? কিন্তু ঘর ছেড়ে এসে এখন তুমি কি করবে?'

মেয়েটি কহিল, 'স্বাধীন জীবিকা।'

জহর কহিল, 'সেই পুরানো কথা। অর্থাৎ হাসপাতালের নার্স, কিম্বা মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারী, তারপর?'

'তারপর আবার কি?'

'তারপরেও আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। নার্স এবং মাস্টারনীদের সম্বন্ধে কিছু-কিছু ত আমি জানি?'

মেয়েটি কহিল, 'ছিঃ চুপ কর। ঝি-এর সঙ্গে চলে এলাম, সে বললে, দর্জিপাড়ায় সুতো কাটার কলে আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবে, পরিশ্রম করলে রোজ আটআনা দশআনা রোজগার করতে পারবো—তার ওখানেই থাকবো কিছুকাল। এ অবস্থায় যা হোক একটা কিছু জীবন-ধারণের মতো—কিন্তু কাল থেকেই লক্ষ্য করেচি ঝি-এর আছে অন্য মতলব, আমাকে সে বিপদে ফেলতে চায়। তোমার এখানে বাসা কোথায়?'

জহর কহিল, 'এতক্ষণে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে? কি ভাগ্যি যে কুলশীল জানতে চাওনি? আমি স্রোতের ফুল নই, সমুদ্রের আগাছা।'

'খুব বাহাদুর। এখন বাসাটা কোথায় শুনি?'

'বাসা আছে কিন্তু বাস নেই, সে বাসায় প্রবেশ নিষেধ।'

'কেন?'

'বাড়িওয়ালার দেনাটা শোধ করতে পারি নি।'

'তা হ'লে কি হবে?'

জহর বলিল, 'ভাববার কথা।'

বাঁ দিকের গলির মধ্যে তাহারা আসিয়া ঢুকিল। একটা কুকুর শুইয়া ছিল, তাহাদের দেখিয়া চীৎকার করিতে-করিতে চলিয়া গেল। দুইজনে নিঃশব্দে বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল। পথের আলো বাঁচাইয়া মেয়েটিকে এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া জহর আসিয়া দরজায় উঠিল। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। দরজা ঠেলিয়া দেখিল ভিতর হইতে বন্ধ। কিন্তু খুলিবার

কৌশল তাহার অজানা ছিল না। ইঙ্গিতে মেয়েটিকে অপেক্ষা
করিতে বলিয়া সে রোয়াকের উপর হইতে পা বাড়াইয়া পাঁচিল
বাহিয়া উপরে উঠিল সেখান হইতে অতি সাবধানে ভিতর দিকে
নামিয়া পড়িল।

দুই মিনিটের মধ্যেই দরজা খুলিয়া গেল। চুপি-চুপি মেয়েটি
উঠিয়া আসিল। তারপর নিম্নস্বরে কহিল, 'এতক্ষণ অবধি বলতে
নেই ছিল না—আমার নাম সুখলতা।'

জহর বলিল, 'মেয়েমানুষের কোন নাম নেই।'

অতি সাবধানে শিকল খুলিয়া দুই জনে অন্ধকার ঘরের মধ্যে
প্রবেশ করিল।

ঘরে ঢুকিয়া আলোর অভাবে কিছুই ঠাহর করিবার উপায় নাই।
চিলেকোর পুরানো ঘর, প্রায় দিবারাত্রি বন্ধ থাকিয়া ভিতরটায় অত্যন্ত
অস্বাস্থ্যকর খানিকটা ধোঁয়ার মত ঠাণ্ডা জমিয়া উঠিয়াছে। ভিতরে
আসিয়া দাঁড়াইয়া শীতে সুখলতার পা দুইটা কন কন করিয়া উঠিল।

'আলোটা আগে জ্বালো বাপু!'

জহর বোধ হয় জামার পকেট হাতড়াইয়া দেশালাই বাহির
করিতেছিল, হঠাৎ সুখলতা আঁক করিয়া ভয়ে হাত পা ছুঁড়িয়া সরিয়া
গেল। 'মাগো, পায়ের উপর দিয়ে কি যেন—শীগ্‌গির জ্বালো বাপু
আলোটা।'

জহর হাসিল। বলিল, 'ভয় কি, ও আমার পোষা ইঁদুর, নতুন
মানুষ তুমি তাই পায়ের ধুলো নিয়ে গেল। দাঁড়াও একটু, দেশালাইয়ে
আমার একটিমাত্র কাঠি, আগে বাতির টুকরোটুকু খুঁজে বার কর
দেখি?'

'অন্ধকারে খুঁজবো কোথায়?'

'ধরো তবে দেশালাইটা, আমিই দেখি।' বলিয়া জহর আন্দাজে
দেশালাইটা তাহার হাতে দিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া হাত বুলাইতে
লাগিল।

'পেয়েছ ?'

'না।'

'পেয়েছ ?'

'না। কিন্তু ছিল যে এখানেই, এই বিকেল-বেলাও যাবার সময়—হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি, এই যে। সব জিনিসই থাকে, শুধু খুঁজে পাওয়ার অভাব।' বলিয়া জহর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় বলিল, 'নাও জ্বালো এইবার দেশলাইটা, খুব সাবধান, আর কাঠি নেই।'

অতি সন্তর্পণে আলো জ্বালা হইল। কিন্তু সে-আলোয় ঘরের লজ্জাই ফুটিয়া উঠিল, আলো হইল না। ঘরের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহাতে মানুষের আবাস বলিয়া মনে হইতে পারে। দেওয়ালের চারিদিকে দড়ির মতো অসংখ্য উইপোকার বাসা নামিয়া আসিয়াছে। একপাশে কয়েকখানা খবরেরকাগজ, মাঝখানে একটি বিছানা—মনে হয় কোনো শ্মশান হইতে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেটা তুলিয়া আনা হইয়াছে।

সুখলতা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, 'এ ঘরে যে থাকে সে ত যে-কোন পাপ করতে পারে!'

জহর কহিল, 'এ ত ঘর নয়, আশ্রয়!'

'তুমি থাকো এইখানে? দিনের পর দিন?'

'থাকিনে, এসে লুকোই। যেমন তুমি এসে লুকিয়েছ।'

'লুকিয়েছি, তা বলে ভয়ে নয়, রাত হয়েছে বলে।'

'রাত না হ'লে কি করতে?'

'রাস্তা ধরে হাঁটতাম।'

'কোন্ দিকে?'

'যে-কোনো দিকে।' সুখলতা কহিল, 'তা বলে কি আর মরিয়া হতাম? তা হতাম না; যে মেয়ে সাধারণ বুদ্ধি হারায় সে আমার দু' চোখের বিষ।'

জহর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'কাল সকালে উঠেই চলে যাবে ত?'

'হ্যাঁ, খুব ভোর বেলা। তুমি যদি ঘুমিয়ে থাক তা-হ'লে আর জাগাবো না। বাড়ির লোক উঠবার আগেই—'

জহর হাসিয়া বলিল, 'ঐ সময়েই গৃহত্যাগ করে বটে।'

মুখে কাপড় চাপা দিয়া সুখলতাও হাসিল। তারপর বলিল, 'সত্যি আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম ঠিক অমনি সময়।' বলিতে বলিতে সে সহসা সচেতন হইয়া উঠিল, কহিল, 'আমার একটুও লজ্জা নেই, না? দু' মাসে যতটা আলাপ হওয়া উচিত ছিল, দু'ঘণ্টায় তোমার সঙ্গে তার চেয়েও বেশি হ'লো।'

জহর কহিল, 'মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হওয়া ভাল, ঘনিষ্ঠতা হওয়া ভাল নয়। তারা ভুলতে পারে না যে তারা মেয়ে।'

'পুরুষরাও তাই, এই ত নিয়ম।'

জহর কিছু না বলিয়া বিছানা ছড়াইতে লাগিল। কে কোন্‌খানে কেমন করিয়া শুইবে এই লইয়া দুইজনে সমস্যায় পড়িল। স্থির হইল, ইঁদুরের যাতায়াত পথ ছাড়িয়া দিয়া সুখলতা দেওয়ালের দিকে শুইবে। জহর বলিল, 'তুমি অতিথি বলে একটু বেশি যত্ন পাবে কিন্তু মেয়েছেলে বলে নয়। মেয়েদের প্রতি যাদের অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব তাদের আত্মসম্মান বোধ কম।'

'কিন্তু আদালতের বিচারে পর্যন্ত মেয়েদের বিশেষ সম্মান। এই সেদিন—'

'ওটা সম্মান নয়, তোষামোদ, কিংবা বিচারক হচ্ছেন বিপত্নীক। আধা-আধি পাওনা ছাড়া একচুলও মেয়েদের বেশি আমি দিতে রাজী নই।'

একজনের যে-বিছানায় শীত কাটে না, দুইজনে তাহা ভাগাভাগি করিয়া লইল। ওদিকে রাত কত হইয়াছিল তাহা কাহারও জানা নাই। বাতির টুক্‌রাটি আর কয়েক মিনিট মাত্র জ্বলিতে পারে। জহর উঠিয়া গিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিল। তারপর কহিল, 'কাল যাবার সময় আমার চাদরটা যেন নিয়ে যেয়ো না।'

সুখলতা এই নীচতায় অত্যন্ত চটিয়া গেল। বলিল, 'আমাকে কি এমনি ছোটলোক পেয়েচ?'

'না না, তা বলি নি; যদি ভুল ক্রমে—হাতছাড়া হ'য়ে গেলে ত আর ফিরে পাবো না! তুমি ত পালিয়েই বেড়াবে।'

সুখলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, 'আমার কোনো উপায় নেই বলেই তোমার এই অপমান সয়ে রইলাম। আমি যদি দরজা খুলে আবার চলে যাই তুমি আট্‌কাতে পারো?'

'গেলে আট্‌কাতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে ছুঁতে হবে তাই আট্‌কাবো না।'

'তার মানে?'

'স্বামীকে যে মাতাল বলে ত্যাগ করে তাকে আমি ছুঁইনে।'

সুখলতা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, 'মাতাল বলে ত্যাগ না কর্‌লে তুমি ছুঁতে? তোমার চরিত্র তা হ'লে আমার স্বামীর চেয়েও খারাপ। তুমি বুঝি আজও বিয়ে কর নি?'

'করলে ভালই করতাম। পরস্ত্রীর কাছে বিয়ে না করার জবাবদিহি করতে হতো না।'

নিজের মনেই সুখলতা কহিল, 'মাতাল বলে ত্যাগ করি নি, করেচি দুশ্চরিত্র বলে।'

বিছানার উপর বসিয়া জহর কহিল, 'তুমি এই যে পালিয়ে এসেচ, এও সচ্চরিত্রের লক্ষণ?'

সুখলতা কহিল, 'পালিয়ে এসেচি মুক্তি পাবার জন্যে। আমার স্বামী শুধু অসচ্চরিত্র হ'লে না-হয় আত্মহত্যা করে বাঁচতাম, কিন্তু আমার শাশুড়ী ননদ?—ওরে বাপ্‌রে, বাংলা দেশে মেয়েদের ওপর মেয়েদের অত্যাচারের সীমা নেই! যাক্ সে সব কথা, তোমার কাছে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নাই।'

জহর কহিল, 'তোমায় পরমায়ু থেকে ক'বছর খসেছে?'

'সে আবার কি?'

'তোমার বয়স কত ?'

সুখলতা হাসিয়া কহিল. 'মেয়ে মানুষে নিজের বয়েস সম্বন্ধে কখনো সত্যি কথা বলে না ! কত দেখায় তাই আমাকে বল !'

দরজার দিকে চাহিয়া দুজনেই চুপ করিয়া গেল। এতক্ষণ তাহাদের মনেই ছিল না যে তাহারা চুরি করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে। কর্তার আওয়াজ পাইয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল।

সাড়াশব্দ মিলাইয়া যাইবার পর সুখলতা চুপি চুপি কহিল, 'যদি আমাদের এ অবস্থায় উনি দেখতে পান, তুমি কি বলবে ?'

'বলবার আর কিছু দরকার হবে না।'

'আমাকে যদি অপমান করে ?'

'তোমাকে যদি অপমান করে তা হ'লে কি মনে কর কোমর বেঁধে আমি ওর সঙ্গে লড়াই করতে যাবো ?'

'যাবে না ? চোখের সম্মুখে মেয়েছেলের অপমান—'

জহর বলিল, 'ইস্কুলের ছেলেদের কাছে তুমি বক্তৃতা দিতে নাকি ? মেয়েদের অপমানে যারা চঞ্চল হয়, তারা অজ্ঞানে মেয়েদের অসম্মানই করে। মেয়েদের শক্তির ওপর তাদের বিশ্বাসও নেই, শ্রদ্ধাও নেই !'

পা গুটাইয়া সুখলতা ঘেঁসিয়া শুইয়া পড়িল। শীতে যে তাহার কাঁপুনি ধরিয়াছিল তাহা তাহার গলার আওয়াজ হইতেই বুঝা যায়। বলিল, 'তোমার ত গায়ে মোটা জামা আছে. চাদরটা রেখে তোমার কম্বলটা আমায় দাও।'

জহর রাগিয়া কহিল, 'এ তোমার জবরদস্তি।'

'বা রে, আমার যদি অসুখ করে ?'

'তোমার অসুখ করলে দেখবার লোক পাবে, কারণ তুমি স্ত্রীলোক, আমার অসুখ করলে হাসপাতালে দিয়ে আসবার লোকও জুটবে না ! জগন্নাথের মতো লোকে আমাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে।' বলিয়া সে কম্বলটা সুখলতার কাছে সরাইয়া দিল।

কম্বল ঢাকা দিয়া সুখলতা শুইল। আলোটা এইবার নিবিয়া আসিতেছে, সেই দিকে একবার তাকাইয়া সে কহিল, 'সমস্তটাই মনে হচ্ছে আজগুবী। তুমি ঘুরছিলে কোথায় বাউণ্ডুলে হয়ে, আমি বেড়াচ্ছিলাম পালিয়ে পালিয়ে। গ্রহে-গ্রহে লাগ্‌লো ঠোকাঠুকি। অতি অল্প পরিচয়, কোনো জানাশুনো নেই, তবুও দু'জনে দু'জনকে চিনলাম। কাল এমন সময় একজন আর একজনের কাছে হবে নিরুদ্দেশ—কোনো তল্লাস নেই, কোনো চিহ্ন নেই—'

জহর বলিল, 'এ যে দেখচি বৈষ্ণব কবিতার রসতত্ত্ব, কাছাকাছি থেকে ছাড়াছাড়ির কথা ভাবা।'

সুখলতা কহিল, 'আচ্ছা, এতক্ষণের মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করলে না আমি কিছু খেয়েছি কিনা?'

'ভাবছিলাম সে কথা। তুমি যদি বল কিছু খাই নি তা হ'লে বিপদে পড়বো। এত রাতে—'

'আজ সারাদিন আমার উপবাসে গেল।'

'গেল-কাল খেয়েছিলে?'

'তা কেন খাবো না?'

জহর বলিল, 'তবে ত তুমি নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারবে।'

সুখলতা তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই জহর পুনরায় কহিল, 'এমন লোক আছে জানো, যারা রোজ একবার ক'রে খাবার কথা ভাবতেই পারে না? এমন লোক আছে জানো, যারা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, দু'হাত দিয়ে তারা খাবার গিলচে?'

'খাওয়ার স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ, সে স্বপ্ন ভেঙে গেলে তাদের চোখে জল আসে।'

'উপবাস করলে যে কঠিন রোগ হয়।'

জহর বলিল, 'ভুল। সত্যিকারের দুঃখ যাকে পেতে হবে তার হয় না। দুঃখ হচ্ছে নির্মল।'

দুজনেই কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রিয়া রহিল। তারপর এক সময়ে সুখলতা বলিল, 'তুমি কী নিয়ে থাকো ? কী কর ? ·· ·কেমন ক'রে চলে ?'

'তোমার কি মনে হয় ?' জহর ভ্রূ কুঞ্চন করিয়া তাকাইল।

'আমার মনে হয় তুমি কিছুই নিয়ে থাকো না, কিছুই কর না, এবং কোনো রকমেই তোমার চলে না।'

'বেশ, এর ওপর তোমার একটা মন্তব্য বসিয়ে নাও।'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'মন্তব্য বসালে তুমি রাগ ক'রে আমার কাছ থেকে কম্বলটা কেড়ে নেবে।'

'না, তার কারণ সবার মন্তব্যই আমার কাছে সমান। কেউ বল্‌লে লক্ষ্মীছাড়া, কেউ বল্‌লে সর্বত্যাগী ; কারো কাছে আমি জোচ্চোর, কারো কাছে পরোপকারী, কেউ বলে মিথ্যেবাদী, কেউ বলে ধার্মিক।'

'যাক্‌ বাঁচলাম, এবার তোমাকে বুঝতে পেরেচি। তুমি অসাধারণ নয় ; অতি সাধারণ '

আলোটা ধীরে-ধীরে ম্লান হইয়া নিবিয়া গেল। ঘর হইল ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। অন্ধকার হইতে দুইজনে দুইজনাকে মনে-মনে অনুভব করিতে লাগিল। দুইটি সমুদ্র যেন পাশাপাশি আসিয়া পরস্পরকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে। যত কথা এতক্ষণ পর্যন্ত হইল, এ যেন নিতান্তই মৌখিক, এ-আলাপের মধ্যে কোথাও আত্মীয়তার উত্তাপও যেমন নাই, তেমনি স্নেহ দাক্ষিণ্য অথবা সহানুভূতির স্পর্শও কোথাও ছিল না। দুইটি প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণে যেমন অগ্নি জ্বলে অথচ তাহাদের মধ্যে আগুন নাই, তেমনি ইহাদের ভিতরেও কোনরূপ আন্তরিকতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

সুখলতা পুনরায় কহিল, 'আজ পর্যন্ত কত রকম লোকই আমি দেখলাম। কত জায়গায় কত রকম—'

জহর বলিল, 'মেয়েদের অভিজ্ঞতার হিসাব শুনলেই আমার হাসি

পায়। আত্মরক্ষা করতে-করতেই যাদের দিন কাটে তারা আবার দেখ্‌লো কী ?'

রাত্রি আর হয়ত ঘণ্টা-তিনেক বাকি আছে। তর্ক এবং কথালাপ দুইটি নরনারীর মধ্যে আপন অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণে টানিয়া-টানিয়া চলিতেছিল। ইহা হইতে বিরতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কথার নেশা যেন দুইজনকেই পাইয়া বসিয়াছে।

জহর কহিল, 'দু'জনেই ঘুমালে সকাল-বেলা বিপদে পড়্‌বো। তুমি ঘুমোও, আমি রইলাম বসে। তুমি চলে গেলে দরজা দিয়ে ভোর রাত্তে আমি শোব।'

'ধন্যবাদ।' বলিয়া সুখলতা চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিল। মিনিট-দুই পরে আবার মুখের উপর হইতে আবরণ সরাইয়া পুনরায় বলিল, 'কেমন লোক তুমি বল ত ?'

জহর কহিল, 'কেন ?'

সুখলতা চুপ করিয়া রহিল। পুরুষমানুষকে কোন বয়সেই বিশ্বাস করিতে নাই এ কথা তাহার জানা ছিল।

কিছুক্ষণ পরে জহর কহিল, 'রাত্রে কোন মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে বাস করা আমার বিসদৃশ লাগে, দম বন্ধ হয়ে আসে।'

সুখলতা এবারেও কোন উত্তর দিল না, বোধ করি ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, হাত পা হয় ত এবার একটু গরম হইয়াছে। জহর আড়ষ্ট হইয়া পা গুটাইয়া কাৎ হইয়া শুইল।

আবার কিয়ৎক্ষণ পরে সুখলতা জাগিয়া উঠিল। কম্বলখানা নিজেই গায়ের উপর হইতে তুলিয়া অন্ধকারে আন্দাজে জহরের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'এই নাও, আমি চলে গেলে তুমি যে বলবে মেয়েমানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর, তা হবে না।'

জহর বলিল, 'তুমি শীতে কষ্ট পেয়ে গেলে এই বা ভাববো কেন ?

কম্বল তোমাকে গায়ে দিতেই হবে।' বলিয়া সে কম্বলখানি আবার সরাইয়া দিল।

'তবে আমার এই চাদরটা তুমি নাও।' বলিয়া চাদরখানা খুলিয়া সে জহরের দিকে ফেলিয়া দিল।

দুইজনেই শুইয়া আবার চোখ বুজিল; জহরকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। বহু অবস্থায় বহু রাত্রি তাহাকে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে। একবার দক্ষিণ দেশে সমুদ্রতীরে গিয়া রাত্রির দৃশ্য দেখিবার তাহার সাধ হয়। একাদিক্রমে আঠারো রাত্রি সে সমুদ্র তীরে বসিয়া কাটাইয়াছিল।

কতক্ষণ এমনি করিয়া কাটিয়াছিল কে জানে। কতখানি রাত্রি আর বাকি ছিল তাহাও জানিবার কোন উপায় ছিল না। সুখলতার তন্দ্রা আবার ভাঙিয়া গেল। আরামে এবং আনন্দে তাহার সর্বশরীর তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনে হইল তাহার গায়ের উপর কি-যেন চাপিয়া ধরিয়াছে। আস্তে আস্তে সে হাত বুলাইয়া নাড়াচাড়া করিয়া চিনিল দেখিল, একটা গরম মোটা জামা। জামাটা জহরের তাহা তাহার বুঝিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না।

অন্ধকারেই সুখলতা তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। কিছুই দেখা গেল না, শুধু সেই পরিচিত ও অপরিজ্ঞাত লোকটার নিশ্বাস টানা এবং নিশ্বাস লইবার সোঁ সোঁ শব্দ সে চাহিয়া-চাহিয়া শুনিতে লাগিল। জানালা দিয়া যদি একবিন্দুও বাহিরের আলো আসিয়া পড়িত তাহা হইলে সে হয় ত দেখিত লোকটা কুঁকড়াইয়া ছোট হইয়া ঘুমাইয়া আছে; শীতে সে জর্জর, ঘুমের ঘোরেও হয় ত কাঁপিতেছে, তবু তাহার নির্বিকার মুখ পৃথিবীর প্রতি অসীম ঔদাসীন্যে ভরিয়া রহিয়াছে। সুখলতা তাহার নিদ্রাজড়িত চোখ টানিয়া একটু হাসিল। তাহার মনে হইল লোকটা শুধু অতিথি-বৎসল নয়, শীত-গ্রীষ্মও সে জয় করিয়াছে।

দরজা ঠেলাঠেলির শব্দে আচমকা তাহাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দুইজনেই জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ইতিমধ্যে কখন না-জানি সকাল হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ে ও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দুইজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল।

অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় চীৎকার ও কটূক্তি করিয়া বাহিরে কাহারা দরজায় ধাক্কা মারিতেছে। সমস্ত এখনই জানাজানি হইয়া পড়িলে অপমান ও লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিবে না; লুকাইবার স্থান নাই, পলাইবার পথ নাই। জহর পাথরের মতো বসিয়া রহিল।

রুদ্ধকণ্ঠে সুখলতা কহিল, 'আর ত উপায় নেই ধরা দেওয়া ছাড়া! কি হবে? কেন মরতে এলাম তোমার সঙ্গে?'

জহর ইঙ্গিতে তাহাকে চুপ করিতে বলিল।

দরজায় আবার ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়া একজন কহিল, 'কালা নাকি, শুনতে পাচ্ছ না? বলি ওহে নবাবপুত্তুর?'

ভয়ে বিবর্ণ মুখে চুপি-চুপি সুখলতা কহিল, 'জিজ্ঞেস করলে কি বল্‌বো? আমার ত মাথা হেঁট হয়ে যাবে।'

আবার দরজায় শব্দ হইল। জহর করুণকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, 'কে মশাই?'

'দরজা খুলুন আগে—শীগ্‌গির খুলুন।'

জহর চুপি-চুপি বলিল, 'উঠে ওই কোণে গিয়ে লুকিয়ে ব'সো, কেউ যেন দেখতে পায় না জান্‌লা দিয়ে।'

বলিবামাত্র, উঠিয়া সুখলতা ঘরের কোণে গিয়া নিঃশব্দে লুকাইল। গলা উঁচু করিয়া তারপর কহিল, 'জ্বর হয়েচে মশাই, উঠতে পাচ্ছি না, দয়া করে জানালার ধারে আসুন!'

কম্বলটা মুড়ি দিয়া সে জানালার ধারে কাৎ হইয়া রহিল।

চার-পাঁচ জন লোক জানালার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়িওয়ালা কহিলেন, 'জ্বর হোক্ আর নাই হোক্, আপনি জাল-জোচ্চুরি আর কতদিন করবেন শুনতে চাই!'

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিলেন, 'তোমার রোজগার যদি না থাকবে তবে ঘরভাড়া করেছিলে কেন? এটা ত তোমার পিতৃ-পুরুষের জমিদারী নয়।'

বাড়িওয়ালা কহিলেন, 'কে তোমাকে রাত্রে দরজা খুলে দিয়েছিল?'

'দরজা খোলাই ছিল।'

'খোলা ছিল? কক্ষণো না, আমি নিজে শোবার সময়—।'

জহর সে-কথার উত্তর দিল না, শুধু ডান হাতটা বাড়াইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, 'আপনারা কেউ নাড়ী দেখতে জানেন?' বলিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার হাত কেহ ধরিল না বরং মাঝখানের লোকটা মুখ বিকৃত করিয়া বলিতে লাগিল, 'হাড়ি-হুটকো চেহারা, রোজগার করতে পারো না? ঘরে যদি গরু পুষতাম তা হ'লে তারাও দুধ দিতো, গাধা রাখলে মোট বইতো, ঘোড়া হ'লে গাড়ি টান্‌তো। তুমি না-ঘোড়া, না-গাধা।'

আর একটা লোক কহিল, 'মেয়েমানুষেরও অধম!'

জহর খক্‌-খক্‌ করিয়া বুকে হাত চাপিয়া কাশিল। এ-অপমানের মৌখিক জবাব দিতে পারে এমন শক্তিই তাহার নাই। কুঁজো হইয়া পড়িয়া সে হাঁপাইতেছিল।

'জ্বর ছেড়ে আর কাজ নেই, কোনো ওষুধ-পত্র নয়, দু' ঘণ্টা সময় দিলাম, আপিস যাবার সময় যেন দেখি, ঘর আমার খালি। বিক্রি ক'রে ভাড়া আদায় করবার মতন কিছু আছে?'

জহর ধুঁকিতে-ধুঁকিতে হাত বাড়াইয়া তাহার জামাটা লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'এই জামাটা—যদি চোরা-বাজারে—দশ বারো আনা হয় ত হতে পারে!'

লোকগুলা নাসাকুঞ্চিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'ওকি ভদ্রলোকের জামা! মুচি-মুদ্দোফরাসের গায়েও অমন জামা—থুঃ, বোকাপাঁঠার গন্ধ!'

বাড়িওয়ালা কহিলেন, 'হোক আমার লোকসান, তুমি এখন বিদেয় হও তোমার জামা আর ছেঁড়া কম্বল নিয়ে, দু' ঘণ্টা সময় রইলো, তারপর না গেলে গলা ধাক্কা দিয়ে—'

বলিতে-বলিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পায়ের শব্দ এবং গলার আওয়াজ ক্রমে মিলাইয়া যাইবার পর জহর পিছন ফিরিয়া চাহিল সুখলতা তখন কোণে বসিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসি চাঁপিবার মিথ্যা চেষ্টা করিতেছে জহর তাহাকে ইঙ্গিতে কহিল, 'চুপ, শুনতে পাবে !'

অনেকক্ষণ তাহারা নির্বাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রির আলোয় জহর যে-সুখলতাকে দেখিয়াছে, দিনের আলোয় তাহাকে দেখিয়া সে খুশি হইল। শিক্ষিতা নারীর সম্বন্ধে তাহার ধারণা ভাল নয় তাহারা কেতাদুরস্ত, অতিরিক্ত তাহাদের পালিশ, সর্বাঙ্গে তাহাদের ছলনা. সহজ কথাকে ঘুরাইয়া অস্বাভাবিক চাতুর্য মিশ্রিত করিয়া তাহারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। এ-মেয়েটির কটাক্ষ নাই. আছে সহজ চাহনি, ইঙ্গিত নাই, আছে স্পষ্ট নির্দেশ। এ মেয়ে আকর্ষণ করে কিন্তু প্রলুব্ধ করে না। নারীর সারল্য ইহাতে আছে, নারীর প্রতারণা ইহাতে নাই। তাহার মতো একজন অল্প পরিচিত পুরুষের সহিত অনাড়ম্বভাবে কেমন করিয়া এ নারীটি গত রাত্রে পথে নামিয়া আসিয়াছিল তাহা জহর এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইল। সুখলতা কহিল, 'বোকার মত চেয়ে রইলে যে মুখের দিকে? হুঁশ নেই ?'

মুখ ফিরাইয়া লইয়া জহর বলিল, 'ভাবছি তোমার প্রশংসা করবো কি না।'

সুখলতা ব্যস্ত ও উত্যক্ত হইয়া কহিল, 'এই তার সময় বটে! বাল্মীকি মুনিরই কেবল একটি জিনিস ছিল যা আর কোনো পুরুষের মধ্যে নেই। সে হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞান।'

জহর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'মেয়েরা কিন্তু একটিমাত্র বস্তুর অধিকারিণী, তার নাম উপস্থিতবুদ্ধি ' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজার কাছে আসিয়া কান পাতিয়া সে শুনিল, বাহিরে কাহারও সাড়াশব্দ কিম্বা গলার আওয়াজ হইতেছে কিনা। তারপর সে নিশ্চিন্ত হইয়া অতি সন্তর্পণে খিল খুলিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একবার মুখ বাড়াইয়া চারিদিক দেখিয়া সে সুখলতাকে বাহির হইয়া আসিতে বলিল। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়া সুখলতা বাহির হইতেই সে কহিল, 'গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও গে, আমি আসচি।'

সুখলতা দ্রুতপদে রাস্তায় নামিয়া গেল

ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া জহর একবার দাঁড়াইল। সঙ্গে লইয়া যাইবার মতো তাহার কিছু নাই ছেঁড়া ও রুগ্ন কম্বল প্রমুখ যে বিছানাগুলি তাহার আছে সেগুলি সঙ্গে লইলে পথের লোক তাহাকে উন্মাদ বলিয়া পিছন দিক হইতে হাততালি দিতে পারে। নিজেকে ছাড়া আর কোন দরিদ্রকে সেগুলি দান করাও চলে না সেগুলি ব্যবহারযোগ্য নয়, বোঝা মাত্র

অতএব কেবল জামাটা গায়ে চড়াইয়া ও চামড়ার তালিমারা ক্যাম্বিশের জুতাটা পায়ে লাগাইয়া সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল।

পথের মোড়ে সুখলতা দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে দেখিয়া কহিল, 'দাঁড়াতে বললে কেন? তুমি কোন্‌দিকে যাবে এখন?'

'যে দিকে বাড়িওলা নেই তুমি যাবে কোনদিকে?'

'দক্ষিণ দিকে। কারণ আমার শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ি উত্তর দিকে।'

'দক্ষিণে কোথায় যাবে?'

'যমালয়ে নয়, ভবানীপুরে আমার মা'র খুড়তুতো বোনের শ্বশুরবাড়ি।'

'আচ্ছা, এক রাত্রের আলাপ, মনে রইলো, আর হয় ত দেখা

হবে না। যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি—' বলিয়া জহর পা বাড়াইল।

সুখলতা স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিল, 'তুমি যে নাটুকে কায়দায় বিদায় নিচ্ছ। কি করবে এখন শুনি?'

'কিছুই না, কোনো একটা বাগানে গিয়ে হয় ত ঘুমুবো, কিম্বা—'

'এখন গিয়ে ঘুমুবে?'

'যদি না ঘুমই, কোন খবরের কাগজের আফিসের ধাপে দাঁড়িয়ে চাকরির বিজ্ঞাপনও পড়তে পারি।'

'নাওয়া-খাওয়া এ সব?'

জহর হাসিল। কহিল, 'কাল রাতে কচুরি খেয়েচি, আজকের বেশ চলে যাবে।'

'খবরের কাগজ কি সারাদিনই পড়বে নাকি?'

'তার কি ঠিক আছে? কাগজ পড়ে হয় ত দেখবো চাকুরির বিজ্ঞাপন আছে, চাকরির বিজ্ঞাপন নেই। তখন হয় ত বা শিয়ালদায় গিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটতেও পারি। তুমি যাও, তোমাকে আবার অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।' বলিয়া জহর আবার পা বাড়াইল।

দু'পা অগ্রসর হইয়া সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'তোমার এ-বিদায় নেওয়াটাও ভাল জম্‌লো না। একটু হা হুতোশও ক'রে গেলে পারতে।' বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া চলিতে চাহিল।

জহর বলিল, 'সেটা গল্পও হ'তো না, নাটকও হ'তো না, হ'তো ন্যাকামি। শোনো বলি, ভবানীপুর জায়গাটা ছোট নয়, কোন রাস্তা আর কত নম্বর এটা জানা দরকার।'

'ঠিকানা আমার মনে আছে।'

কলিকাতার রাজপথে তখন জলস্রোতের মতো জনস্রোত নামিয়াছে। গাড়ি-ঘোড়ায়, ট্রামে, মোটরে, মানুষে, গরুর গাড়িতে

সমস্ত জট পাকাইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে। আশেপাশের পথচারী এই দুইটি আশ্রয়চ্যুত নরনারীর প্রতি ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। রাস্তায় এমন করিয়া কেহ আলাপ করে না।

জহর উদাসীন হইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই সুখলতা বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া কহিল, আমার এ সোনার বালাগাছটা বিক্রি ক'রে দিতে পারবে?'

জহর কহিল, 'না, আমি নিঃসম্বল অবস্থায় বেশ নিরাপদ, কিন্তু সোনার গহনা কাছে থাকলে আমার রেহাই নেই।'

'কেন?'

'আমার আপাদমস্তক ছিন্নভিন্ন, এ অবস্থায় অঙ্গে সোনা মানায় না। তোমার হাতের বালা বিক্রি করতে গিয়ে হয় ত পুলিশের বালা আমায় হাতে পরতে হবে।'

'তুমি কি চোর যে পুলিশকে ভয়?'

জহর হাসিয়া কহিল, 'চোর হ'লে ত ভয় ছিল না, পুলিশকে এখন ভয় করে ভদ্রলোকেরা, শিক্ষিতেরা।'

সুখলতা কহিল, 'চুপ কর, রাজনীতির প্রতি কটাক্ষ ক'রো না, ওর নাম আইন ও শৃঙ্খলা।'

জহর হাসিয়া কহিল, 'শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খল।'

দুইজনে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইল। জহর একসময় বলিল, 'মেয়েদের নিরাপদে থাকবার কোনো আশ্রয় এদেশে নেই।'

সুখলতা কহিল, 'এতগুলো আশ্রম আর নারী-মন্দির তবে কি জন্যে?'

'সব জায়গাতেই পয়সা লাগে। যেখানে পয়সা লাগে না সেখানে রূপ আর যৌবনের দরকার।'

'তার মানে?'

'মানে দুনিয়ায় যুধিষ্ঠিরের সংখ্যা বেশি নেই। সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মূলে যেটা থাকে সেটা দান নয়, শোষণ।'

কি যেন ভাবিয়া সুখলতা কহিল, 'মেয়েরা কিন্তু আসলে সচ্চরিত্র। আজ পর্যন্ত বহু পুরুষ নারী-প্রতিষ্ঠান খাড়া করেচে কিন্তু কোন নারীর দল আজ পর্যন্ত পুরুষদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায়নি।'

জহর খুব খানিকটা হাসিল। তারপর বলিল, 'উল্টোটাও হতে পারে। নিজেদের চরিত্রে তাদের বিশ্বাস নেই, তাই জন্যই হয় ত, কিন্তু মেয়েরা এমনি একটা কিছু করলে আমরা যে বেঁচে যাই। আমাদের মতো বেকার আশ্রয়হীন আর ভবঘুরে যুবকদের দল তা হ'লে—'

সুখলতা কহিল, 'এই ত একটা কাজ তোমার মিলে গেল। এই নিয়ে কোনো সাপ্তাহিক কাগজে মেয়েদের নাম দিয়ে গরম-গরম প্রবন্ধ লেখ। মেয়েদের নামে মেয়ে-বিদ্রোহ ছাপলে কাগজও কাটে।'

জহর কহিল, 'হ্যাঁ কলেজের ছাত্র মহলে প্রথমেই তা হ'লে সাড়া পড়ে যায়। মেয়েদের লেখা পড়েও তাদের আনন্দ।'

বেলা হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে শীতের আরামদায়ক রৌদ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। চলিতে-চলিতে কাছেই গোলদিঘির মধ্যে তাহারা ঢুকিল সম্মুখেই শান-বাঁধানো সিঁড়ির নিচে পরিষ্কার জল চক্-চক্ করিতেছে। দুইজনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া মুখে চোখে জল দিতে বসিল।

'আমি বাপু উপোস ক'রে থাকতে পারি নে! বালা একগাছা যা হোক ক'রে বেচতেই হবে। তোমার কাছে কিছুই নেই ত?'

জামার পকেট হইতে অচল দু' আনিটি বাহির করিয়া জহর কহিল, 'ইনি সব জায়গাতেই অচল—একেবারে সতী-সাবিত্রী. আমাকে ছেড়ে কোথাও ইনি যাবেন না।'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'চল একটা স্যাক্‌রার দোকানে দেখিগে. আমিও না হয় থাক্‌বো তোমার সঙ্গে'

স্যাক্‌রার দোকান অনুসন্ধান করিতে করিতে দুইজনে চলিল। কিছুদূর গিয়া বঁ-হাতি একটা ময়রার দোকান দেখিতে পাইয়া

সুখলতা দাঁড়াইল। বলিল, 'দাও দেখি দোয়ানিটা চলে কি না দেখি ; তুমি গিয়ে ওই গ্যাসের খুঁটিটার কাছে দাঁড়াও গে, আমি আসচি।'

ক্ষুধা পাইলে ক্ষুধা চাপিয়া থাকিবার মেয়ে সুখলতা নয়। মুখখানি তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল। এত কষ্টেও তাহার সে সুন্দর মুখে কোথাও রেখা পড়ে নাই, বরং রৌদ্র লাগিয়া ইতিমধ্যেই রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। দোকানে উঠিয়া সে কহিল; 'আপনাদের এখানে বসে খাবার বন্দোবস্ত আছে ?'

মেয়েরা সাধারণত দোকানে বসিয়া খায় না। দোকানি কহিল, 'হ্যাঁ আসুন না, জায়গা ক'রে দিচ্ছি। কি খাবেন ?'

গরম-গরম খাবার ভাজা হইতেছিল। সুখলতা মনে মনে হিসাব করিয়া দুই আনার মতো দিতে বলিল। তারপর দোকানির নির্দেশমতো এক কোণে নির্জনে পরিষ্কার একখানা বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল।

একটি ছোকরা বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে এক ঠোঙা খাবার ও এক ঘটি ঠাণ্ডা জল তাহার কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ঘটির জলে হাত-মুখ ধুইয়া ও জল খাইয়া সুখলতা বাহিরে আসিয়া দু' আনিটি বাহির করিয়া দিল। সেটি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দোকানি কহিল, 'এটা ত আপনার চল্‌বে না ?'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুখলতা কহিল, 'সে কি, চল্‌বে না ? এই যে নিয়ে এলাম কালীবাড়ির ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে।'

দোকানি কহিল, 'ও, তা তো হবেই। যত অচল টাকাপয়সা লোকে আজকাল ঠাকুরের দোরে দিয়ে যায়। ঠাকুরমশাইরাও সর্বত্যাগী, কাছে কিছু রাখেন না।'

সুখলতা করুণ ও মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, 'তা হ'লে কি হবে ? আমার কাছে আর ত কিছু নেই।'

দোকানি তাহার হাসিতে মুগ্ধ হইয়া কহিল, 'বউদির সময় কি না, নৈলে আট আনারই খেয়ে যান না—' বলিয়া অচল দু' আনিটি সে সুখলতার নরম হাতের তালুটি ছুঁইয়া ফিরাইয়া দিল। তারপর পুনরায় কহিল, 'এক সময় দিয়ে যাবেন, কি আর বলবো বলুন, আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে—'

'আচ্ছা বাবা, দিয়ে যাবো এক সময়।' বলিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া সুখলতা এক-পা এক-পা করিয়া চলিতে শুরু করিল। কিছু-দূরে জহর দাঁড়াইয়া ছিল, কাছাকাছি আসিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে বলিয়া সে চলিতেই লাগিল। দোকানির দৃষ্টি আগে ছাড়াইয়া যাইতে হইবে।

অনেক দূর পথ আসিয়া তাহারা আবার একত্র হইল। সুখলতা হাসিতে হাসিতে গায়ের চাদরের তলা হইতে আঁচলে বাঁধা খাবারের পুঁটুলি বাহির করিয়া কহিল, 'চল, আগে কিছু খেয়ে নেবে।'

জহর বিস্মিত হইয়া তাকাইতেই সুখলতা অচল দু' আনিটি তাহার পকেটের মধ্যে পুরিয়া দিল। তারপর কহিল, 'কিছুই খাই নি, বসে বসে শুধু আত্মসাৎ করেছি। চল।' বলিয়া সে জহরের হাত ধরিয়া টানিল।

ভবানীপুরের বাসা খুঁজিয়া তাহারা দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজনের মধ্যে তখন ইত্যবসরে একটা চুক্তি হইয়া গেছে। সুখলতা ঠিক করিয়াছে মাসিমার বাড়ি সে বেশিদিন থাকিবে না; হাওড়া স্টেশনে সে 'লেডি বুকিং ক্লার্কে'র চাকরি লইবে। যদি সে চাকরি না মিলে তবে সে জহরের সহিত একত্রে একটা চায়ের দোকান খুলিয়া লোককে চমকাইয়া দিবে। ছাত্র মহলে সাড়া আনিবে।

জহর ইতিমধ্যে দাড়ি কামাইয়া লইয়াছে। নাপিত ডাকিয়া কোনো এক গৃহস্থ-বাড়ির দরজায় বসিয়া দাড়ি চাঁচিয়াছে। নাপিত পয়সা চাহিলে সে দু'আনিটি বাহির করিয়াছে। কিন্তু সে দু' আনি চলে নাই। অগত্যা নাপিত বাড়িটা দেখিয়া চলিয়া গেছে, আগামী-

কাল সেই বাড়িতে গিয়া ডাকাডাকি করিয়া পয়সা চাহিবে। দাড়ি কামাইয়া তাহার মুখ হইয়াছে পরিষ্কার, সুখলতা তাহার চেহারার একটু প্রশংসাও করিয়াছে। সে নাকি সুপুরুষ।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া সুখলতা দরজার কড়া নাড়িল। কড়া নাড়িয়া যখন কেহ সাড়া দিল না, তখন সে দরজা ঠেলিল। দরজা খোলাই ছিল। জহরকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে এদিক-ওদিক চাহিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। বহুদিন পরে আজ মাসিমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে।

জহর তাহার পথের দিকে তাকাইয়া কয়েক মিনিট দাঁড়াইল। আশ্রয় একটা সুখলতার মিলিয়া গেল, আর কিছু চিন্তা করিবার নাই। সুখলতা অবলা নয়, না। এদেশে নারীর চেয়ে অবলার সংখ্যাই বেশি। তবু নারীর সম্বন্ধে চিন্তা করা জহরের স্বভাব-বিরুদ্ধ। নিজের প্রতি যাহার ঔদাসীন্য অন্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ নাই। সুখলতার জন্য এখন করিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে সে অপরিসীম দৈন্য অনুভব করিতেছিল। সুখলতার পিছু-পিছু অনুসরণ করিয়া বেড়াইতে তাহার অপমান বোধ হইল। তাহার সাহায্য শেষ হইয়া গেছে, আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই এই মেয়েটির কথা তাহার মনে রহিয়া গেল।

জহর একটু আগেকার চুক্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিতে শুরু করিল। কোনরূপ চুক্তি ভাঙ্গিতে তাহার একটুকু বিলম্ব হয় না। বাস্তবিক কাল রাত্রি এবং আজিকার সকালটা যেন স্বপ্নের মতো কাটিয়া গেল। জীবনের আকস্মিক ঘটনাগুলির সঙ্গে সচরাচর জীবনের যোগ নাই, তাই সেগুলি সত্য হইয়াও স্বপ্ন। সেগুলির সহিত আত্মার যোগাযোগ আছে, কিন্তু আত্মীয়তা নাই। আত্মীয়তা যে নাই তাহা সুখলতা মনে করাইয়া দিয়া গেল। সুখলতার সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, বন্ধন হয় নাই। জহর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, একটা আবর্ত

সে পার হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে বিশেষ ঘুরপাক খাইতে হয় নাই।

নারীর সহিত আলাপ করিয়া যাহারা শেষকালে তাহার জন্য বিলাপ করে জহর সে দলের লোক নয়। ভালবাসিবার জন্য মানুষ আজ পর্যন্ত যত অশ্রুপাত করিয়াছে, ভালবাসার জন্য তত করে নাই। যে বস্তুর ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যায় না, মানবজাতির আকর্ষণ তাহার প্রতিই অধিক। প্রেমের জন্য এত চোখের জল জমা হইয়াছে অথচ মনুষ্যত্বের অপমানে চারিদিক ভাসিয়া গেল; পৃথিবীতে এত ধর্মপ্রচার করা হইয়াছে, অথচ আজ পাপ ছাড়াইয়া গেল পুণ্যের পরিমাণকে। সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ বর্বরতার মধ্যে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি!

বড় রাস্তাটা পার হইয়া জহর সুমুখের পথটা ধরিয়া চলিল। এই পথটা বরাবর গিয়া মিশিয়াছে কালী-মন্দির পর্যন্ত। সম্ভবত আজ একটা পর্বদিন। স্ত্রীপুরুষ-পুণ্যার্থীর দল ভিড় করিয়া চলিয়াছে। পুণ্যের প্রতি তাহাদেরই লোভ বেশি যাহারা পাপকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। জীবনে যাহারা মনুষ্যত্ব আহরণ করে নাই, ধর্মকে অপহরণ করিবার লোভ তাহাদেরই অধিক। তাহারা ধার্মিক নয় তাহারা ধর্মভীরু। ধর্মভীরু পুরুষের চেয়ে ধর্মভীতা নারীর সংখ্যাই সংসারে প্রচুর। আজ পর্যন্ত যত লোক তীর্থ করিতে যাত্রা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বেশির ভাগ নারী।

জনস্রোতের মধ্যে ভাসিয়া-ভাসিয়া জহর চলিতেছিল। দুই-ধারে দোকান, বাজার, মেলা, ফেরি, গাড়িঘোড়া, ভিখারীর চিৎকার, খঞ্জনীর গান, পাণ্ডাদের গণ্ডগোল, অশ্লীল গালি-গালাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের গেরুয়া পরার দল, নারীর কলকণ্ঠের হাসাহাসি—সমস্তটা মিলিয়া একটা ভয়ানক রোল উঠিয়াছে। তীর্থের পরিচয় ইহার বেশি আর কিছু নাই। এদেশে তীর্থকে কেন্দ্র করিয়া যত পাপের চক্রান্ত। একদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধা অন্যদিকে প্রবল আত্ম-অপমান।

আত্ম-অপমানই এখনকার গৌরব। পৃথিবীতে আসিয়া আত্ম-অপমান যাহারা করিতে পারিল না, দুরবস্থার চাপে তাহাদের মাথা চিরদিন হেঁট হইয়া রহিল। আত্ম-অপমান করিয়া যাহারা অর্থোপার্জন করে তাহাদের অপরিমিত ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য মানুষের একমাত্র স্বপ্ন। ঐশ্বর্যের পদপ্রান্তে পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অনাচার, সভ্যতা ও বর্বরতা, প্রেম ও প্রবঞ্চনা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐশ্বর্য এমন একটি বস্তু যাহার জাতবিচার নাই। শাঠ্য ও সভ্যতা, নীচতা এবং ন্যায়, মাৎসর্য ও মানবতা—সব কিছুকেই সে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিয়াছে। ঐশ্বর্যই কীর্তি, ঐশ্বর্যই ধ্বংসের প্রতীক।

কোথায় সে এমনি করিয়া চলিয়াছে তাহাই জহর একবার চিন্তা করিয়া দেখিল। গন্তব্য কোথাও তাহার নাই। গন্তব্য শেষ অবধি কাহারই বা আছে। গন্তব্য সন্ধান করিতে-করিতেই যত শিক্ষা-সাধনা, জ্ঞান-সভ্যতা, গন্তব্যের জন্যই যত স্বার্থত্যাগ, শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকামনা। জহরের কোনো গন্তব্য নাই।

নিজের মনে সে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কিছুদিন হইতে রঙীন বুদ্‌বুদের মতো কতকগুলি বড়-বড় কথা তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিতেছে। বাস্তবিক, এখনকার শিক্ষিত লোকেরা আপনাদের দৈন্য, লজ্জা ও দারিদ্র্যকে ঢাকিবার জন্য কতকগুলি ফাঁকা দার্শনিক তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষিত ও আলোক প্রাপ্ত সমাজে যে বস্তুটি সকলের চেয়ে বেশি প্রসারলাভ করিয়াছে, সেটি আত্ম-প্রবঞ্চনা। আত্ম-প্রবঞ্চনা ও আত্ম-অবিশ্বাস। বড়-বড় কথা বলিয়া যাহারা মানুষের মন ভুলাইতে চায়, বুঝিতে হইবে আপনাকে ভুলাইতেই তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে। ভিতরে যাহাদের কিছু নাই, বাক্‌পটুত্বই তাহাদের একমাত্র সম্বল। জগতে কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির নাম করিয়া যাহারা অনাবশ্যক বাক্য ও শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা নিতান্ত দরিদ্র এবং অসহায়। নিজের

ভিতর ও বাহিরের নির্জনতাকে মুখর করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের এই কাঙালপনা। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তিনি সর্বহারা।

অনেক বেলা অবধি জহর ঘোরাফেরা করিল। আজ সকলের চেয়ে বড় তাহার সান্ত্বনা, আহারাদির উপদ্রব নাই। একটুখানি কোথাও বিশ্রাম করিয়া লইয়া অনায়াসেই সে আবার হাঁটিতে শুরু করিতে পারিবে। পাশেই একটা ধর্মশালা দেখিয়া সে দাঁড়াইল। ধর্মশালায় বিনামূল্যে আশ্রয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু দারোয়ান প্রমুখ সকলকে বকশিস্ দিতে-দিতে শেষ পর্যন্ত ঘর ভাড়ার পরিমাণকেও ছাড়াইয়া যাইতে থাকে। মূল্যদান করিয়া আজকাল দানের মূল্য দিতে হয়।

অগত্যা সে মন্দিরের দরজায় আসিয়াই উঠিল। ভিতরে এত গোলমাল এবং ভিড় যে দাঁড়াইবার উপায় নাই। দেবমূর্তি সাধারণত মাটি এবং পাথরের তৈরি কেন হয় তাহার কারণ, মাটি ও পাথরের সহিষ্ণুতা। মূর্তি জীবন্ত হইলে পুণ্যার্থীর অত্যাচারে পাগল হইয়া তাহাকে দেশত্যাগ করিতে হইত। মাটি, পাথর ও চিত্রপটই মানুষের অসংখ্য নির্বন্ধ কামনার সাক্ষী। জহর একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজিবার জন্য পা বাড়াইল।

কিন্তু পা বাড়াইতেই হঠাৎ পিছন দিক হইতে কে একজন প্রাণপণ মুঠিতে তাহার ডান হাতখানা আঁকড়াইয়া ধরিল। মুখ ফিরাইতেই সে অবাক হইয়া গেল। কহিল, 'তুমি? তুমি ফিরে এলে যে?'

দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট সজোরে চাপিয়া সুখলতা হাঁপাইতেছিল। হাতখানা সে তেমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়াই হাসিমুখে কহিল, 'অনেক কষ্টে তোমাকে পেয়েছি—অনেক খুঁজে—' বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখে জলের রেখা ফুটিয়া উঠিল। পুনরায় বলিল, 'পথের দু'ধারে দেখতে দেখতে এসেচি অলি-গলি, দোকান-বাজার —এবার আসছিলাম তোমার জন্যে ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়তে!'

'ঠাকুরের কাছে? তুমি ঠাকুর মানো?'

'হিঁদুর রক্ত আছে গায়ে! দুঃসময়ে ঠিক মানতেই হয়! চল; এখান থেকে বেরিয়ে এসো।'

দুইজনে পথে বাহির হইয়া আসিল। সুখলতা তাহার হাত ছাড়িল না, তেমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রহিল। জহর কহিল, 'মাসিমা কি বললেন?

'তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়েছি। আমাকে তিনি জায়গা দেবেন না।'

সুখলতা করুণ হাসি হাসিল পরে কহিল, 'আমি অনেক অনুনয় করলাম, শেষ পর্যন্ত পায়েও ধরলাম, তিনি বললেন, পালানো মেয়েকে জায়গা দিলে বদ্‌নাম হবে।'

জহর কহিল, 'তোমাকে জায়গা দিলেন না, তার মানে নিজের ওপর তাঁর শ্রদ্ধাও নেই, বিশ্বাসও নেই।'

সুখলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চলিতে লাগিল, তারপর একসময় বলিল, 'যাক্ গে—চল।'

রাস্তার ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহারা একান্তে পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিল। সুখলতা কহিল 'উঃ, একটু আগে আমি একেবারে অন্ধকার দেখছিলাম। মেয়েমানুষ যত বেপরোয়াই হোক, অবলম্বন একটা খোঁজেই।'

জহর বলিল, 'কাল রাতে তুমি ত একথা বল নি? তোমার মতো মরিয়া আর স্বার্থপর মেয়ে—ছাড়ো হাত ছাড়ো—'

হাত সুখলতা ছাড়িল না, কহিল 'না, হাত ছাড়লে তোমাকে আর খুঁজে পাবো না।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই সুখলতা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, 'তুমি ছাড়া এখন আর আমার কোনো আশ্রয় নেই।'

জহর রাগ করিয়া কহিল, 'তুমি যে রীতিমত একটা উপন্যাসের নায়িকা হয়ে উঠলে!'

সুখলতা উত্তর দিল, 'নায়িকা হতে পারি কিন্তু কাঁচা উপন্যাসের নয়।'

জহর কহিল, 'পথের লোক কি মনে করবে বল ত?'

'মনে আগেই করেচে।' সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'একটু আগে দু'টি ছেলে আমাকে দেখে কি ভাব্‌লো কে জানে—পিছু নিয়েছিল, আমি, ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে তাদের মন্দিরের পথটা কোন্ দিকে জিজ্ঞেসা করলাম। ব্যাস্ আর কি, এখনকার ছেলেদের দিকে হাসি-মুখে তাকাবার যো নেই, তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারও করবার উপায় নেই।'

'কি করলে? খেলা করলে বুঝি তাদের নিয়ে?'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'রাম বল! নিতান্তই অযোগ্য খেলনা।'

বেশি দূরে তাহারা গেল না, পথের পাশেই একটা চালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। গত রাত্রে একটা আশ্রয় যা হোক মিলিয়াছিল কিন্তু আজ তাহাও পাইবার উপায় নাই। অথচ শীতের বেলা, ইহার মধ্যে রৌদ্র পাতলা হইয়া আসিতেছে, আর কয়েক ঘণ্টা পরে অগাধ সমুদ্রে তাহাদের হাবুডুবু খাইতে হইবে। চালার ঘরের দরজায় তালা লাগানো দেখিয়া তাহারা সেইখানেই বসিয়া পড়িল। দুজনেই সকাল হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সুখলতা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, 'তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারো না?'

পথের গোলমালের দিকে চাহিয়া জহর বলিল, 'যেটা করছি এটা তবে কী?'

'তা তুমিও জানো না, আমিও না।'

জহর কহিল, 'আমি কিন্তু জানি।'

'জানো? কী বল ত?'

'আসলে এটা কিছুই না।'

সুখলতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বলিল, 'আমি ভাবছিলাম তোমার মুখ যা আল্‌গা, হয় ত একটা বেমক্কা কথা বলে বসবে।'

জহর কহিল, 'এই কথাই বলতাম, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা কঠিন কাজ; যারা দুর্বল তারা আসক্তির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।'

একটু থামিয়া সুখলতা কহিল, 'আমি যদি তোমার সঙ্গে একটা কিছু সম্বন্ধ পাতাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি তা হ'লে মেয়েমানুষ বলে ক্ষমা ক'রো, কেমন?'

জহর হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'তোমার ভূমিকাগুলো মন্দ লাগে না। কিন্তু তুমি আর যাই কর সম্বন্ধ পাতিয়ো না। সম্পর্কও নেই, সংস্পর্শও নেই—এমন স্থলে কোন সম্বন্ধ হতেই পারে না। ওটা এখন মুলতুবি থাক।'

সুখলতা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 'মেয়েদের মন, জানো ত? ভারি অস্বস্তি ঠেক্‌চে।'

'ওটা দুর্বলতা। আমাদের পরস্পরকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকতে দাও। তাড়াতাড়ি ভাই-বোন একটা কিছু পাতিয়ে গোঁজামিল দিতে চেয়ো না। ছাড়াছাড়ি যখন হবে তখন যেন অতি সহজে দু'জনে দু'দিকে চলে যেতে পারি।'

মুহূর্তের জন্য দুইজনে যেন একটি অপ্রত্যাশিত নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। তারপরেই জহর ধীরে-ধীরে কহিল, 'শেষের কথাটায় আমার গলাটা একটু ভারি হয়ে আসছিল, না?'

সুখলতা বলিল, 'হঁ্যা, একটু। বোধ হয় তোমার ভেতরটা একেবারে শুকিয়ে যায় নি। একেবারে শুকিয়ে যাওয়াই মৃত্যু।'

জহর হাসিয়া কহিল, 'মনে হচ্ছে তুমি আমার মনে রসসঞ্চার করবার চেষ্টায় আছো।'

সুখলতা কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় একটি লোক আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিলেন। লোকটির গায়ে নামাবলী,

মনে ক'রো না বাবা, এই আমাদের কাজ। শাড়ি আর চাদরের দরুণ পাঁচটি টাকা আর ঘরভাড়া রোজ আট আনা হিসাবে—'

জহর কহিল, 'নিশ্চয়, সে আপনি পাবেন বৈ কি।'

'এখনই কি দেবে বাবা?'

'কাল সকালে নিলে হয় না?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাড়া নেই, তোমার সুবিধে মতন—আর আমার হাতের কাছেই ত রইলে।'

বেলা পড়িয়া আসিল। মন্দিরে আজ সন্ধ্যায় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত আরতি হইবে। লোক-জন, স্ত্রী-পুরুষ, জড়ো হইয়া এখন হইতেই হৈ-চৈ করিতে শুরু করিয়াছে। এক জায়গায় কালী-কীর্তন বসিয়াছে।

সম্রাজ্ঞীর মতো মাথা উঁচু করিয়া ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টিতে সুখলতা আসিয়া দাঁড়াইল। মুখখানির চারিদিকে তাহার জ্যোতির্মণ্ডল, চোখে তাহার স্বর্গীয় দ্যুতি, অধরে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিতে আঁকা বিচিত্র হাস্যরেখা—সমস্ত তাহার সর্বাঙ্গের অপরিমিত যৌবন-শ্রীর সহিত মিলিয়া তাহাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

ভট্টাচার্য কোথা হইতে কুলকাঠ আনিয়া আগুন জ্বালিতে বসিলেন। আগুন জ্বালা হইলে কোন পাণ্ডার নিকট হইতে একখানি আসন আনিয়া সতীমায়ের জন্য পাতিয়া দিলেন। পাশেই জহর দাঁড়াইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'আমি এখুনি প্রচার ক'রে দিচ্ছি চারিদিকে, তুমি বাবা এখানেই থাকো। আর আমার টাকাটার কথা যেন—হেঁ—হে' বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে স্ত্রী-পুরুষ জমিয়া গেল। সকলে মিলিয়া এই পরমাসুন্দরী যুবতী ব্রহ্মচারিণীকে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মচারিণী নাকি সধবা ও কুমারীর হস্তরেখা নির্ভুল বিচার করিতে পারেন। সমগ্র ভারতের সকল তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া হিমালয়ে কোন্ দুর্গম গিরিগুহায় এক সন্ন্যাসীর

নিকট দীক্ষিত হইয়া দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় তিনি আবার মানব সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভিড় ক্রমশ বাড়িয়া উঠিয়া হৈ-চৈ করিতে লাগিল। সেই ভিড়ের ভিতরে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সতীদেবী অভয় হস্ত বাড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ একটি লোক গললগ্নীকৃতবাসে সাশ্রুনেত্রে লোকজন ঠেলিয়া সরিয়া আসিল এবং আসিয়াই সে আর দেরী করিল না, জামার পকেট হইতে একটি দু'আনি বাহির করিয়া দেবীর চরণে নিবেদন করিয়া সটান তাঁহার পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল। সুখলতা জহরের কীর্তি দেখিয়া মনে মনে কৌতুক বোধ করিল।

একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। সমবেত জনমণ্ডলী ভক্তিভরে অবনত হইয়া শুধু প্রণামই করিল না. সঙ্গে সঙ্গে আধলা, পয়সা, আনি, দু'আনি, সিকি প্রভৃতি দেবীর চরণারবিন্দে অজস্রধারে পড়িতে শুরু করিল। যে-লোকটি দু'আনি দিয়া উপুড হইয়া দেবীর চরণে পড়িয়াছিল, সে কি জানি কেন ছেলেমানুষের মতো ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ বুঝা যাইতেছিল না বলিয়াই হয় ত অসংখ্য নরনারী মুগ্ধ দৃষ্টিতে সতী-দেবীর দিকে তাকাইয়া পয়সা ফেলিয়া প্রণাম করিতেছিল। দেবীর মহিমা মানুষে কতটুকু জানে?

দেবী এতক্ষণে প্রসন্ন হইলেন। একটু হাসিয়া লোকটির মাথায় সুকোমল হস্ত স্পর্শ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন. 'কল্যাণ হোক।'

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া চলিয়া গেলেন।

২

লোক-জন এবং স্ত্রী-পুরুষের ভিড় একটু-একটু করিয়া কমিয়া যখন একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল তখন বেশ রাত হইয়াছে। আরতির ঘণ্টা কখন থামিয়া গেছে, ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পাণ্ডারাও প্রস্থান করিয়াছে।

কেহ কোথাও আর নাই দেখিয়া সুখলতা ধ্যান ভঙ্গ করিয়া এবার চুপি-চুপি হাসিল। অদূরে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া জহরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সুখলতা ইঙ্গিত করিয়া মৃদু-কণ্ঠে ডাকিল, 'শুনচেন মশাই?'

জহর হঠাৎ সজাগ হইয়া এদিক ওদিক তাকাইল। সুখলতা হাসিমুখে কহিল, 'কেউ নেই, এবার ওঠো।'

জহর উঠিয়া একটু কাছে সরিয়া আসিল। সুখলতা কহিল, 'ঘুমো'চ্ছিলে না কিছু ভাবছিলে?'

'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ভাবছিলাম।'

'যে ভাবে, সে ঘুমোয় না। নাও, এসব সরাও বাপু উঠি, বসে বসে পা ধরে গেচে। এত সন্দেশ মেঠাই ফুল জল নিয়ে কোথায় যাবো? ওই দেখ রাঙা পেড়ে কাপড়ের গোছা—কত টাকা জমলো গুনে দেখবে নাকি? পয়সা-কড়ি সব তুলে তোমার কাছে নাও।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিল। বলিল, 'আমাকে এত বিশ্বাস না করলেও পারো।'

'বিশ্বাস নয়, আমার পরিশ্রমটা বাঁচে। একজন একখানা গিনি দিয়ে গেছে, ওগুলোর মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।'

'গিনি? সতীব্রহ্মচারিণীর প্রতি এত—'

'সতীর প্রতি নয়, সতী যিনি সেজে বসেছিলেন তাঁর প্রতি

লক্ষ্য ক'রে দেখছিলাম, যে লোকটা গিনি দিল, সে অন্তত বার-দশেক ঘুরে-ঘুরে এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিল, ভাবলে আমি বুঝি চোখ বুজেই আছি পা ছুঁয়েই তার তৃপ্তি!'

জহর কহিল, 'অল্প বয়স নাকি লোকটার?'

সুখলতা কহিল, 'চুল পেকেছে মনে হ'লো, অল্প বয়েস হ'লে লোকে যে সন্দেহ করতো। সন্দেহজনক বয়েস যার কেটে গেছে সেই বেশি সন্দেহজনক। চল যাই।'

'কোথায় যাবো? থাকবার জায়গা?'

'ওই ত যে ঘরটা ভট্‌চায্যিমশাই দিয়েছেন, ওটাতে থাকা চলবে না?'

কি ভাবিয়া জহর বলিল, 'তোমার থাকা চলবে, তুমি এখন ভট্‌চায্যিমশায়ের উপার্জনশীল মক্কেল, কিন্তু আমার—'

সুখলতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য, তুমিই থেকো ঘরটায়, আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে দালানে পড়ে থাকবো'খন।'

'কম্বল মুড়ি দিয়ে? আজ কিন্তু একটু গরম বোধ হবে, কারণ অনেক টাকা রোজগার ক'রেচ। কম্বল যদি রাত্রে গায়ে না সয়? ঘুমের ঘোরে যদি গা থেকে—'

'গেলেই বা!' বলিয়া সুখলতা গায়ের চাদরটা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইল।

জহর বলিল, 'তা হ'লে সকাল-বেলা ভট্‌চায্যিমশাই উঠে এলে দেখবেন, পরমাসুন্দরী সতীদেবী আপন দেহকে বিপন্ন করে' পথের ধারে ঘুমুচ্ছেন, আর ষণ্ডামার্কা মাস্টারমশাইটি স্বার্থপরের মতো ঘরের ভেতর চৌকিখানি দখল ক'রে রয়েছেন। সে হবে না।'

অনেক রাত্রি হইয়াছিল, সুখলতা আর কথা বাড়াইল না, টাকা পয়সাগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া জহরের সঙ্গে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথে নামিতেই ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা: তিনি হন্‌-হন্‌ করিয়া ভিতরে ঢুকিতেছিলেন। বলিলেন, 'এই যে বাবা,

বলি এত রাত হ'লো, যাই একবার দেখে আসি—ভাগ্যবতী মা আমার, সব ব্যবস্থা করে রেখে এসেছি, খাবার, দাবার, শোবার জায়গা—'

সুখলতা কহিল, 'আসুন আপনাকে দেখিয়ে দিই—ওই সব পড়ে রয়েচে, আপনি সব তুলে আপনার ঘরে নিয়ে যাবেন।'

জহর কহিল, 'এ আপনাকে দান নয়, আপনার ঋণ পরিশোধ।'

ভট্টাচার্য মৃদু হাসিয়া রোয়াকের উপর উঠিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি বিস্ময় ও আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

'এত কাপড়-চোপড় পেয়েচ মা? এত খাবার-দাবার? এসব তুমি নেবে না?'

সুখলতা কহিল, 'না, ওতে আমার কাজ নেই, আমাদের জন্যে ধোয়া কাপড় যদি থাকে দু'খানা দেবেন। ওসব আপনি নিন্।'

ভট্টাচার্য অবাক হইয়া একবার এই দুইটি বিচিত্র নরনারীর মুখের দিকে তাকাইলেন। ইহাদের মনে মমতা, বন্ধন ও গৃহস্থালী বলিয়া কি কিছুই নাই?

জহর কহিল, 'আপনি আসুন পরে, আমরা এগোই। সংগ্রহ করা যাদের কাজ তারা পিছু-পিছু আসে।' বলিয়া দুইজনে আবার অন্ধকার পথে নামিয়া আসিল।

ভট্টাচার্য যখন ফিরিলেন তখন ইহারা বাসায় ফিরিয়া আহারাদি শেষ করিয়া লইয়াছে। মোটঘাট ভিতরে নামাইয়া রাখিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে মা?'

জহর গম্ভীর হইয়া কহিল, 'ওঁর সেবা হ'লো, আমিও পেসাদ পেয়ে এইমাত্র উঠলাম।'

'বেশ, বেশ, সারাদিন কত পরিশ্রম গেচে—' বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর কহিলেন, 'কালই কি তোমরা চলে যাবে বাবা?'

জহরের হইয়া সুখলতাই উত্তর দিল। বলিল, 'কালকেই ত যেতে হবে ঠাকুরমশাই, মন্দিরে আর ত বসতে দেবে না, কিছু চাঁদাও উঠলো।'

ভট্টাচার্য বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখানকার নিয়ম আজকাল ভারি কড়াকড়ি হয়েচে, আগে হলে আরো দু'একদিন বসতে দিত, কিন্তু এখনকার পাণ্ডারা—তোমাকে আর একটি কথা বলি মা।'

'কি বলুন?'

'তুমি যা দিয়ে গেলে, আমি গরিব, এতেই আমার পেট ভরে গেচে মা, যেমন-তেমন ক'রে পঁচিশ টাকার কাপড়-চোপড়—'

জহর কহিল, 'বেশ ত, ওতেই যদি আপনি খুশি হয়ে থাকেন—আমাদের কিন্তু দু'খানা কাপড় দিতে ভুলবেন না ঠাকুরমশাই।'

'সে ত দেবোই বাবা, সে তোমাদের প্রণামী।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'প্রণামী দিতে আজকালকার সভ্যতা লজ্জা বোধ করে। প্রণামীগুলি আজকাল দান এবং বক্‌শিস্ বলে চলে যায়।'

ভট্টাচার্য বিনীত হাসি হাসিলেন।

পথে লোক-চলাচল ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শীতের রাত্রি সাঁ সাঁ করিতেছে। ভট্টাচার্য গুটিসুটি হইয়া দাঁড়াইয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। একবার একটু গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, 'তোমার বিছানা ভিতরে হয়েছে মা, অনেক রাত হ'লো, এবার—'

জহর একবার অলক্ষ্যে দুইজনের মুখের দিকে তাকাইল, তারপর তাড়াতাড়ি সুখলতার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, 'যান্ ভিতরেই শু'ন্ গিয়ে, ঠাকুরমশায়ের মেয়েরা আছেন।'

সুখলতা প্রথমে একটু হাসিল, তারপর বলিল, 'আপনাকে আর কষ্ট দেবো না বাবা, আপনি যান, উনি আমার পরম শ্রদ্ধেয়।'

এরকম গলার আওয়াজ ও বলিবার ভঙ্গী ভট্টাচার্য অনেকদিন শুনেন নাই, ইহাকে আর কিছু ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইয়া বলিবার

প্রয়োজন রহিল না।—'আচ্ছা, আচ্ছা' বলিতে-বলিতে তিনি একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। সুখলতা আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। বড় তক্তাটার একধারে জহর পা গুটাইয়া উঠিয়া বসিল। হারিকেনের আলোটা সামান্য একটুখানি কমাইয়া দিয়া সুখলতা মোটা গেরুয়া শাড়িখানা ছাড়িয়া ওবেলাকার কাপড়খানি পরিয়া লইল, তারপর আবার আলোটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'মাথায় একেবারে সিঁদুরের বিষ্টি হয়ে গেচে। এত সিঁদুর মাথা থেকে তুলে না ফেললে কাল রাস্তায় পা বাড়াবার উপায় থাকবে না, কি করি বল ত?'

জহর বলিল, 'একেবারে তুলে ফেল্‌বে নাকি?'

সুখলতা হাসিয়া বলিল, 'তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

'তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে। তুমি তুল্‌বে মাথার সিঁদুর, আমি পড়বো অগাধ জলে।'

সুখলতা কহিল, 'সিঁদুরও থাকবে, তুমিও থাকবে এই বা কি ক'রে হতে পারে? আমি গরমিল সইতে পারি, গোঁজামিল সইতে পারি নে।'

জহর কহিল, 'তা হ'লে সিঁদুর থাক, আমি যাই।'

সুখলতা মৃদু-মৃদু হাসিয়া বলিল, 'না, তুমি থাকো, সিঁদুর যাক্‌, সিঁদুরের চেয়ে তোমাকেই আমার বেশি দরকার। ওঠো, বিছানাটা ভাল ক'রে ছড়িয়ে নিই।'

জহর উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় তক্তাটার উপর বিছানাটা ছড়াইতে ছড়াইতে সুখলতা কহিল, 'ভট্টচাযিার বিবেচনা আছে। একটা বিছানা অনায়াসেই দু ভাগ ক'রে নেওয়া চলবে। আজকে শীতও তেমন বিশেষ—'

জহর হাসিল, হাসিয়া বলিল, 'আমরা সভাই দরিদ্র, আমাদের ভাগ্যে আরাম লেখা নেই।'

সুখলতা তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই সে পুনরায় কহিল, 'যেদিন শীত থাকে সেদিন বিছানা জোটে না, যেদিন বিছানা থাকে সেদিন-

সুখলতা কহিল, 'সেদিন টাকার গরম।' বলিয়া সে গেরুয়া শাড়ির একটা কোণ দিয়া ঘষিয়া-ঘষিয়া সিঁদুর মুছিতে লাগিল।

তক্তার উপরে জহরের বিছানা হইল, তারপর মেঝের উপর নিজের বিছানাটা কোনোমতে ছড়াইয়া সুখলতা কহিল, 'আর কেন, শোও।'

শুইয়া পড়িয়া জহর বলিল, 'শুলাম বটে কিন্তু ঘুম হবে না। আমি যদি একা থাকতাম কিম্বা তুমি যদি পুরুষ হতে তা হ'লে এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়তাম।' পুনরায় কহিল, 'সমাজের ভয়, মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরই বেশি।'

সুখলতা কহিল, 'আমাকে দেখে বুঝি তোমার তাই মনে হয়?'

'তাই মনে হয়। সমাজ মেয়েদের কাছে প্রবলতর প্রতিপক্ষ, লড়াই করলে হারবে জেনে মেয়েরা তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে; পুরুষের কাছে সমাজ শ্রদ্ধার এবং সম্মানের। তাই মেয়েদের চেয়ে পুরুষের কাছে লোকলজ্জার মূল্য বেশি।'

সুখলতা কহিল, 'আমি বেপরোয়াও নই, সঙ্কোচও কাটাই নি, সমাজও ভাঙি নি।'

'কিছুই কর নি, তবু তুমি আঘাত করেচ সমাজের মনে।'

'থামো!' বলিয়া সুখলতা তাহাকে একটা ধমক দিল। বলিল, 'সমাজকে যারা সামলাবার চেষ্টা করে, নিজেরাই তারা বেসামাল। সমাজের মন বলে কোন বস্তুই নেই, মন তোমার; পুরুষমানুষ যতই উদারনীতির হোক, তার রক্তের মধ্যে সংরক্ষণশীলতা। অর্ধেক রাতে সমাজতত্ত্ব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না, গা জ্বলে যায়।' বলিয়া সে রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

জহর হাসিয়া বলিল, 'আমার কিন্তু এ দোষ ছিল না।'

তাহার করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুখলতা পাশ না ফিরিয়া থাকিতে পারিল না। মুখ তুলিয়া বলিল, 'কি দোষ ?'

'এই জ্ঞানানুশীলনটা। এটা বোধ হয় দুর্বলের পেশা। আমি যখন নিতান্ত অসহায় বোধ করি তখন মনে আসে তত্ত্বজ্ঞান।'

সুখলতা বলিল, 'আর কিছুদিন পরে এ-দোষটা তোমার মুদ্রাদোষ হতে পারে। পুরুষের মুদ্রাদোষ মেয়েদের ভারি পছন্দ।'

জহর বলিল, 'পুরুষের সকল দোষই মেয়েদের পছন্দ। দুষ্টেরা তাই মেয়েদের ভালবাসার পাত্র।'

চোখ পাকাইয়া সুখলতা বলিল, 'এ বদনাম কেন দিচ্ছ মেয়েদের নামে ? তুমি কি ভাবো ভাল লোকদের মেয়েরা শ্রদ্ধা করতে জানে না ?'

'নিশ্চয়ই জানে। শ্রদ্ধা শুধু ? সম্মান করে এবং ভক্তি করে। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় মেয়েরা ভালবাসে তাদের যারা মেয়েদের পীড়ন করে, যারা দুঃখ দেয়, যারা কাঁদায়, যারা তাদের হতমান করে। মেয়েরা তাদের ভালবাসে যারা বর্বর, যারা জীবনের মূল্য বোঝে না, দুঃসাহসী ও দুর্দমনীয় যারা, যারা নিতান্তই অসামাজিক ও উচ্ছৃঙ্খল।'

সুখলতা হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'যত খুশি বলে যাও, কোন আপত্তি নেই। মেয়েদের ভালবাসার সম্বন্ধে কিছু একটা ফতোয়া দেওয়া আজকালকার ফ্যাশান।'

'নয় ত কি, আমি বৃন্দাবনে গিয়ে একবার একটি মেয়েকে দেখে-ছিলাম। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম স্বামীটির প্রতি মেয়েটির আর যাই থাক্ ভালবাসা নেই। অথচ স্বামীটি ভদ্র, রূপবান এবং অবস্থাপন্ন। সংসারে নিত্যদিন খিটিমিটি লেগেই আছে। বেচারী স্বামী, তার সহিষ্ণুতার আর অন্ত নেই। একদিন সে কিন্তু আর সইল না, স্ত্রীকে দিল বেদম প্রহার। সে প্রহার শুধু বাঙালী-মেয়েরাই সইতে পারে। আমি ত অবাক হয়ে দেশত্যাগ করলাম। তারপর

এই সেদিন কল্‌কাতায় দেখা। লোকটি আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়িতে নিয়ে গেল। ও হরি কোথায় সে অশান্তি? ছেলেপুলে নিয়ে পরমানন্দে তারা—'

সুখলতা কহিল, 'অর্থাৎ জোর ক'রে তারা ভালবাসা আদায় করলো?'

'ঠিক তাই, জোর ক'রে। শারীরিক ও মানসিক পীড়ন যারা মেয়েদের করতে পারলো না, বুঝতে হবে মেয়েদের তারা চিন্‌তে পারেনি।'

সুখলতা হাসিতে লাগিল। হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কি এই কথা বলে?'

'অভিজ্ঞতার কথা ব'লো না, অভিজ্ঞতাগুলো হচ্ছে বোকামির ইতিহাস। আমার প্রথম প্রেম আমার লজ্জা! সে প্রেমে ছিল হৃদয়াবেগ, মানসিক দৌর্বল্য, অলস দিবাস্বপ্ন রাত্রের অনিদ্রা, কাব্যের উচ্ছ্বাস আর চোখের জল। প্রথম প্রেম আমার জীবনের গভীর কলঙ্ক।'

সুখলতা কৌতুক বোধ করিয়া বলিল, 'কি রকম?'

জহর কহিল, 'ছেলেমানুষ কি না তাই নারীর প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, অপরিমিত সম্মান আর অজস্র অভিমান। তাকে আমি নিরালায় পূজা করতাম! প্রথম প্রেমের মতো এমন রোমান্স জীবনে আর কিছু নেই! সে ছিল আমার মনের আকাশে একটি মাত্র তারা, সে আমার ইহকালের অভিশাপ, পরকালের অদৃষ্ট; তার স্পর্শ মনে করলে আজও আমার বুকের ভেতর টিপ-টিপ করে।'

'তারপর?'

'তারপর যা হয়। অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত সচরাচর! সে প্রেম হ'লো ব্যর্থ! আমিও কাগজ-কলম নিয়ে পদ্য লিখতে বসলাম। কি ভাগ্যি সে-সব পদ্য মাসিকপত্রের সম্পাদকরা ছিঁড়ে ফেলেছিল, তাই রক্ষে।'

সুখলতা আর একবার উঠিল, উঠিয়া গিয়া দরজাটা খুলিল। তারপর আলোটা আনিয়া নামাইয়া খোলা দরজার কাছে রাখিয়া আবার আসিয়া শুইল। জহর বলিল, 'দরজা খোলা রাখলে ?'

'থাক, বন্ধ করবার দরকার নেই।'

'একটু ছিল বৈ কি, একেবারে বিসদৃশ লাগে যে। সকালবেলা রাস্তার লোক পর্যন্ত—'

'জ্বালাতন!' বলিয়া সুখলতা আবার উঠিল—'খুলে রাখলে লোকলজ্জা, বন্ধ করলে সন্দেহ; যাই কোথায় ?' বলিয়া সে দরজার একটিমাত্র কপাট ভেজাইয়া দিয়া আবার আসিয়া শুইল। টাকা-পয়সার পুঁটুলিটার কথা সে ভুলে নাই, সেটি তাহার কাছেই ছিল, হাত বাড়াইয়া পুঁটুলিটা সে জহরের কাছে সরাইয়া দিল।

'আমার কাছে দিলে কেন ?'

রাগ করিয়া সুখলতা কহিল, 'চোরে এসে যদি আমার গলা টিপে ধরে ? আজকাল যে রকম ডাকাতির দিন। আমি বাপু অপঘাতে মরতে পারবো না, তুমি যা হয় কর।'

অর্থের পরিমাণ সামান্য নয়। জহর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া উঠিল। উঠিয়া পুঁটুলিটি লইয়া খোলা দরজার ভিতরের দিকের একটি কোণে আড়াল করিয়া রাখিয়া আসিল। সুখলতা তাহার কূটবুদ্ধির প্রতি হাসিয়া বলিল, 'একেবারে পা বাড়িয়ে রইল যে।'

'সেই জন্যই যাবে না। অর্থের প্রতি অতি-সতর্কতাই অর্থনাশের কারণ।' বলিয়া জহর গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িল।

দুইজনেই কিয়ৎক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বাহিরে এবং আশেপাশে কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। দূরে কোথায় এইমাত্র একখানা স্টিমারের বাঁশী বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। সুখলতা আস্তে-আস্তে কহিল, 'তোমার সঙ্গে আলাপটা আমার অদ্ভুত, একেবারে বিচিত্র, নয় ?'

জহর শুধু বলিল, 'হ্যাঁ।'

সুখলতা বলিল, 'অত্যন্ত আকস্মিক আলাপ, আলাপ হবার আগে আমাদের কোন আয়োজন ছিল না, কোনো ভূমিকার দরকার হয় নি, কেমন?'

জহর কহিল, 'জীবনে এমন ঘটনা ঘটে, যাদের জীবনে ঘটে না তাদের চোখে আমাদের হঠাৎ-আলাপটা অত্যন্ত আজগুবী, তারা এ বুঝবে না।'

সুখলতা উত্তর দিল, 'স্ত্রী-পুরুষে একটু-একটু ক'রে যখন আলাপ হয় তখন বুঝতে হবে তাদের ভেতরে কোন উদ্দেশ্য আছে।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, সুবিধাবাদী বিধাতা অমনি তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণের আনন্দ সংযোগ করেন। ছেলেটি এগিয়ে যায় নানা ভঙ্গিতে, মেয়েটি আসে নানা ইঙ্গিতে।'

'কিন্তু আমাদের আলাপ এত সহজে হ'লো কেন?'

'তার কারণ আমাদের প্রয়োজন প্রেমের নয়, মিলনেরও নয়, আমাদের প্রয়োজন পরিচয়ের। ঝড়ের পাখি যখন উড়ে এসে ডুবো জাহাজের মাস্তুলের খোঁচায় বসলো, তখন তাদের কথা ভাবো। পরিচয়ের আনন্দ বোঝ ত?'

'তুমি আবার তত্ত্বকথা দিয়ে সহজ কথাটা ঢাকছ।'

জহরও হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'তার কারণ ঘুম পেয়েছে। চোখে যখন ঘুমের ঘোর লাগে তখন মানুষ সহজ কথা বলতে ভুলে যায়।'

সুখলতা এবার সানন্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'আমারো ঠিক তাই মনে হয়। যাদের কাছে কাজের কথা শোনবার আগ্রহ, ধরো দেশের বড় বড় গুণী-জ্ঞানীরা, তারা শোনায় তত্ত্বকথা। মনে হয় তারা জেগে নেই।'

জহর বলিল, 'আমাদের দেশে জেগে থাকে না একশ্রেণীর লোক, যারা কবি। ঘুমানো তাদের নেশা আর ঘুম পাড়ানো তাদের পেশা।'

আবার দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুখলতা বলিল, 'কাল ত আর মন্দিরে বসতে দেবে না, কোথায় যাবে?'

জহর ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, 'আমার যাবার জায়গা আছে, একটা জুয়াখেলার আড্ডায়। যাবার সময় গোটা-দুই টাকা বক্‌শিস দিয়ো, আমার দিন-পনেরো বেশ চলে যাবে।'

'পনেরো দিন পরে?'

'আবার নেই কাজ ত খই ভাজ।'

'পুরুষমানুষ তুমি, কাজ খুঁজে পাও না কেন?'

'এখনকার বাঙালী ছেলেরা পুরুষ কিনা সন্দেহ।' জহর কহিল, 'কিন্তু কাজ খুঁজে কেন পাবো না। যার কোন কাজ নেই তার আছে দেশের কাজ। এবার ভাবচি পিকেটিং করে জেল-এ যাবো।'

'আমাকেও তবে সঙ্গে নিও।'

'নিতাম, যদি সেখানে তোমার সঙ্গে আমায় থাক্‌তে দিত। আধুনিক সভ্যতাটা নিতান্তই বর্বর, জেল-এর মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে একত্র থাকতে দেয় না। সে-নিয়ম থাকলে স্বরাজ পাওয়া সহজ হ'তো।'

সুখলতা কহিল, 'সে-নিয়ম থাকলে জেলগুলো হ'তো 'প্রজাপতি-সঙ্ঘ।' বাজে কথা এখন ছাড় বাপু। তুমি নিজের কথাই ভাবলে, আমি কাল কোথায় যাবো বল ত?'

জহর কহিল, 'যেখান থেকে বেরিয়েচ সেইখানেই—'

চোখ পাকাইয়া সুখলতা কহিল, 'তুমি কি মনে কর সুবিধে পেলেই স্বামীর কাছে ফিরে যাবো, অন্তর থেকে যাকে ত্যাগ করেচি তাঁকে আবার গ্রহণ করবো কোন্ দৈন্যে? স্ত্রীলোকের যেখানে সব চেয়ে বড় আশা সেখানেই আমার বুক ভেঙেচে, যেখানে সব চেয়ে বড় আনন্দ সে জায়গা হয়েচে বিষাক্ত।'

'কিন্তু এই অছিলায় মেয়েরা যদি আজ ঘর ছেড়ে বেরুতে থাকে?'

'অছিলায় নয়, উৎপীড়নে। যদি তারা সাহস আর শক্তি নিয়ে বেরোয়, বুঝবো আজকের নারী-আন্দোলনের প্রাণ আছে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া জহর বলিল, 'যাক এত সহজে তোমাকে বোঝা যাবে আশা করি নি।'

'এই সামান্য কথাটা বুঝতে তোমার এত দেরী হ'লো?'

'সামান্যর পরে এত আবরণ যে, বেচারা দুঃশাসন একেবারে হয়রান। তুমি এখন তবে কি করবে? চাকৃরি?'

'হ্যাঁ, চাকৃরিই একটা খুঁজবো।'

জহর কহিল, তোমরা কিন্তু চাকৃরি খুঁজতে নামলে আমাদের সমূহ বিপদ। একেই ত দেশে বেকার সমস্যা, তার ওপর তোমাদের প্রতিযোগিতায় সকল জায়গায় পরাজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।'

'কেন তোমাদের যদি গুণ থাকে—'

'গুণ আমাদের অনেক, কিন্তু তোমরা যে মেয়ে। মেয়ে যদি খুনেও হয় তা হ'লেও বিচারালয়ে তার বিশেষ সম্মান। মেয়েদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মানুষের সহজাত। একটা মেয়ের জন্য একটা জাতি তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু একটা পুরুষের জন্য নয়। তুমি জানো সামান্য নারীর দেহ আজো এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগৎকে শাসন করচে?'

'তুমি বোধ হয় সে শাসনের বাইরে?' স্বখলতা কহিল।

'না, আমিও তা মাথা পেতে নিয়েচি। তুমি স্ত্রীলোক বলেই রাত জেগে-জেগে প্রলাপ বকৃচি, পুরুষ হলে ঘুমিয়ে এতক্ষণ ভোর হয়ে যেত। শুধু তুমি স্ত্রীলোক বলে, এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই।'

'আর একটা কারণ আছে।' স্বখলতা কহিল, 'তুমি তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিক বক্তারও অধম। তোমার ছ্যাকৃরা গাড়ি একবার চললে আর থামৃতে চায় না। তুমি যখন কথা বলো তখন আমি শুনিনে, শোন তুমি নিজে; তুমি যখন চুপ ক'রে থাক তখনই কথা বলে তোমার মন। তুমি কেবল কথার পুঁটুলি, চিন্তার স্তূপ, আর কিছু নও।'

জহর হাসিতে-হাসিতে পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

রাত শেষ হইয়া আসিয়াছে। দূর মন্দিরে প্রভাতী সংকীর্তনের অস্পষ্ট আওয়াজ ভাসিয়া-ভাসিয়া আসিতেছে। নিষ্প্রয়োজনের কথা কহিতে-কহিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল কিন্তু তাহাদের কাজের কথা এতটুকু হইল না, হইল না বলিয়া তাহাদের অস্বস্তিও কিন্তু নাই, অদূর ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া তাহারা যে ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে, এ আভাসটুকুও এই দুইটি নরনারীর মুখাকৃতি দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। ঘরের একদিকে টিপ্-টিপ্ করিয়া আলো জ্বলিতে লাগিল, অন্যদিকে জানালার ফাঁকটুকু দিয়া ভোরের আকাশ অল্প-অল্প শাদা হইয়া আসিতেছিল। শেষকালে আলো জ্বালিয়া রাখিবার আর প্রয়োজন রহিল না, দরজা দিয়া সকাল আসিয়া পড়িয়াছে। সুখলতা উঠিয়া গিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল।

আলোটা নিবাইয়া আসিয়া সে জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিল। জহর সাড়া দিল না, তখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। জানালার কাছে মুখ রাখিয়া সুখলতার মুখের ক্লান্তি ও ক্লেশ মুছিয়া গেল। শীতের ভোরের বাতাস ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। অল্প-অল্প কুয়াশার ভিতর দিয়াও বহুদূর পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি চলিতেছিল। নগরে কোলাহল তখনও জাগিয়া উঠে নাই, নিবিষ্ট নয়নে সেই দিকে তাকাইয়া সুখলতার একটিবার মাত্র মনে হইল, রৌদ্রদগ্ধ ও জীবন-সংগ্রামক্লিষ্ট শহর ও নিষ্কলুষ প্রাতের শহরের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ। গত রজনীর ক্লান্তি হইতে উঠিয়া একটি সুন্দরী নাগরী যেন সদ্যস্নান করিয়া পূজার্চনার আসনে বসিয়াছে। মুখে তাহার উজ্জ্বল আভা, চোখে অপূর্ব জ্যোতি। সুখলতা মুগ্ধ হইয়া এমন করিয়াই সেদিকে তাকাইয়া রহিল যে, চোখদুটি তাহার তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিতে বিলম্ব হইল না।

জহরের যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেশ রোদ উঠিয়াছে। চোখ রগড়াইয়া সে উঠিয়া বসিল। সুখলতা মেঝের উপর লেপটা পাতিয়া আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। চুলগুলি তাহার ধুলা

বালি মাথা। দরজার দিকে সে ফিরিয়া দেখিল, আলোটা ইতিমধ্যে ঘর হইতে কখন্ অদৃশ্য হইয়া গেছে, খুব সম্ভবত ভট্টাচার্য একবার আসিয়াছিলেন, তাহাদের না ডাকিয়া আলোটা লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। জহর হাসিল। যাক্, সুখলতা মেঝেতে শুইয়া ভট্টাচার্যের সন্দেহ হইতে নিজেকে খুব বাঁচাইয়া লইয়াছে। সন্দেহের পথ বাঁচাইয়া চলিতে মেয়েরা অভ্যস্ত।

আর ঘুমাইলে চলিবে না, একটা যা হোক কিছু বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ওই যা, জহর তাহাকে ডাকিবে কি বলিয়া? তাহার ভারি বদ্‌স্বভাব, মেয়েদের নাম মনে রাখা তাহার কিছুতেই হইয়া উঠে না। ফুল, ফল, নদী, গাছ, স্ত্রী-দেবতা, মানুষের কতকগুলি কোমল বৃত্তি, প্রকৃতির কতকগুলি ধাতু ও রূপ প্রভৃতি হইতেই ত মেয়েদের নাম সাধারণত নির্বাচিত হয়। এ মেয়ের কী নাম? জহর চিন্তিত হইয়া চারিদিকে তাকাইল, কিছুতেই তাহার মনে পড়িল না। শুন্‌চ—ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতেও তাহার বিসদৃশ লাগে। সে জোরে জোরে গলার সাড়া দিল, কিন্তু সাড়া নাই। জানালার কপাটে হাত চাপড়াইল, তবুও না, আগের মতোই খুর্‌-খুর্‌ করিয়া মেয়েটির নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া অবশেষে জহর নির্বাক হইয়া রহিল, তবু নামটি কিছুতেই তাহার মনে আসিল না।

হঠাৎ তাহার নজর পড়িল বাহিরে রোয়াকের ওধারে দরমার বেড়াটার দিকে। বেড়ার গায়ের গেরো খুলিয়া ছোট একখানা বাঁকারি ঝুলিতেছে, তাড়াতাড়ি গিয়া সেখানা সে খুলিয়া আনিল, তারপরে দূরে বসিয়া অতি সন্তর্পণে সে সুখলতার গায়ে দু-একবার খোঁচা দিল।

খোঁচা খাইয়া সুখলতা জাগিয়া উঠিল। মুখের কাপড় সরাইয়া সে উঠিয়া বসিল। বলিল, 'ও কি হচ্ছিল? কি বুদ্ধি তোমার? খোঁচা দিচ্ছিলে, যদি লেগে যেত?'

বাঁকারিখানা ফেলিয়া জহর বলিল, 'মেয়েদের গায়ে আমি সহজে হাত দিই নে।'

'সহজে কেউই দেয় না।' বলিয়া সুখলতা রাগে গর গর করিতে লাগিল।

বেলা ধীরে-ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছিল, রোদে চারিদিক ভাসিতেছে, ইহার পর পরের বাড়িতে অকারণ দাবি লইয়া আর বেশিক্ষণ থাকা চলে না। সুখলতা কহিল, 'খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ত জাগালে, এবার কি করবে কর?'

জহর বলিল, 'তৈরি হয়ে নাও।'

'আমি তৈরি হয়েই আছি।'

এমনি সময়ে ভট্টাচার্য আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'ও কি, সে হবে না বাবা, ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে বাসিমুখে চলে যেতে দেবো না। সকাল-বেলা উঠেই রান্না চাপাতে বলেচি—'

সুখলতা কহিল, 'ওসব আর কেন ঠাকুরমশাই, আপনাকে ঝঞ্ঝাট দেওয়া—'

'ঝঞ্ঝাট নয় মা, এ আমার কর্তব্য· তোমাদের ট্রেনের সময় কখন বাবা?'

জহর কহিল, 'সাড়ে এগারটার সময়।'

'ওঃ ঢের হয়ে যাবে তার আগে। তোমাদের স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দিই গে ততক্ষণ।' বলিয়া ছুটিতেছুটিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মুখের দিকে উঁকি মারিয়া সুখলতা বলিল, 'আঃ বাঁচ্‌লাম।' বলিয়া সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

জহর হাসিয়া কহিল, 'যা বলেচ, একবেলাকার মত নিশ্চিন্ত।'

সুখলতা বলিল, 'একবেলাকার মতো? তোমার মনে বুঝি ওবেলাকার আশাও আছে?'

করুণ কণ্ঠে জহর বলিল, 'দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাওয়া ত খুব বড় আশা নয়।'

মুখের একটা শব্দ করিয়া সুখলতা চুপ করিয়া রহিল।

যথা সময়ে ভট্টাচার্য মহাশয়ের আতিথেয়তায় তাহারা স্নান এবং আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিল। জহর স্মরণ করিয়া দেখিল, গত ছয় মাসের মধ্যে এমন সুখভোজন সে করিতে পায় নাই। গৃহস্থের অন্দরে গিয়া তাহারা পরস্পর সংযত হইয়া একটি আধটি মাত্র কথা বলিল। একজন পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, আর একজন গোপাল-পুরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঘরের ভিতর হইতে যখন সুখলতা নূতন ও ধোয়া শাড়ি, সেমিজ এবং গায়ের চাদর লইয়া স্মিত ও প্রসন্ন মুখে বাহির হইয়া আসিল তখন সকলে মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। অপূর্ব দেবীমূর্তির মতো তাহার আবির্ভাব। জহর এ সুযোগ ত্যাগ করিল না, কাছে গিয়া হেঁট হইয়া ভক্তিভরে তাহার পায়ের ধুলা তুলিয়া লইল।

সুখলতার মুখের উপর একটা রাঙা আভাস খেলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে জহরের মাথায় হাত রাখিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিয়া কোমল ও মধুর কণ্ঠে কহিল, 'আপনি আমাকে বার বার অপরাধী করছেন মাস্টারমশাই—বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে এমন করে পায়ের ধুলো নেওয়া—'

জহর বলিল, 'তা হোক, আমি অধম—'

মেয়েরা একে-একে প্রণাম করিয়া লইল। এই বাড়ির ও আশ-পাশের দু'চার জন মহিলা সুখলতার পায়ের কাছে টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। বিনীত কণ্ঠে সুখলতা কহিল, 'অনেক পেলাম, অনেক দিলেন আপনারা, আমি এর যোগ্য নই—মাস্টারমশাই, এ-প্রণামী তুলে নিয়ে রাখুন আপনার কাছে।'

জহর নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে টাকাগুলি তুলিয়া লইল।

ঠাকুরমশাই অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সুখলতা কহিল, 'এবার আমায় পায়ের ধুলো দিন বাবা।'

'সর্বনাশ, ও কথা বলিস নে মা, আমার অপরাধের সীমা থাকবে

না। ও-মাথা তোর হেঁট হবার মাথা নয় মা। তোর মতো সতী-সাধ্বীর পায়ের ধূলোয় আমার সংসার, আমার যে যেখানে আছে সবাই যেন উদ্ধার হয়ে যায়।' ভট্টাচার্যের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তাঁহার কণ্ঠের ও মনের আন্তরিকতা দেখিয়া মুহূর্তের জন্য সুখলতার সর্বাঙ্গ অপূর্ব আবেগে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। তাহার মুখভাব উপলব্ধি করিয়া জহর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'এবার আপনার যাত্রার সময় হয়েছে কিন্তু।'

'চলুন মাস্টারমশাই।' বলিয়া ধীরে ধীরে স্ত্রী-পুরুষের ভিতর হইতে সুখলতা পা বাড়াইল। সকলে ভক্তিভরে তাহাকে বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিল।

রাস্তায় নামিয়া কয়েক পা গিয়া সুখলতা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কিছু ফেলে আসো নি ত ?'

দুই পা অগ্রসর হইয়া জহর বলিল, 'বরং কিছু বেশি নিয়ে চলেছ সঙ্গে।'

'টাকাকড়ি তোমারই কাছে রেখো।'

হঠাৎ জহর স্তম্ভিত হইয়া বলিল, 'টাকার সেই পুঁট্‌লিটা ?'

সুখলতা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিল, বলিল, 'ফেলে এসেচ, যাও শীগ্‌গির—'

জহর ছুটিতে ছুটিতে আবার ফিরিয়া আসিল। ভট্টাচার্য তখনও দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের পথের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। বলিলেন, 'ফিরলে যে বাবা ?'

'ওঁর জপের মালার পুঁট্‌লিটা ফেলে গেছেন।' বলিয়া সে ঘরে উঠিয়া আসিয়া দরজার পাশ হইতে লুকানো টাকার পুঁট্‌লিটা তুলিয়া লইল।

ভট্টাচার্য কহিলেন, 'গাড়ি ঠিক পাবে ত বাবা ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা না গেলে গাড়ি ছাড়বেই না।'

'আহা, তা বটে, সতী কন্তে যাবেন কি না।'

জহর ততক্ষণে পথে নামিয়া চলিয়া গেছে।

আবার দু'জনে একত্র হইয়া চলিতে লাগিল। পোশাক-পরিচ্ছদ বদ্‌লাইয়া দু'জনেই ইতিমধ্যে বেশ সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে কোথায় এবং কোন দিকে যাইতে হইবে তাহারা গ্রাহ্য করিল না। সুখলতা উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, 'ভালো-ভালো দোকান যেদিকে আছে, চল, দু'জনে দু'জোড়া জুতো কিন্‌বো। আমার চটি হ'লেই চল্‌বে। তারপর কিন্‌বো আমার পেটিকোট্ আর তোমার জামা। শীত ত ফুরিয়ে এল, তুমি পাঞ্জাবী পরবে?'

জহর বলিল, 'ভিক্ষের চাল, তার আবার কাঁড়া-অকাঁড়া।'

'ভিক্ষে নয় গো ভিক্ষে নয়, প্রণামী। একটু দাঁড়াও দেখি?'

জহর দাঁড়াইয়া পড়িতেই সুখলতা সেই পথের উপরেই হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধুলো তুলিয়া লইল।

'এটা তা ঠিক বুঝতে পারলাম না?' ভ্রূ কুঞ্চন করিয়া জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

সুখলতা হাসিয়া বলিল, 'কাল থেকে কতবার আমার পায়ের ধুলো নিলে বল ত? আমি যে তোমার চেয়ে অনেক ছোট।'

জহর বলিল, 'তার চেয়ে জেনে রাখা ভাল আমরা কেউ কারো চেয়ে ছোট নই, দু'জনেই আমরা সমান। আমাদের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা শ্রদ্ধাও নয়, স্নেহও নয়। তোমার চেয়ে বড় হয়ে আমি তোমার নাগালের বাইরে যেতে চাই নে।'

'কিন্তু বয়সের সম্মান—'

'বয়েসের সম্মান নয়, মানুষের প্রতি মানুষের সম্মান। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি দুষ্ট প্রকৃতির, অনেক বালক মহৎ এবং উদার। তুমি যাকে সম্মান দেবে সে তোমার সম্মানের উপযুক্ত কি না এইটি দেখা দরকার। আমি যে-কোনো সঙ্কীর্ণচেতা বৃদ্ধকে অনায়াসে অপমান করতে পারি।'

'পারো? আমি কিন্তু পারি নে। এখানেই মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ।' সুখলতা বলিতে লাগিল, 'যাদের সত্যিই অসম্মান করা উচিত তাদের দেখে আমরা পালিয়ে যাই, কিন্তু অপমান করতে পারি নে। তাদের আমরা প্রতারিত করি, কিন্তু অপমান করি নে। আমি যেদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসি তার আগের দিন আমি স্বামী আর শ্বাশুড়ীর পরিচর্যা করেছি। তাদের আমি মনে-মনে ঘৃণা করেছি কিন্তু অপমান করি নি। অপমান করা সহজে মেয়েদের আসে না।'

একটা গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহারা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মাথার উপরে দুপুরের রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। পথে লোক চলাচল একটু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। একটা দোকান হইতে পান কিনিয়া চিবাইতে চিবাইতে তাহারা চলিল। কিছুদূর গিয়া সুখলতা বলিল, 'চল, ট্যাক্সিতে চড়ি, বেশ ছুটে যাওয়া যাবে।'

'কোথায় যাবে? ইডেন গার্ডেন?'

'না, শুধু ঘুরবো। ঘুরে-ঘুরে বেড়াবো।'

পথের উপর হইতে একখানা মোটর ডাকিয়া তাহারা চড়িয়া বসিল। ড্রাইভারকে বলিল, উত্তর দিকে গাড়ি চালাইতে। কোথায়, তাহা কিছু বলিল না। গাড়ি যখন ছুটিতে লাগিল তখন পিছন দিকে হেলান দিয়া আরাম করিয়া দুইজনে বসিয়া রহিল।

একবারটি কেবল সুখলতা বলিল, 'ঘুমুই এসো আমরা দু'জনে। ঘুম ভাঙলে গাড়ি থেকে নাম্‌বো। মোটরে চড়তে কি আরাম বল ত?'

জহর বলিল, 'যন্ত্র-সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।'

বহুক্ষণ ধরিয়া তাহারা মোটরে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে জহর ড্রাইভারকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছিল। সুখলতা শুধু কাৎ হইয়া চোখ বুজিয়া আছে, এক-একবার আরামে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

ঘণ্টা-খানেক পরে এক জায়গায় আসিয়া জহর গাড়ি দাঁড় করাইল। বলিল, 'এবার নামো।'

সুখলতা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'এই তোমাদের দোষ। একেবারে ভেসে যেতে পারো না।'

দুইজনে নামিল। জহর পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিল। অর্থব্যয় নিতান্ত অল্প হইল না। শিখ ড্রাইভারটা যাইবার সময় তাহাদের সেলাম করিয়া গেল। ফুটপাথে উঠিয়া সুমুখেই দোকান। জহর বলিল, 'এ বাজারটায় গরু হারালেও খুঁজে পাওয়া যায়। কি কিন্‌বে বল?'

একে-একে ফর্দ করিয়া দুইজনে এক-একটা দোকানে উঠিয়া জিনিস-পত্র কিনিতে লাগিল। জহরের বিশ্বাস, কলিকাতার দোকানদাররা ঠকায় না, সুতরাং দর-দস্তুর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যাহারা মফস্বল হইতে আসিয়া কলিকাতার লোক বলিয়া গর্ব করিয়া বেড়ায় তাহারাই দর-দস্তুর করিয়া কলিকাতার ভদ্র দোকানদারগুলিকে অসম্মান করে। জহর মনে করে, জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এদেশের মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ। লোটা, কম্বল এবং ছাতুকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা আজিও এই দরিদ্র ভারতবর্ষের মান রক্ষা করিতেছে। কোনো কাজ না থাকিলে সে বড়বাজারে বেড়াইতে যায়, মনে-মনে মাড়োয়ারীদের তারিফ করিবার জন্য। একবার পকেটকাটা সন্দেহ করিয়া একটা গোয়েন্দা তাহাকে বড়বাজার হইতে বরাহনগর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। শেষকালে একটা ভাঙা বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া পিছনের দরজা দিয়া জহরকে অতি কষ্টে অদৃশ্য হইতে হইয়াছিল।

জামা-কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে খরিদ করিয়া তাহারা আবার পথে নামিয়া আসিল। কিছুদূর গিয়া একটা জুতার দোকানে সুখলতা ঢুকিবার চেষ্টা করিতেই জহর বাধা দিয়া বলিল, 'ও-দোকানে নয়, অন্য জায়গায় চল।'

'কেন? এ ত বেশ বড় দোকান।'

'ওখানে আমি চাকৃরি করতাম।'

'চাকৃরি করতে? জুতোর দোকানে?'

'চাকৃরি, তা সে যেখানেই হোক্।'

'তা ত বটেই। অমন সুখের চাকৃরি ছাড়লে কেন? মেয়েরা বুঝি জুতো কিন্‌তে আসতো না?'

'সেই জন্যেই ছাড়তে হয়েছিল।' জহর বলিল, 'বিশেষ কারণে স্বত্বাধিকারীকে জুতো মেরেছিলাম।'

'জুতো মেরেছিলে, এই অহিংস যুগে?' সুখলতা হাসিয়া বলিল।

জহর বলিল, 'তখন অহিংস ছিলাম না, অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া অভ্যেস ছিল।'

অন্য একটা দোকানে তাহারা আসিয়া উঠিল।

কাঁসারিপাড়ায় একটা বাড়ির দরজার কাছে আসিয়া জহর কড়া নাড়িল। কিয়ৎক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের সাড়া আসিল, 'কে গো?'

জহরের হইয়া সুখলতা উত্তর দিল, 'দরজাটা একবার খুলুন ত?'

মিনিট-দুই পরে দরজা খুলিল। ভিতর হইতে একটি মহিলা গলা বাড়াইয়া হঠাৎ জহরকে দেখিয়া ভিতরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সুখলতা তাঁহার কাছে অগ্রসর হইয়া গেল। নমস্কার করিয়া বলিল, 'আপনাদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে বলে লেখা রয়েচে। ক'খানা ঘর আছে সবশুদ্ধ?'

মহিলাটি কহিলেন, 'দু'খানি ঘর আর রান্নাঘর। আপনাদের ক'খানা দরকার?'

সুখলতা কহিল, 'দু'-তিন খানা হ'লেই চল্‌বে। রাস্তার দিকটা বুঝি ভাড়া দেবেন?'

মহিলাটি অলক্ষ্যে একবার সুখলতার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিলেন, 'এসে দেখুন না ভেতরে! পছন্দ হ'তেও পারে, অবশ্য আপনাদের উপযুক্ত কি না—'

জহরকে ইঙ্গিতে দাঁড় করাইয়া সুখলতা ভিতরে প্রবেশ করিল। মহিলাটিকে কুণ্ঠিতভাবে অনুসরণ করিতে দেখিয়া বলিল, 'বড়লোক বলে আমাদের সন্দেহ করবেন না, আমরাও মধ্যবিত্ত।'

আলো-হাওয়া যুক্ত দুইখানি ঘর দেখিয়া অতি সহজেই পছন্দ হইয়া গেল। পছন্দ করিয়া সুখলতা কহিল, 'ভাড়া কত বলুন ত?'

মহিলাটি এমন ভাড়াটে পাইবার জন্য মনে মনে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। নারীর রূপের প্রতি নারীর একটি ঈর্ষা মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে। তিনি কহিলেন, 'এঁরা সবাই অফিসে গেছেন, ফিরবেন সন্ধ্যের পর। তাঁরা থাকলে বলতেন, কুড়ি টাকা। আপনাদের কিছু কমেও হতে পারে। বরাবর থাকবেন ত?'

সুখলতা হাসিল। বলিল, 'সে কি বলা যায়? যারা এই চুক্তিতে ঘরভাড়া নেয় তারা মানুষ নয়, মরা মানুষ।' বলিয়া সে আবার হাসিল।

মহিলাটি এই সুযোগে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, 'আপনার সঙ্গে উনি বুঝি স্বামী?'

সুখলতা হাসি বন্ধ করিল না, বলিল, 'বুঝতেই পারছেন।'

'সে ত বটেই, না বললেও বোঝা যায়। আসুন আপনারা, এই ঘরেই থাকুন। ওরা এলে বল্‌বো কুড়ি টাকার কিছু কম করতে।'

'কুড়ি টাকাও দেওয়া যেতে পারে, ঘর আপনাদের ভালই।' বলিয়া সে জহরকে ডাকিবার জন্য বাহিরে আসিল। মুটের মাথায় জিনিসপত্র লইয়া জহর তখন পথের উপর উদাসীন হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে। মুটে মোটশুদ্ধ ইতিমধ্যে পালাইলেও হয় ত তাহার হুঁশ হইত না।

মোট লইয়া জহর ভিতরে আসিয়া জিনিসপত্র নামাইল। পয়সা লইয়া মুটে যখন চলিয়া গেল আড়ালে ডাকিয়া মহিলাটি তখন সুখলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাদের আর জিনিসপত্র কোথা?'

সুখলতা বলিল, 'আনতে হবে, এই কাছেই আমার বাপের বাড়িতে সব আছে। আমরা আজ সকালে এলাহাবাদ থেকে ফিরলাম কি না?'

'বাপের বাড়িতে ঝগড়া করে এসেচেন বুঝি?'

'ঝগড়া নয় মতান্তর।' সুখলতা কহিল, 'তা ছাড়া বাপের বাড়িতে মেয়েদের বেশিদিন থাকা উচিত নয়। ভায়েদের মন ভারী হয়ে ওঠে।'

'তা সত্যি, ঠিক বলেচেন। আপনার স্বামী কি করেন? চাকরি করেন না?'

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'চাকরি ছাড়াও মানুষের বাঁচবার উপায় আছে। উনি অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করেন।'

মহিলাটি বোধ করি এবার খুশি হইতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, যে-লোক চাকরি করে না, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং যোগ্যতা একটু অল্প। যাহা হউক, ভিতরে খবর দিবার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন।

দুইটি ঘর পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুখলতা খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইল। দেওয়ালগুলি সে ভাল-ভাল ছবি টাঙাইয়া ভরিয়া তুলিবে। ঘর সাজাইবার ইচ্ছা তাহার প্রচণ্ড নয়, কিন্তু সাজানো ঘর দেখিবার ইচ্ছা তাহার প্রচুর। তাহার মতে কিছুই স্থায়ী নয়, স্থায়ী নয় বলিয়াই সব জিনিসের সৌন্দর্য এত আনন্দদায়ক। স্থায়ী অনড় আরামের মূল্য তাহার কাছে নাই, ক্ষণকালের আনন্দ তাহার কাছে অনেক বড়। সে ক্ষণিকবাদিনী।

এ ঘরে আসিয়া সে কহিল, 'এবার তোমার বিশ্রাম, বসো তুমি। আমি একবার বাজারে যাবো কিনতে কাটতে। কিছু পয়সা কড়ি বরং দাও। মেঝেতে বসলে কেন, বিছানাগুলো কেনা হ'লো কি জন্যে? ওগুলো গুছিয়ে পাতো, আমি আসচি।'

পয়সা কড়ি লইয়া সুখলতা বাজার করিতে বাহির হইয়া গেল। বাজার খুব কাছেই, ছোট বাজার। কলিকাতায় প্রত্যেক তিন শত গজের মধ্যে একটি করিয়া বাজার। বাজারে গিয়া সুখলতা চাল-ডাল কিনিল, তরিতরকারি কিনিল, মশলা-পাতি কিনিল। নূতন সংসারের অন্যান্য সরঞ্জাম কিনিতে ভুলিল না। বাজার করিতে-করিতে তাহার নেশা ধরিয়া গিয়াছিল। ফিরিবার সময় জিনিসপত্র লইয়া একখানা গাড়িভাড়া করিয়া সে দরজায় আসিয়া পৌঁছিল।

গাড়ি ভাড়া চুকাইয়া দিল। জহর জিনিসপত্র নামাইয়া লইল। উপযুক্ত ঘরে সুখলতা যে কত বড় ঘরণী হইতে পারিত তাহা এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া জহর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল। সুখলতা ভিতরে আসিয়া দেখিল, জহর ইতিমধ্যে সমস্ত গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

যে-কথাটা এতক্ষণ পর্যন্ত কাহারও মনে হয় নাই, তাহাই এবার ভয়ানক চেহারা লইয়া দুইজনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

জহর বলিল, 'সব ত হ'লো, তারপর?'

সুখলতা বলিল, 'তারপর কি?'

'এসব কি জন্যে? কেন?'

সুখলতা কিয়ৎক্ষণ জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল। সুমুখে কয়েকখানা বাড়ির মাঝখান দিয়া একটা আমগাছের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে, রৌদ্রটুকু পড়িয়া গেলেই শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবে। সেইদিকে চাহিয়া নিতান্ত শিশুর মতো সে বলিল, 'তাই ত, কেন বল ত? দু'জনের যে দু'দিকে চলে যাবার কথা! আমার এতক্ষণ মনেই ছিল না।'

সমস্ত আয়োজন একটি মুহূর্তেই যেন দুইজনের চোখে নিতান্ত মিথ্যা হইয়া গেল। কী প্রয়োজনে এতক্ষণ তাহারা অকারণে পরিশ্রম করিতেছিল। স্পষ্ট সুখলতার মুখের দিকে তাকাইয়া জহর বলিল, 'একসঙ্গে থাকার কৈফিয়ৎ কি বলতে পারো? কিসের বাঁধাবাঁধি?'

সুখলতা তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া কহিল, 'তোমার মন অত্যন্ত সুচেতন।'

'সে আমি জানি।' কথাটা ঘুরাইয়া জহর বলিল, 'যাদের মন অতিরিক্ত সচেতন তারা কোনদিন আত্মহারা হয়ে কিছু করতে পারে না। তারা বুঝলে না উচ্ছ্বসিত প্রেম কাকে বলে, কাকে বলে নিঃস্বার্থ ত্যাগ। তাদের খানিকটা স্বার্থপরও বলা চলে। রাশ তাদের সহজে আল্গা হয় না, অত্যন্ত করুণার পাত্র তারা। সে আমি বুঝি।'

'নিজের সম্বন্ধে তোমার তা হ'লে ধারণা নেই।'

'কোনো ধারণাই নেই। তবু বলবো নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আমার একটু কম। আমি পরনিন্দা ভালবাসি নে, ভালবাসি আত্মনিন্দা। আত্মনিন্দার দ্বারা আত্মশুদ্ধি শাস্ত্রে লেখা নেই বটে, কিন্তু আমার মনে লেখা আছে।'

সুখলতা কথা কহিতে গিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, গৃহস্বামিনী আবার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জহরের নিকট হইতে কুড়িটি টাকা লইয়া সে উঠিয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিল। বলিল, 'ভাড়াটা অগ্রিম দিয়ে রাখাই ভাল, আপনাদেরই সুবিধে।'

গৃহস্বামিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'টাকা ত নিতে আসিনি ভাই, বলতে এসেছিলাম আপনাদের এ-বেলাকার খাবার আমাদের এখানেই হোক্ না। রান্না চড়িয়ে দেবে কি?'

সুখলতা একবার জহরের দিকে তাকাইল। তারপর বলিল, 'একদিন বরং নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবেন, আজকের মতো আমিই ক'রে নিতে পারবো। রান্নাঘরে উনুন পাতা আছে ত?'

'হ্যাঁ, নতুন উনুন এই সেদিন মাত্র—'

'তা হ'লেই হবে।'

মহিলাটি চলিয়া যাইবার সময় ব'ললেন, 'ওরা এলে ভাই রসিদ দেবো।'

সুখলতা একগাল হাঁসিয়া কহিল, 'মনে ক'রে নিশ্চয়ই দেবেন, নৈলে রাত্রে আমাদের ঘুম হবে না।'

মুখখানি নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া মহিলাটি ভিতরে চলিয়া গেলেন। তিনি অদৃশ্য হইবার পর জহর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'এদিকে যে কুবেরের ভাণ্ডার নয়, তা মনে আছে ত?'

সুখলতা তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কলসীর জল গড়িয়ে যে ফুরিয়ে এল। বাড়িভাড়া ত ক'রে বসলে, তারপর?'

সুখলতা বলিল, 'তারপর তুমি পুরুষমানুষ, একটা উপায় করতে পারবে না? আর কত আছে তোমার থলিতে?'

'দুটাকা ক' আনা মাত্র। চল বেরিয়ে পড়ি, ঘরে আমার ভাল লাগে না।'

'চল ঘুরে আসা যাক্। ঘরে বসে থাকলেই পুরুষমানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

নূতন জুতা ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিয়া তাহারা বাহির হইল। যাইবার সময় দুইটা ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া গেল।

বিকাল-বেলাটা কলিকাতার নাড়ী এই সময় চঞ্চল হইয়া উঠে। নগর মাত্রই চঞ্চল ও অস্থির। অস্থিরতাই আধুনিকতার বর্তমান রূপ। যাহারা অস্থির নয়, তাহারা পিছনে পড়িয়া থাকে। শহরে কেহ কাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না—আত্মীয়হীন, বন্ধুহীন কলিকাতা শহরে যাহারা বাস করে, তাহারা মাত্র জীবন ধারণ করে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকে না। এখানে দুইটি বস্তু নাই, মাটি ও মমতা। মাটি এখানে কিনিয়া ব্যবহার করিতে হয়। মাটির সহিত যাহাদের

সংস্পর্শ নাই তাহারা শহরবাসী, কিন্তু মানুষ নয়। যাহারা মাটি পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারা মমতাহীন।

পথে গল্প করিতে-করিতে দুইজনে চলিতেছিল। আজকাল নারী-আন্দোলন হইয়া একটিমাত্র সুবিধা হইয়াছে যে, পথে নারী দেখিলে এখন আর কেহ কাঙালের মতো হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে না। যে-দেশের পথে-ঘাটে ইতস্তত নারী দেখা যায় না, সে-দেশের যুবকগণের মনে অস্বাস্থ্যকর দেহলালসা জমিয়া উঠে। চোখ এবং মন তাহাদের উপবাস করিয়া করিয়া জীর্ণ হইতে থাকে। জহরের ধারণা নারীর সঙ্গলাভ করিলে এবং তাহাদের উৎসাহ পাইলে দেশে আরও অনেক বীর যুবক জন্মাইতে পারিত। নারীর সঙ্গলাভের ইচ্ছা চাপিয়া থাকিলে মনের মধ্যে ভীরুতা ও কাপুরুষতা আশ্রয় পায়। মেয়েদের স্বাধীনতাই জাতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপ।

সুখলতা হাসিয়া কহিল, 'পরাধীন দেশের একটা ভয়ানক অভিশাপ যে তাদের মেয়েরা গৃহবন্দিনী।'

'তার ফল কি জানো ত?'

'জানি।' সুখলতা কহিল, 'তার ফল নারী-হরণ। যে-দেশে আজো নারী-হরণ হয় সে-দেশে সতীত্বের বড়াই করে কোন্ লজ্জায় আমি বুঝতে পারি নে।'

জহর কি-একটা মন্তব্য করিতে যাইতেছিল, সুখলতা হাত বাড়াইয়া একখানা রিক্সা গাড়ি ডাকিল। ফুটপাথের ধারে রিক্সা থামিতেই তাহারা দুইজনে উঠিয়া পাশাপাশি বসিল। রিক্সাওয়ালা ঘুঙুর বাজাইয়া তাহাদের টানিয়া লইয়া চলিল। চলিল সোজা উত্তর দিকে। জহর একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'যদি কোনো চেনা লোক দেখে?'

'কার চেনা? তোমার, না আমার?'

জহর বলিল, 'আমার চেনা লোক দেখলে খুশি হবে, কিন্তু তোমার চেনা লোক?'

'আমার চেনা লোক যদি দেখে তা হ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে।'

অনেক দূরে গিয়া সে গাড়ি থামাইল। বলিল, 'এসো, একটা দরকারি কাজ সেরে যাই।'

দুইজনে গাড়ি হইতে নামিল। বাঁ-হাতি একটা রাস্তার মধ্যে বাঁকিয়া প্রকাণ্ড এক ধনীর বাড়ির কাছে আসিয়া তাহারা মুহূর্তমাত্র এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর রিক্সাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে সটান্ প্রবেশ করিয়া গেল।

দরোয়ান তাহাদের সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সুখলতা জহরের পাশাপাশি আসিয়া সুমুখের বড় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। বৈঠকখানায় ঢুকিতে গা ছম্-ছম্ করে। সুমুখে ইজি-চেয়ারে যিনি বসিয়াছিলেন, মনে হইল তিনিই এ বাটীর মালিক। আশেপাশে জনকয়েক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক বসিয়া গৃহস্বামীর দিকে গভীর উৎকণ্ঠায় তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুই-একজন চেয়ার ছাড়িয়া সরিয়া গেল।

গৃহস্বামী বলিলেন, 'বসুন আপনারা, কি চান্?'

দুইজনে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চেয়ার টানিয়া বসিল। বসিয়া প্রথমেই জহর কথা কহিল, 'আপনার কাছে দু'বার আমরা এসেছি কিন্তু দেখা পাবার সুযোগ ঘটে নি।'

'ও। বলুন কি চাই?'

বিনীত কণ্ঠে জহর বলিল, 'আপনি 'মহিলা-সংসদে'র নাম শুনেছেন? কাগজে সম্ভবত দেখে থাকবেন।'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'মহিলা-সংসদ, না সমিতি?'

'অনেকে সমিতিও বলে। ইনিই সেখানকার সেক্রেটারী।' বলিয়া সে সুখলতাকে দেখাইয়া দিল। তারপর পুনরায় কহিল, 'নতুন সমিতি, ইনি আর ক'জন মহিলাকে নিয়ে অতিকষ্টে

আরম্ভ করেছেন—অবস্থা ত তেমন ভাল নয়, সবারই সমান—'

'কি হয় সেখানে?'

গলা পরিষ্কার করিয়া বীণানিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে সুখলতা সুন্দর হাসি হাসিয়া কহিল, 'এই ধরুন মেয়েদের শরীর চর্চা, লাইব্রেরী, বিনা-বেতনে ইস্কুল, সঙ্গীত-শিক্ষা—'

'ও, বেশ, বেশ—'

জহর বলিল, 'আপনি অবস্থাপন্ন, আপনার কাছে, যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্যে উনি—'

ভদ্রলোক একটু হাসিলেন। সুখলতা কহিল, 'আপনাদের ভরসা ক'রেই এই দুরূহ কাজে নামা, যদি উৎসাহ দেন তা হ'লে—' বলিয়া এমন করিয়া সে তাঁহার দিকে তাকাইল যে ভদ্রলোকটি বিন্দুমাত্রও অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আর্থিক সাহায্য পেলেও কি এ-সমিতি তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারবে মা?'

সুখলতা কহিল, 'বাঁচানোটা দেশের মেয়েদের হাত, আমার শুধু পরিশ্রম।'

'সমিতির চাঁদা ওঠে না?'

'ওঠে কিছু-কিছু, কিন্তু সে অতি সামান্যই!'

ভদ্রলোক ড্রআর খুলিয়া পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া সুখলতার হাতে দিলেন। বলিলেন, 'আমার সাহায্যও সামান্য, তোমার আশানুরূপ নয় মা। তবু কিছুদিন পরে যদি মনে হয়, আর একবার এসো।'

সুখলতা সকৃতজ্ঞ নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, 'সামান্য হোক, আপনার কাছে যে উৎসাহ পেলাম এই আমাদের অনেক।'

দুইজনে উঠিয়া অগ্রসর হইল। ভদ্রলোক জহরের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, 'স্বামী-স্ত্রীতে বেরিয়েচেন সমিতিকে বাঁচাতে?'

জহর বিনীত হাসি হাসিল, তারপর দুইজনে তাঁহাকে পুনরায়

একবার সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়া উপস্থিত সকলের মুখের উপর দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রিক্সা দাঁড়াইয়াছিল, দুইজনে ঘেঁষ ঘেঁষি করিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া বলিল, 'যাঁহা খুশি লে চলো।'

সুখলতা বলিল, 'ভাবছিলাম শ'খানেক টাকা দেবে।'

ক্ষুব্ধস্বরে জহর কহিল, 'নিজের রূপ সম্বন্ধে তোমার দেখছি ভয়ানক ভাল ধারণা।'

'সে ধারণা কি অন্যায়? তুমি যে বিশ্বনিন্দুক, তুমিই সত্যি ক'রে বল ত?' বলিয়া সুখলতা এমন করিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইল যে, তাহার গরম নিঃশ্বাসটা জহর নিজের মুখের উপর অনুভব করিতে লাগিল। সুমুখের একটা গ্যাসের আলোয় দেখা গেল, এই শীত-কালেও সাগুর দানার মতো সুখলতার মুখে, কপালে ও গলায় ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে।

জনকোলাহল ও যান-বাহনপূর্ণ কলিকাতার রাজপথের দিকে জহর একবার ফিরিয়া তাকাইল এবং সেইদিকে তাকাইয়াই সে কহিল, 'অত ক'রে হাঁপাচ্ছ কেন?'

সুখলতা কহিল, 'তোমার মতো জোচ্চুরিতে এখনো হাত পাকেনি, বোধ হয় তাই জন্যে।'

'এ ত জোচ্চুরি নয়, এ উপার্জন।'

'উপার্জনের কি ধর্মপথ নেই? তুমি বল কি?'

'উপার্জন একদিকের কথা, ধর্মপথ আর একদিকের। কেউ রোজগার ক'রে জুয়া খেলে, কেউ কেরানীগিরি ক'রে, কেউ বা মহিলা-সমিতির নাম ক'রে।'

সুখলতা তাহার অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া হাসিতে লাগিল। জহরের সমস্ত যুক্তি লইয়াই তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু তর্ক করিলে তাহার কথার কৌতুকটুকু একেবারে চলিয়া যায়। সুখলতার মন রসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিল তাহারা অনেক রাত্রে। ফিরিবার আগে তাহারা টিকিট কিনিয়া থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছে। থিয়েটার হইতে তাহারা গিয়াছিল এক হোটেলে। হোটেল হইতে পুনরায় ট্যাক্সি করিয়া ফিরিল।

সুখলতা বলিল, 'উপবাসের পর মানুষ যা পায় তাই খায়।'

জহর কহিল, 'হ্যাঁ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে।'

অন্ধকারে ঘরে ঢুকিয়া তাহারা আলো জ্বালিল। আলো জ্বালিয়া তাহাদের মনে পড়িল, আহার্যবস্তু এত পরিমাণে থাকিতে হোটেলে খাইয়া আসা তাহাদের উচিত হয় নাই। কিছুক্ষণ পূর্বে ফিরিয়া রান্না চড়াইলেই ভাল হইত। জিনিসপত্র আজিকার মতো সমস্তই শুকাইতে লাগিল। সুখলতাকে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়া জহর বিছানাগুলি ছড়াইতে লাগিল।

এ-ঘরে বিছানা পাতিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিল। এ ঘরটি ও-ঘরটির চেয়ে ভাল—ভাল এবং সুন্দর। জহর পাতিল নূতন সতরঞ্চি, নূতন তোষক ও ধোয়া চাদর। চাদর পাতিয়া গায়ে দিবার কম্বল গুছাইয়া রাখিল। জিনিসপত্রগুলি একপাশে সুবিন্যস্ত করিল।

অত্যন্ত মনোনীত বিছানা পাতিয়া জহর হাসিয়া ডাকিল, 'শোনো বলি।'

সুখলতা উঠিয়া আসিয়া এ-ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। বলিল, 'নাম ধরে ডাকতে কি হয়েচে? নাম বুঝি শোনো নি?'

'তোমার নামটা কিছুতেই আমার মনে থাকে না।' জহর বলিল।

সুখলতা তাহার সদ্য প্রস্তুত বিছানার দিকে চাহিয়া কহিল, 'মনে থাকবার কথাও নয়, কারণ সে আমার মিথ্যে নাম। আমার নাম সুখলতা নয়।'

জহর নির্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইল, তারপর কহিল, 'তবে?'

সুখলতা বলিল, 'মিথ্যে কথা বলা আমার ভয়ানক অভ্যাস। আমার সত্যি নাম হচ্ছে, শ্রীমতী।'

'শ্রীমতী? ও! নামটা মন্দ নয়। তোমাকে বেশ মানায়।' বলিয়া সে একবার এই পরমাসুন্দরী যুবতীর মাথা হইতে পা পর্যন্ত চোখ বুলাইয়া লইল। মনে হইতে লাগিল, একটা মানুষ যেন অকস্মাৎ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। জহর পুনরায় বলিল, 'সকল নামের মধ্যে তোমরা একই মেয়ে।'

শ্রীমতী কহিল, 'এ তোমার তত্ত্ব।'

'তত্ত্ব নয় বন্ধু, এ সত্য।'

শ্রীমতী পুনরায় কহিল, 'তোমার নাম কি শুনি?'

'জহর।'

'জহর? জহর? আগে জান্‌লে আমার নাম বলতাম হীরে।' বলিয়া আলোর দিকে চাহিয়া উচ্চ কণ্ঠে শ্রীমতী হাসিয়া উঠিল।

জহর বলিল, 'তোমার হাসির শব্দে পাথরে চিড় ধরে শ্রীমতী,' বলিয়া সে নিজেও হাসিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

৩

সকাল-বেলা দুইজনে দুই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। উঠিতে তাহাদের বেলা হইয়া গিয়াছে এবং এতই বেলা হইয়াছে যে ও-পাশের গৃহস্থেরা পুরুষদের আফিস্‌-ইস্কুল পাঠাইয়া ধীরে-সুস্থে আলাপ-আলোচনা করিতে বসিয়াছিল। এ রকম নিদ্রা যাহাদের, মনে হয় এ-জগতে কোনো দায়িত্বের বোঝা বহন করিতে তাহারা আসে নাই।

শ্রীমতী কহিল, 'বাপ রে, কী ঘুম তোমার? আমাকেও হার মানালে যে!'

জহর কহিল, 'সারা রাত জেগে, ঘুম এল ভোর রাত্রে। একেই ত ঘরের মধ্যে শুয়েছি, তাতে আবার নরম বিছানা—সমস্ত রাত গায়ের রক্ত কিলবিল করছিল, কী অস্বস্তি।'

'তবে রাস্তায় গিয়ে শুলেই পারতে?'

জহর একবার হাসিল, তারপর কহিল, 'শক্ত কাঠের তক্তা, ছেঁড়া আর দুর্গন্ধ বিলিতি কম্বল, শীতের ঠাণ্ডা ফুটচে সর্বাঙ্গে; একবেলা উপবাস—এমনি অবস্থায় আমার হয় গভীর নিদ্রা। নরম আর গরম বিছানায় শুয়ে পিঠে কাঁকর ফোটে কেমন, একথা বোঝবার সাধ্য মেয়েদের নেই শ্রীমতী।'

'তা নেই হয় ত।' বলিয়া শ্রীমতী একটু হাসিল, তারপর পুনরায় বলিল, 'ওটা অভ্যেস! তোমাকে বল্‌চি নে, কিন্তু যারা কুকুর, তাদের পেটে ঘি হজম হবার কথা নয়। যাদের চরিত্র দুর্ভাগ্যের মধ্যে গড়ে উঠে তারা—'

জহর বলিল, 'তোমার ঘুম হয়েছিল ত?'

'নিশ্চয়! নরম বিছানায় শুলে আমার গায়ে অমন সুড়সুড়ি লাগে না। কতবার ঘুমিয়েছি, কতবার জেগে উঠেচি তার সংখ্যা নেই। আহ্লাদে সমস্ত বিছানাটাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনটা কাদামাটির মতো, এক ছাঁচ ভেঙে আর এক ছাঁচে বেশ তুলতে পারি।'

মুখ টিপিয়া জহর বলিল, 'ত, ত দেখতেই পাচ্ছি।'

অসাবধানে শ্রীমতী বোধ করি কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিল, এবার অপ্রস্তুত হইয়া তিক্ত কণ্ঠে বলিল, 'পাচ্ছ নাকি? খুব বুদ্ধিমান ত?' বলিয়া সে গামছাখানা হাত বাড়াইয়া লইয়া কাপড় কাচিতে যাইবার আগে বলিয়া গেল, 'তা বলে একটা কথা ভুলো না যেন, মেয়েরা মুখে যা বলে, মনে-মনে তার বিরুদ্ধ কথাই ভাবে।'

তাহার পথের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া জহর বলিল, 'তোমার লীলা ও লাস্যটুকু মন্দ নয় শ্রীমতী।'

কলের ঘর হইতে শুধু নারীকণ্ঠের উচ্ছৃঙ্খল হাসির শব্দ শোনা গেল।

স্নান করিয়া শ্রীমতী যখন পরিষ্কার রাঙাপেড়ে শাড়ি পরিয়া বাহির হইয়া আসিল তখন তার স্নিগ্ধ ও শান্ত মূর্তি দেখিয়া জহর বলিল, 'এবার বোধ হয় রান্নাবান্না চড়াবে? বিলিতি বেগুনের অম্বল ক'রো কিন্তু।'

শ্রীমতী গম্ভীর হইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তাহার এই অনাবশ্যক গাম্ভীর্যটুকুতে আনন্দ বোধ করিয়া জহর পাশের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতী তখন পিছন ফিরিয়া দেয়ালে একটা হাতের ভর দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিয়াছে। জহর গলা পরিষ্কার করিয়া কহিল, 'ভারি ধোঁকা লাগলো, তাই ছুটে এলাম। বিলিতি বেগুন শুনে তোমার কি কোনো অতীত-স্মৃতি মনে পড়লো?'

শ্রীমতী তাহার দিকে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া আবার গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, কথা কহিল না। মন তাহার তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জহর বলিল, 'আচ্ছা বেশ, রান্না করতে বলায় চটে গেছ, আমি না হয় উনুনটা ধরিয়ে···একবার তীর্থের পথে বেরিয়ে সমস্ত রাস্তাটা আমি দলবলকে রেঁধে খাইয়েছিলাম। তা ছাড়া এটা সাম্যবাদের যুগ, মেয়েরা আজকাল পুরুষের সমান···আমি রান্না কচ্ছি।' বলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

উনুন ধরাইতে বসিতেই শ্রীমতী পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'রান্নাবান্না তুমি নিজের জন্যেই ক'রো। আমি আজ আর খাবো না।'

'সে কি?' জহর ঘাড় ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, 'স্বামী থাকতেই তুমি একাদশী করবে?'

শ্রীমতী স্পষ্ট করিয়া এতক্ষণে আসল কথাটাই বলিয়া ফেলিল, 'তোমার সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না।'

'ও এই কথা!' একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া জহর পুনরায় কহিল, 'তুমি বনিবনা হবার জন্যে অপেক্ষা করছিলে? তা ছাড়া এমন বে-আইনী বনিবনা কেনই বা হবে? আঃ—আমি বাঁচলাম!'

'আমি চলে যাবো এখুনি।' শ্রীমতী উদাসীন হইয়া কহিল।

'বেশ ত, আমি ত তোমায় বেঁধে রাখিনি? তুমি ত যাবেই! তুমি এখুনি যাবে, পরেও যাবে, তোমার থাকাটাই হবে অস্বাভাবিক! সেইজন্যেই ত বল্‌চি, আমার হাতের রান্নাটা পরমানন্দে খেয়ে যাও যাবার সময়। বাঁধাকপির তরকারি কেমন রাঁধি দেখবে?'

'তুমি আমাকে অপমান করেচ বলেই যাচ্ছি।'

'ও!' বলিয়া জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া পুনরায় বলিল, 'তাই নাকি? কি কথায় লোকে অপমানিত হয় আমার জানা নেই। লেগেচে বুঝি খুব?'

শ্রীমতী কহিল, 'অপমান এখনও আমার লাগে।'

জহর হাসিতে লাগিল, খানিকটা হাসিয়া বলিল, 'মনে শুধু তোমারই লাগে, আমার লাগে না! বেশ ত, তা যাবার সময় একবার আমার হাতের রান্নাটা খেয়ে যাবে না? শুধু নিজের জন্যেই রাঁধবো? তরকারিগুলো যে আলুনি লাগ্‌বে?'

'লাগুক।' বলিয়া শ্রীমতী আবার চলিয়া গেল।

জহর চুপ করিয়া সেখানে বসিয়া রহিল। উনুন সে ধরাইবেই, রান্না সে করিবেই, আহার এবং বিশ্রাম করিবার এমন সুবর্ণ-সুযোগ সে কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। শ্রীমতীর অভাবে তাহার সমস্ত বিস্বাদ লাগিবে এমন আশঙ্কাও নাই। কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো তাহাদের পরস্পরের আকস্মিক ঠোকাঠুকি লাগিয়াছিল, দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেলে আবার তাহার তিন দিন আগেকার পরিচিত জীবনের স্রোত দিনের পর দিন ধরিয়া তেমনি করিয়াই বহিতে থাকিবে। দিনমানের খররৌদ্রে কলিকাতার পথে-পথে টহল দিয়া বেড়াইবে, বিদেশে বিভুঁয়ে জলপথে, যেখানে হউক, যাত্রা করিবার

জন্য সে সুযোগ খুঁজিতে থাকিবে, রাত্রি হইলে অন্ধকারে কোথায় ঘুমাইবার স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে, জুয়ার আড্ডায় গিয়া ধার করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিবে এবং ফিরিবার সময় সেই বৃদ্ধা ভিখারিণীকে বকশিস্ দিয়া আসিবে, যাহাতে সে পুলিশে ধরাইয়া না দেয়—সে-জীবনের সহিত এক রকম তাহার বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতীকে আবিষ্কার করিবার পর হইতে এমন আশা সে মনে-মনে একটি মুহূর্তের জন্যও পোষণ করে নাই যে, শ্রীমতীর নিকট হইতে সে ভালবাসা পাইবে, আনন্দ পাইবে; অথবা এই নারীটির সহিত সে ঘর করিবে, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবে। এত বড় ফাঁকি, এত বড় বাতুলতা তাহার নাই। এ কয়েকটি দিনের ইতিহাস জহর মনে-মনে স্মরণ করিয়া দেখিল, তাহাদের হাসিতে, গল্পে, আলাপে, আলোচনায়, পথে-বিপথে আগাগোড়া বিচ্ছেদের সুরই থাকিয়া-থাকিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় সত্য যে তাহাদের মধ্যে কোনো সেতু নাই বলিয়া বন্ধনও কিছু নাই; থাকা এবং চলিয়া যাওয়া তাই ছিল পরস্পরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, যে কোন মুহূর্তেই একজন আর একজনের নিকট হইতে চিরদিনের মতো অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারিত।

জহর আস্তে-আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর এধারে আসিয়া দেখিল, গায়ে একখানা চাদর জড়াইয়া শ্রীমতী চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, পিছন দিক হইতে সে কহিল, 'আচ্ছা তুমি কি সকাল থেকে চলে যাবারই সুযোগ খুঁজছিলে? সুযোগ না খুঁজে সহজেই ত যেতে পারতে শ্রীমতী?'

শ্রীমতী ঘাড় না ফিরাইয়াই বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তোমার সকল কথার আমি উত্তর দিতে পারি নে।'

জহর বলিল, 'বেশ, তা না হয় নাই দিলে, কিন্তু এই যে একঘর জিনিসপত্র কিনলে, তুমি চলে গেলে এর বোঝা বইবে কে? এসব ত তোমারই। তোমারই পয়সায়—'

শ্রীমতী উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিল, 'আমি কিছুই সঙ্গে ক'রে আনি নি মনে রেখো। ঘরকন্নার অত শখ আমার নেই।'

'আমারো নেই শ্রীমতী। চলে আমারই যাবার কথা তুমি থাকো, যতই হোক এসব তোমার। তোমার সঙ্গে এই কটা দিন আমার আনন্দে কাট্‌লো। এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আর কিছুক্ষণ যদি আমায় ক্ষমা করো তা হ'লে একমুঠো ভাত খেয়ে যেতে পারি, আবার হয় ত কতদিন আহার জুটবে না।'

শ্রীমতী একবার ঘাড় ফিরাইল। বলিল, 'গলার আওয়াজ নরম ক'রে আবার সহানুভূতি টান্‌বার চেষ্টা কেন? এসব তোমার ফন্দি।'

জহর হাসিয়া উঠিল। বলি , 'এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমার বনিবনা হয়েছিল। মেয়েদের মন সাধারণত উচ্ছ্বাসে অভিভূত থাকে, তোমার তা নেই। তোমার মধ্যে ধোঁয়ার চেয়ে আলো বেশি।'

'থাক্‌ আর খোশামোদে কাজ নেই। আমি কী তা আমি জানি।'

জহর হাসিয়া চলিয়া আসিল।

ও-বাড়ির সেই বউটি এতক্ষণ সিঁড়ির ধারে আসিয়াছিল, জহর চলিয়া যাইতেই সে ভিতরে ঢুকিল। মৃদু হাসিয়া বন্ধুর মতো জিজ্ঞাসা করিল, 'একবার এসে উঁকি মেরে দেখে গেছি, আপনি তখন ঘুমোচ্ছেন। বাবা রে, অত বেলা অবধি আপনি ঘুমোন?'

শ্রীমতী তাহার উত্তরে হাসিয়া বলিল, 'আপনি নয়, আপনারা। সত্যি, এক একদিন এমন ঘুমোই যে, জেগে দেখি দিন পুইয়ে রাত হয়েচে। ঘুমের টানে ঘুম আসে।'

বউটি কহিল, 'এখনো রান্না চড়ান নি? বেলা অনেক হয়ে গেল।' শ্রীমতী কহিল, 'আর বলবেন না, এই মাত্র স্টোভ খাবার হয়ে গেল। রাঁধতে আমাদের বেলাই হয়। এইবার গিয়ে উনুন ধরাব।' মনে মনে কিন্তু সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বউটি একবার এদিক-ওদিক তাকাইল, তারপর গলা নামাইয়া চুপি-চুপি কহিল, 'আপনি কাল আলাদা ঘরে শুয়েছিলেন কেন?'

শ্রীমতী কহিল, 'ছুটো শোবার ঘরই ব্যবহার করা উচিৎ, তাই জন্যে!'

'তাই জন্যে আলাদা শোবেন? ঘুম হয়?'

'ঘুম আরো বেশি হয়। পুরুষমানুষকে ঘরে রাখার মতো ঝকমারি আর কিছু নেই [illegible] তো [illegible]র নয়, মাঝে-মাঝে আলাদা শুই।'

বউটি একটু-একটু করিয়া গল্প করিতে দাঁড়াইয়া গেল। বলিল, 'আপনি বেশ আছেন, ছেলেপুলে হওয়া ভারি ঝঞ্চাট!'

শ্রীমতী কহিল, 'ছেলের মা হবার মতো মন আমার নয়। না হওয়াই ভাল।' বলিয়া সে একটু হাসিল।

বউটি বলিল, 'আপনার স্বামী যে আজ কাজে বেরোলেন না?'

'মাঝে-মাঝে বেরোলেই ওর চলে।'

ঘরের ভিতর তাকাইয়া বউটি পুনরায় কহিল, 'ভারি অগো-ছালো হয়ে রয়েচে। আপনি একা মানুষ, একা হাতে কতই বা পারবেন।'

শ্রীমতী কহিল, 'গোছানো আমার হয়ে উঠে না। আমি বাস করতে পারি, ঘর করতে পারি নে। শৃঙ্খলা আমার পায়ে শৃঙ্খলের মতো বাজে।'

বউটি মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল 'কী মেয়ে আপনি!'

'সত্যি বলচি।' শ্রীমতী বলিল, 'সংসারে আমার একটিমাত্র কাজ, দিন কাটানো! একটি দিন পার হয়ে যখন আরেকটি দিনে এসে পড়ি তখন আমার পক্ষে কী শান্তি বলুন ত?'

বউটি মনে-মনে বিস্মিত হইল। স্ত্রীলোকের এরকম আত্মগুবী চিন্তার সহিত তাহার কোনকালে পরিচয় নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাদের কোনো অভাব চোখে পড়ে না, অশান্তি কিছু সত্যকারের

আছে বলিয়াও মনে হয় না, গত কাল হইতে যেটুকু ইহাদের পরস্পরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উভয়কে কলহ-প্রকৃতির বলিয়াও মনে হইবার কথা নয়। বউটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, 'আপনি কি মনে কচ্ছেন আমাদের মধ্যে তেমন বনিবনা নেই? আমার কথা শুনে তাই ভাবছেন বোধ হয়?'

বউটি ঘাড় নাড়িল, তারপর বলিল, 'জিজ্ঞেস করতে আমার সাহস হচ্ছিল না ভাই।'

'আমিই বলছি।' বলিয়া শ্রীমতী একটু থামিল, তারপর কহিল, 'আমাদের মধ্যে যে রকম বনিবনা এরকম বাংলাদেশে ক্বচিৎ কোনো মেয়ে-পুরুষের ভাগ্যে ঘটে। তা ছাড়া বিয়ের অনেকদিন আগে থেকেই আমরা দু'জনে দু'জনকে জানি কিনা, সেই ছোটবেলা থেকে—'

'সত্যি? এ ত বেশ!' বউটির চোখদুটি বড়-বড় হইয়া উঠিল।

শ্রীমতী বলিতে লাগিল, 'একই গ্রামে ছিল আমাদের বাড়ি, গ্রামের কোলে চম্পানদীর তীর, উত্তর দিকে ছিল তার কুল-খেজুরের ঘন বন, আমরা সেই নদীর তীরে আর বনের ধারে মানুষ হয়েচি। এক পাঠশালায় পড়েচি, এক জায়গায় খেলা করেচি, একসঙ্গে সাঁতার কেটেচি।' শ্রীমতী কোমলকণ্ঠে স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, 'গ্রীষ্মকালের দুপুরে সেই ঘন বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় আমরা ধীরে-ধীরে এগিয়ে যেতাম। এই ছিল আমাদের নেশা। এমন নয় যে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করতো। আমাদের স্বভাবই ছিল বনে-জঙ্গলে নদীর ধারে মাঠের পথে ঘুরে বেড়ানো। অনেক-দিন পর্যন্ত আমরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম. গলা ধরাধরি ক'রে ছুটোছুটি করা ছিল আমাদের একটা ভয়ানক আনন্দ এমনি করেই দিন যেত। সেই থেকে প্রকৃতির পট-ভূমিকায় আমরা দু'জনকে ভালবেসেছিলাম।'

বউটি বলিল, 'সেই থেকে ছাড়াছাড়ি হয় নি?'

শ্রীমতী কহিল, 'সাধারণ জীবনে ছাড়াছাড়ি হওয়াই স্বাভাবিক, আমাদের তা হয় নি, আমাদের পেছনে আছে আমাদের স্বাধীন মন! আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার উপায় নেই।'

বউটি বলিল, 'চমৎকার! চমৎকার আপনার গল্প।'

শ্রীমতী যখন হাসিয়া বাহির হইয়া আসিল, বউটি তখন আ। দাঁড়াইল না, ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

জহর উনুন ধরাইয়া রান্না চড়াইতেছিল, শ্রীমতী দেখিল সে একেবারে নিখুঁত আয়োজন করিয়া বসিয়াছে। পিছন দিক হইতে কহিল, 'হয়েচে, ঢের হয়েচে, এবার উঠে দাঁড়াও।'

হুকুম শুনিয়া জহর টপ্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতী গিয়া উনুনের সুমুখে বসিয়া পুনরায় বলিল, 'দস্যির মতো গায়ে জোর আমার নেই, বাটনা বাটতে পারবো না, বরং রেঁধে দিয়ে যেতে পারি।'

জহর বিনীত কণ্ঠে কহিল, 'আচ্ছা আমি বাটনা বেটে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি নিতান্তই খেয়ে যাবে না?'

'চুপ একেবারে।' বলিয়া শ্রীমতী নিজের কাজ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কাটিয়া গেল, তারপরই জহর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'চোখ রাঙানো শাসন সহ্য করা আমাদের অভ্যেস। ও আমাদের আর গায়ে লাগে না।'

'গণ্ডারের চামড়া যে।' শ্রীমতী ক্ষুব্ধকণ্ঠে পুনরায় কহিল, 'বন্দুকের গুলি ছাড়া লাগে না! মার না খেলে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়?'

'ঠিক বলেছ শ্রীমতী।'

'আবার?' বলিয়া শ্রীমতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, 'আবার তোমার ওই খোশামোদের সুর? যাও আমার বাটনা বেটে দিতে হবে না। তোমার ছোঁওয়া যেন আমার পেটে না যায়।'

'আমি ত বামুনের ছেলে।'

'থাক্, বামুনের ছেলে হলেই বামুন হয় না। যাও এখন সুমুখ থেকে।'

'বাঁচলাম।' বলিয়া উঠিয়া জহর তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেল। ধোঁয়ায় তাহার চোখ দুটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কাপড় দিয়া রগড়াইয়া মুছিতে লাগিল।

শ্রীমতী গর গর করিতে-করিতে রান্না চড়াইল। আয়োজন যাহা প্রস্তুত ছিল তাহা সে কাটছাঁট করিয়া সঙ্কুচিত করিল। তাহার মনে এমন এক জায়গায় চিড় ধরিয়াছে যাহার সংস্কার করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। সত্যই ত, এমন থাকিবার তাহার প্রয়োজন কি? সে কি স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এই জন্য? পথে নামিয়া সে নূতন করিয়া সংসার রচনার স্বপ্ন দেখিতে আসে নাই। এ-লোকটির সহিত এমন করিয়া দিন এবং রাত্রি কাটাইবার তাৎপর্য কী থাকিতে পারে? পথ ভুল করিবার সম্ভাবনাও তাহার নাই, ভুল সে করেও নাই কোনোদিন, এ-লোকটিকে জড়াইয়া ধীরে-ধীরে সে কোথায় চলিয়াছে?

জহর স্নান করিয়া রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতীর রাগ ততক্ষণে একটু পড়িয়া গিয়াছে। বলিল, 'কিছু মনে ক'রো না, তোমাকে অনেক বক্‌লাম। তুমি আমার জন্যে অনেক করেচ, তোমার উপকার আমি ভুলবো না।'

জহর বলিল, 'এই শুক্‌নো কথাগুলো তোমাকেও আমার বলা উচিত।'

'এই শুক্‌নো কথাগুলোতেই জগতের বাজার চলে মনে রেখো।'

'তা চলুক।' জহর বলিল, 'কিন্তু একটা কথা আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তুমি চলে যাবার অমনি একটা ফিকির খুঁজছিলে শ্রীমতী। তুমি যাবার সময় হাসিমুখেই চলে যেতে পারতে, আমার বাধা দেবার কিছু ছিল না।'

'হাসিমুখেই ত যাবো!'

'না এর পরে তোমার মুখে হাসি আর মানাবে না।'

তরকারি নামাইয়া শ্রীমতী বলিল তা বলে ফিকির আমি খুঁজি নি। যারা ফিকির খোঁজে তারা দুর্বল। আমি যে এখানে বসবাস করতে আসিনি, এটা তোমার জানা উচিত।'

জহর হাসিল, হাসিয়া বলিল, 'একথা বলে আমাকে লজ্জা দেবার চেষ্টা নাই বা করলে। তুমি কতক্ষণে চলে যাবে আমিও তারই অপেক্ষায় আছি এবং চলে যখন যাবে তখনও ভুলেও একবার জিজ্ঞাসা করবো না, কোন্ পথে তুমি যাবে, কেন যাবে অথবা গিয়ে আবার ফিরবে কি না।'

শ্রীমতী নীরবে রান্না করিতে লাগিল, কোনো জবাব দিল না। কিন্তু কয়েকক্ষণ পরে প্রশ্ন না করিয়া সে থাকিতে পারিল না। বলিল, 'কোথায় যাবো তাও জিজ্ঞাসা করবে না?'

'না। সে নীতিই আমার নয় শ্রীমতী। কোথায় আমার কতটুকু অধিকার সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ সচেতন।'

'আমি যখন আর ফিরবো না, এ বাড়ির লোকদের তুমি তখন কি বলবে?'

জহর আবার হাসিয়া বলিল, তুমি কি ভাবছ, তুমি চলে যাবার পরেও আমি এখানে বসে ঘরকন্না করবো। আমি যখন নিরুদ্দেশ হই তখন আমি নিজেকেও আর খুঁজে পাই নে।'

শ্রীমতী বলিল, 'তবে যে এত জিনিসপত্র কেনাকাটা হ'লো—'

'তোমাকে আগেই বলেছি এসব আমার নয়, তোমার।'

'আমি ত আর সঙ্গে নিয়ে যাবো না।'

'আমিও নেবো না এটা তোমার জানা উচিত।' জহর বলিল।

শ্রীমতী কহিল, 'তা বলে তুমি মনে করো না, এসবের ওপর আমার এতটুকু মায়া-মমতা আছে। যাবার সময় পিছন ফিরে চাওয়া আমার চরিত্রে লেখা নেই।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে আমার চরিত্রের বিশেষ

তফাৎ নেই, তবে আমি যখন যাই তখন সুমুখের দিকেও তাকাই নে। আমার অতীতের দিকে কুহেলিকা, ভবিষ্যতের দিকে কুয়াশা।'

রান্না হইয়া গিয়াছিল, থালায় তরকারি সাজাইয়া শ্রীমতী ভাত বাড়িয়া দিল। জহর আসিয়া খাইতে বসিবার আগে বলিল, 'তোমার ভাত বুঝি আগে বেড়ে নিয়েচ?'

'হ্যাঁ।' বলিয়া শ্রীমতী তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, 'তুমি ভাবছিলে তোমার খাওয়ার পর তোমার পাতে আমি বসবো?'

'রাম বলো। বে-আইনী কথা আমি ভাবি নে।' বলিয়া জহর খাইতে বসিয়া গেল।

একটা অহেতুক তাচ্ছিল্যভরে শ্রীমতী পরিবেশন করিতে লাগিল। মনে হইল পাছে কোথাও যত্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে এজন্য ইচ্ছা করিয়াই সে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহার কোন যুক্তি ছিল না। পাতে নুন দিল, কিন্তু তাহার পরিমাণ এত যে সমস্তটা খাইলে মানুষের মৃত্যু হয়। গেলাসে এমন করিয়া জল ঢালিয়া দিল যে, গেলাসের মাথা ছাপাইয়া জল গড়াইয়া জহরের বসিবার জায়গা পর্যন্ত ভিজিয়া একাকার হইল। সমস্ত ভাতের মাথায় এমন করিয়া ঘি ছড়াইয়া দিল যে সবটা পেটে গেলে কলেরা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঘিয়ের বাটি ফুরাইয়া যাইতেই জহর বলিল; 'আরেকটুকু দিলে পারতে, ঘি আমার একটু বেশি খাওয়া অভ্যেস।'

শ্রীমতী বলিল, 'কিনে আনোগে তবে দোকান থেকে।'

জহর বলিল, 'যে পরিবেশন করে তারই যাওয়া উচিত, শাস্ত্রে লেখা আছে।'

'আমার গুরুঠাকুর এসেছেন।' বলিয়া শ্রীমতী গর-গর করিয়া খাইতে বসিল। পরমানন্দে আহার করিতে-করিতে এক সময়ে জহর শ্রীমতীর পাতের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'তুমি বোধ হয় তরকারি একটু বেশিই খাও, না শ্রীমতী?'

শ্রীমতী নিজের পাতে তরকারির পরিমাণ দেখিয়া একটুকু লজ্জিত হইল না। বরং বলিল, 'আমার পাতের দিকে অমন নজর দিও না।'

জহর বলিল, 'শাকসব্জি বেশি খেলে বোধ হয় চেহারা দেখতে ভালই হয়।'

শ্রীমতী কহিল, 'কেবল বাজে কথা! খেতে বসলে যে বিরক্ত করে সে ইতরের মুখ দেখতে নেই।'

'তাই বটে।' জহর বলিল, 'আমি একবার একজনদের বাড়ির গোয়ালে রাত কাটাবার জন্যে ঢুকেছিলাম। শান্ত গরু, গরুরা চিরকাল শান্তই হয়, কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে পড়তেই তেড়ে এলো সিং বেঁকিয়ে, ফিরে দেখি জাবর খাচ্ছিল।' বলিয়া সে হাসিল।

শ্রীমতীও এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, 'যার যেখানে জায়গা সে নিজেই তা বেছে নেয়।'

কি বলিতে গিয়া কি হইয়া গেল। জহর একটু আহত হইয়া বলিল, 'আমাকে আঘাত ক'রে তুমি যদি হাসিমুখে যেতে পারো ত আমার আপত্তি নেই।'

তরকারিগুলি আগেই খাইয়া ফেলিয়া জহর শুধু ভাত বসিয়া-বসিয়া খাইতেছিল। শ্রীমতী অন্য কথায় ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, 'খাওয়ার ওই কি ছিরি? ভাত খাচ্ছ না জাবর কাটচ?'

জহর বলিল, 'অনাদরের ভাত জাবর কাটারই মতো। পূর্বজন্মে জীবন-জোড়া দুঃখের প্রতিবাদ যারা করতে পারে নি, পরজন্মে তারা গরু হয়েই জন্মায়, তারা জাবরই কাটে।'

পিতলের একটা হাতা দিয়া শ্রীমতী নিজের থালা হইতে তরকারি তুলিয়া তাহার পাতে দিল। বলিল, 'এইতে যেন সব ভাত খাওয়া হয়। ও-বেলা ত কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই, খাবার আরো বেঠিক, ভাত যেন ফেলে উঠো না।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'এই কি তোমার আসল চেহারা? এই স্নেহের স্পর্শটুকু?'

শ্রীমতীও তাকাইল তাহার মুখের দিকে। বলিল, 'ছুঁতেই তুমি নুয়ে পড়লে বুঝি? এটুকু যে অতি সাধারণ ভদ্রতা?'

'হঠাৎ এই ভদ্রতা কেন?'

শ্রীমতী কহিল, 'এবার যে বিদায় নেবার পালা, তাই জন্যই—'

'তাই জন্যই এই ভদ্রতার প্রয়োজন?'

জহর হাত ধুইতে উঠিয়া পড়িল। শ্রীমতীও উঠিল, বেলা থাকিতে থাকিতেই তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। কোথায় যাইয়া কি করিবে সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। আজই বাহির হইয়া সে কোথাও একটা চাকুরি খুঁজিয়া লইবে। মেয়েদের জন্য আজকাল কলিকাতার পথে ঘাটে যেখানে সেখানে চাকরি পড়িয়া আছে—এই তাহার ধারণা। অর্থোপার্জনের মতো সোজা কাজ জগতে আর কিছু নাই পথে-পথে টাকা পয়সা ছড়ানো, কেবল কুড়াইয়া লইবার কৌশলটুকু জানা দরকার! কোটি-কোটি লোকের মতো শ্রীমতীও অতি সহজে সে-কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইবে! অর্থোপার্জন সম্বন্ধে জহরের অক্ষমতা স্মরণ করিয়া অনুকম্পায় তাহার মন ভরিয়া আসিল।

গায়ে চাদর ও পায়ে চটি জুতা পরিয়া সে প্রস্তুত হইয়া লইল। জহর তাহার আগেই জুতা পরিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে। সে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'তুমি কোনদিকে যাবে?'

জহর বলিল, 'এই দিকেই যাবো ভাবচি। তুমি?'

'আমি যাবো ও-দিকে।'

'ও।' বলিয়া তাহার পথের দিকে একবার তাকাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া জহর বলিল, 'আচ্ছা—নমস্কার।'

'নমস্কার।' বলিয়া শ্রীমতী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, জহর তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হাত তুলিয়া সে আর একবার নমস্কার করিল, কিন্তু জহর তাহার প্রত্যুত্তর দিল না। শ্রীমতী গলা বাড়াইয়া কহিল, 'সমস্ত

কল্‌কাতা শহর আজ ঘুরে-ঘুরে বেড়াবো। চাকরি আমি খুঁজে বার করবোই।'

জহর কি যেন একবার ভাবিল, তারপর তাড়াতাড়ি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। কাছে গিয়া পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া বলিল, 'এ টাকাকড়ি তোমার, তুমি নিয়ে যাও।'

'না না, সে কি, তোমার চল্‌বে কি ক'রে?' ব্যস্ত হইয়া শ্রীমতী হাত সরাইয়া লইল।

'আমার চল্‌বে, আমি জুয়া খেলতে জানি। তুমি ত আর সে ইক্‌রোমো কর্‌তে পারবে না! এ টাকা তুমি সঙ্গে রাখো।'

শ্রীমতী কহিল, 'তা হলে তোমার সঙ্গেও কিছু থাক্‌?'

'কিছুই থাকবে না।' বলিয়া শ্রীমতীর একটা হাত টানিয়া ধরিয়া জহর টাকাগুলি তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। বলিল, 'টাকার অভাবে অসম্মানের আঁচ যেন গায়ে না লাগে।'

শ্রীমতী কম্পিতকণ্ঠে কহিল, 'সব দিলে, কিছুই রইলো না যে তোমার!'

'কিছুই রইলো না বটে!' বলিয়া জহর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একপ্রবার মলিন হাসি হাসিল এবং তারপর আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া চলিতে লাগিল।

শ্রীমতী পথের উপরেই একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। জহরকে আর একবার ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনে হইল, গলার আওয়াজ তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে! মাথার উপরে সূর্য খররৌদ্র বর্ষণ করিতেছিল। অদূরে মালবোঝাই বহিয়া কয়েকখানি গরুর গাড়ি মন্থর গতিতে চাকার আওয়াজ করিতে-করিতে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে আসন্ন বসন্তকালের এলোমেলো বাতাস থাকিয়া থাকিয়া ধূলা জঞ্জাল উড়াইয়া বহিয়া চলিয়াছিল। বহুদূর পথ; গন্তব্য যেখানেই হউক, পথ অসীম এবং অপরিমিত; ইহার মধ্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহার চলিবে না। পা বাড়াইয়া শ্রীমতী আবার

আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। একথা আর অস্বীকার করিলে চলিবে না, জহরের সহিত সে সদ্ব্যবহার করিয়া আসে নাই। এই বিনষ্টজীবন যুবকটির প্রতি ইচ্ছা করিলে সে আরও একটু কোমল হইতে পারিত।

রৌদ্রক্লিষ্ট জনবিরল পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, যে পরিচয় সে জহরের কাছে দিয়া আসিল তাহাই তাহার চরম আত্ম-পরিচয় নয়। উপকার পাইলে সে কৃতজ্ঞ হইতে জানে, ভদ্রতা দেখিলে সে মনে-মনে প্রশংসা না করিয়া পারে না। সংসার যদিচ তাহাকে আজ পর্যন্ত শিখাইয়াছে মানুষের সহজ স্নেহ ও মমতাকে পদদলিত করিতে, তবুও অন্তরে অন্তরে এই দুর্দিনের বন্ধুটির প্রতি নম্রচিত্তে সে আর একবার নমস্কার না জানাইয়া থাকিতে পারিল না।

ধূলা ও রৌদ্রের ভিতর দিয়া যতদূর পর্যন্ত শ্রীমতীর সুন্দর তনুলতাটি দেখা যাইতে লাগিল, জহর একটা বাড়ির বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। মনে হইল, তাহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া একটি অনাস্বাদিতপূর্ব মর্মকামনা শ্রীমতীর পিছু-পিছু অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। শ্রীমতী আসিয়াছিল ঠিক প্রদীপের আলোকের মতো, সেই আলোয় জহর আপন অন্তস্থলের চারিদিক দেখিতে পাইয়াছিল, শ্রীমতী চলিয়া যাইবার পর আবার যেন তাহার ভিতরটা ধীরে-ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। অন্ধকার হইয়া থাকিয়াই সে চিরদিন জীবনের বহু বিচিত্র রূপ দেখিয়াছে, অন্ধকারে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সে পথ আবিষ্কার করিয়াছে, অন্ধকারেই নিজেকে সে চিনিতে শিখিয়াছে। নিরন্ধ্র নিশীথিনীর বিজনপ্রান্তে বসিয়া সে আপন অন্তর্দেবতার অশ্রুকাতর দীর্ঘনিশ্বাস শুনিয়াছে। জীবনে যাহারা আলোকের মুখ দেখিতে পায় নাই তাহারাই তাহার বন্ধু ও সহচর। অন্ধকার তাহার শয্যা, অন্ধকারেই তাহার বিশ্রাম।

বড় রাস্তার ফুটপাথ ধরিয়া সে আবার চলিতে লাগিল। শ্রীমতী তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল একথা ভাবিবার প্রয়োজন তাহার ছিল না। এমন নয় যে এই নারীটির প্রতি তাহার কোন-রূপ আসক্তি ছিল। আসক্তি হইতে বেদনা, বেদনা হইতে বিলাপ। শ্রীমতীর জন্য বিলাপ করিবে—সে স্তর হইতে বহুদিন সে নামিয়া আসিয়াছে। নারীর জন্য বিলাপ করিবার মতো বিশুদ্ধ আবেগগুলি তাহার শুকাইয়া গিয়াছে। তবু এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না শ্রীমতীকে ঘিরিয়া তাহার নিশ্বাস পর্যন্ত গন্ধমধুর হইয়া উঠিয়াছিল, সে নিশ্বাস আবার তাহার দিন দিন মলিন হইয়া আসিবে। শ্রীমতীর সহিত একত্রে বসবাস করিয়া তাহার সর্বাঙ্গে পুঞ্জ-পুঞ্জ চঞ্চল জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, আবার তাহা পথের ধূলায় এবং রৌদ্রে প্রতিনিয়ত নিস্তেজ হইতে থাকিবে। শ্রীমতীর প্রতি তাহার আসক্তি নাই, কারণ যে-সূর্য আলোক এবং উত্তাপের দ্বারা মানুষের প্রাণসঞ্চার করে তাহার প্রতি আসক্তি থাকিতে পারে না। যে-নদী আপন মমতার প্রাচুর্যে লোকালয়কে কোলে করিয়া রাখে তাহার প্রতি আসক্তি অস্বাভাবিক; যে-লক্ষ্মী ধান্যে ও শস্যের দ্বারা মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে তাহার প্রতি কাহারও আসক্তি থাকিবার কথা নয়। শ্রীমতীর প্রতি আসক্তি জহর ভাবিতেও পারে না। চলিতে চলিতে সে একবার উপর দিকে তাকাইল। মনে হইল, পৃথিবীতে বসন্ত-ঋতু সবেমাত্র প্রবেশ করিয়াছে। শীতের জড়তা আকাশে আর নাই; আকাশ নীল হইয়া উঠিয়াছে। শহরে যাহারা বাস করে বসন্তকালের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। রাজপথের গাছগুলি অতি কষ্টে দেহ রক্ষা করিয়া চলে, তাহাদের নির্জীব জীবনের উপর দিয়া ঋতু-পরিবর্তন হয় না। ফিরিওয়ালারা পথে-ঘাটে ফুল বিক্রয় করিয়া শহরবাসীদের কাছে বসন্ত-ঋতুর আগমনের কথা জানাইয়া যায় মাত্র। এক শ্রেণীর শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত নরনারী আছে যাহারা বসন্তকালকে লইয়া বিলাস করিয়া বেড়ায়।

আকাশ তাহাদের ব্যর্থ কল্পনার ক্ষেত্র, দক্ষিণ বাতাসকে লইয়া তাহারা হা-হুতাশ করে, ফুলের গন্ধে তাহারা প্রিয়জনের বিরহ ও মিলন আস্বাদন করে। বাস্তব জীবনে যাহারা বিচিত্র ও অসম্ভব কামনা মিটাইতে পারে নাই, তাহারাই সাধারণত মনোবিলাসী। যাহাদের উচ্চ আশা পদে-পদে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, দিবাস্বপ্ন তাহাদের নিত্য সহচর। মানব-চরিত্র যাহাদের কোনদিন বোধগম্য হয় নাই, তাহারাই মানবচরিত্রকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া অনুভব করিতে থাকে। পৃথিবীতে যাহারা নিতান্তই অকর্মণ্য বলিয়া গণ্য, বসন্ত-কালকে কেন্দ্র করিয়া তাহারাই চোখের জল ফেলিয়া চারিদিক ভাসাইয়া দেয়। প্রেম লইয়াও আজকাল এমনি শৌখিন কল্পনা-বিলাস! প্রেম যে আনন্দের, দুঃখের নয়, তাহা এ-যুগের লোক ভুলিয়া গেছে। প্রিয়জনের চির বিচ্ছেদের মধ্যেও যে দুঃখবোধ করে না বরং নিত্য আনন্দে অবগাহন করে, বুঝিতে হইবে সে-ই প্রেমের অধিকারী। প্রেমের পরীক্ষা তাই বিচ্ছেদের মধ্যে, প্রেমের পরিচয় সুখস্মৃতিতে। তারের যন্ত্র বাজাইলে যেমন সুরের ঝঙ্কার উঠিতে থাকে, তেমনি প্রিয়জনের সুখস্মৃতির আঘাতে যে-হৃদয় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, বুঝিতে হইবে প্রেমের রসলোক সে সৃজন করিতে পারিয়াছে। প্রেম এত দুর্লভ বলিয়াই প্রেমের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ সংসারে এত বেশি চলে। শ্রীরাধা প্রেমের জন্য শত বৎসর ধরিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন, সে অশ্রুর মধ্যে ছিল মান-অভিমান, দেহ-কামনা, মোহ, রূপতৃষ্ণা, মানসিক দ্বন্দ্ব; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে পড়িয়া বৃহত্তর জীবন লাভ করিয়াছিলেন, প্রেম তাঁহার চরিত্রকে করিয়াছে মহীয়ান্। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, সাম্রাজ্যস্রষ্টা, ঐশ্বর্যশালী; তিনি ছিলেন ভোগী, ত্যাগী, যোদ্ধা, শান্তিকামী, আদর্শচরিত্র; সমস্তের মর্মমূলে ছিল শ্রীরাধার প্রতি প্রেমের রসপ্রেরণা। পুরুষের প্রেম নারীকে কাঁদায়, নারীর প্রেম পুরুষকে উন্নত করে। যে-পুরুষ জীবনে উন্নতি করিতে পারে নাই, তাহার জীবনে নারীর প্রেমের

প্রেরণার অভাব। নারী তাহার আসক্তিকে তৃপ্ত করিয়াছে, হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে নাই। নারী পুরুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে শক্তিসঞ্চার করে, তাই নারীর নাম শক্তি। সকল ঐশ্বর্য-আহরণের মূলে নারীর প্রেরণা। নারীর উৎসাহ লইয়া যাহারা যুদ্ধযাত্রা করে, তাহারা হয় যুদ্ধে প্রাণ দেয়, নয় ত যুদ্ধ জয় করিয়া আসে। যে-জাতির নারীশক্তি জাগ্রত হয় নাই, সে জাতির পুরুষগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সুদূরপরাহত। নারীর কার্যকলাপ জাতির স্বাস্থ্য ও শক্তির পরিচায়ক।

এমনি অসংলগ্ন তত্ত্বকথা লইয়া বিকাল গড়াইয়া গেল সন্ধ্যার দিকে। রাজপথে দেখিতে-দেখিতে একটি একটি করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, কাল এমনি সময় শ্রীমতীকে লইয়া সে পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। শ্রীমতী আসিয়াছিল মরা নদীর জোয়ারের মতো। কাল তাহার মনের ঐশ্বর্য ছিল, অর্থের আনুকূল্য ছিল, উৎসাহের বেগ ছিল। শ্রীমতীর সঙ্গলাভ করিয়া একটা সুবিধা হইয়াছে, সে নূতন জামা-কাপড় এবং চক্‌চকে জুতা পাইয়াছে। কলিকাতা শহরে জুতা বেশিদিন টিকে না, ভাঙা খোয়া-ফেলা রাস্তায় চলিবার সময়, জহর ঠিক করিল, জুতা জোড়াটি হাতে করিয়া লইয়া যাইবে। এই জুতা তাহার পায়ে যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহার মনে থাকিবে শ্রীমতীর সুখস্মৃতি। একবার— বহুদিন পূর্বে, নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া তাহার নূতন জুতা কে একজন পরিয়া চলিয়া গিয়াছিল। জুতা পরিতে-পরিতে পায়ে ফোস্কা পড়িতে থাকিলে সমগ্র জগতের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া, আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা যায়। সংসারে সকলের চেয়ে কঠিন কাজ আত্মহত্যা। দুঃখ সহিয়া-সহিয়া বাঁচিবার যাহার সাধ নাই, আত্মহত্যা করিবার সময় নিজের প্রতি মমতা তাহার উদ্বেলিত হইয়া উঠে। জহর একবার দীর্ঘ একমাস ধরিয়া আত্মহত্যার সুযোগ খুঁজিয়াছিল।

চলিতে-চলিতে পথের একটা মোড় ঘুরিতে গিয়া পিছন হইতে

কাহার ডাক শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল। একটা লোক হন্-হন করিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া হেড়ে গলায় কহিল, 'কোথায় চলেছ বাবাজীবন?'

লোকটা যেমন কুৎসিত, তেমনি বিকটাকৃতি। ঝাঁকানি খাইয়া জহর সহজ হইয়া দাঁড়াইল বটে কিন্তু হাতটা তাহার টন্ টন্ করিয়া উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল, 'দুলালচাঁদ যে, তুমি এদিকে?'

'আমি? আমি কোনদিকে নয়। শোন বলি, আজ আর আখড়ায় যেয়ো না বাবাজি—'

'সে কি, আজ একটু খেলবো না? অনেকদিন বাদে—'

'দুত্তোর, আজ চাঁদ উঠেছে, আজ আবার জুয়া খেলা কি?' বলিয়া দুলালচাঁদ ঠেলিতে ঠেলিতে কিছুদূর তাহাকে লইয়া গিয়া বলিল, 'কদ্দিন বাদে দেখা, চল আজ একটু মাসীর ওখানে ঘুরে আসি।'

'মাসীর ওখানে? না না—'

'দুত্তোর।' বলিয়া দুলালচাঁদ আবার তাহাকে হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে লইয়া চলিল।

দুলালচাঁদের সহিত দেখা হইয়া যাইবার অর্থ যে কি তাহা বহুদিনের মতো আজও ঘণ্টা দুই ধরিয়া জহর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিল। তবু ইহা তাহার পক্ষে নূতন নয়। মানুষের খেয়াল-খুশির সঙ্গী হওয়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কত ধনী বন্ধুর পাশে থাকিয়া সে প্রতারণা দেখিয়াছে, অন্যায় দেখিয়াছে, পাপ ও দুর্নীতি দেখিয়াছে। দেখিয়াছে সে অনেক। অকারণ পীড়ন দেখিয়াছে, নিরপরাধের শাস্তি দেখিয়াছে, অহেতুক অপমান দেখিয়াছে, অযথা নির্যাতন দেখিয়াছে, কিন্তু কোনদিন কাহাকেও সে নিষেধ করে নাই। নিষেধ করা, উপদেশ দেওয়া, বাধার সৃষ্টি করা তাহার নীতিবিরুদ্ধ। দুলালচাঁদকেও সে আর বাধা দিতে পারিল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে পাশে রহিল।

মাতামাতি করিতে করিতে দুলালচাঁদ প্রায় জ্ঞান হারাইল, জ্ঞান হারাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে আবার বসিল এবং বসিয়া হঠাৎ জহরের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, 'তোমাকে আজ একটু সিঁদুর, কপালে ঠেকাতে হবে বাবাজি!'

জহর রাজি হইল না। দুলালচাঁদ অচেতন অবস্থায় অনেক অনুরোধ করিল, তারপর নানারূপ সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-বিনয়, কিছুতে না পারিয়া শেষকালে গলা জড়াইয়া একসঙ্গে গোটা-তিনেক চুম্বনই করিয়া দিল। বলিল, 'লোকে এরপর যে তোমায় ভাল লোক বলে সন্দেহ করবে বাবাজি! তুমি ত এমন ছিলে না? মাইরি বলছি—আমি তোমাকে যতদূর জানি—তোমার দিব্যি ক'রে বলছি—'

জহর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আজ চললাম দুলাল।'

'না না, তা হলে আমি আর বাঁচবো না—অগাধ জলে পড়েছি, আমাকে ছেড়ো না বাবাজি।'

শেষকালে জহব তাহাকে ধরিয়া-ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিল। বলিল, 'বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি, কেমন?'

'বাড়ি? আমার বাড়ি আছে নাকি? আজ মারামারি হয়ে গেল ছোট ভাইটার সঙ্গে—আমি আর ঢুকবো ও-শালাদের বাড়ি? আমিও শোধ নেব বলে রাখলাম—চার আনা পয়সা ধার চাইতে গেলাম—আমি—আমি আর কিছু বলি নি ভাই—'

জহর কহিল, 'বাড়িতে ঝগড়া করেছ? মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?'

'মেরে? হে হু হে। এই ছাখ।' বলিয়া দুলালচাঁদ ফস করিয়া গায়েব পিরানটা ছিঁড়িয়া বুকের ছাতি বাহির করিয়া দেখাইল। তারপর বলিল, 'আমাকে মারবে? কেউ জন্মেছে নাকি? সেবার হোগলকুঁড়ের বারোয়ারী তলায় ছ'খানা লাঠি একদিকে আর আমি একদিকে—মেরে বেটাদের শুইয়ে দিলাম। আমাকে মারবে—হে হে হে।'

দুলাল টলিতেছিল, কিন্তু জহর তাহাকে সামলাইয়া লইয়া চলিতে লাগিল। বলিল, 'তা হ'লে কোথায় যাবে এই অন্ধকার রাতে?'

দুলাল কহিল, 'তুই কি রে' ক'রেচস্?'

'কেন বল ত?'

'চল্ না তোর বাসায়; দিব্যি পাচ্ছিলাম একটু জায়গা—মাইরি বলছি, পড়বো আর মরে ঘুমোবো।'

'আমার ত বাসা নেই দুলাল!'

'বাসা নেই খোঁয়াড় ত আছে?'

'তাও নেই।'

জড়াইয়া-জড়াইয়া দুলাল বলিল, 'তবে চ; আমাকে থানায় জমা দিয়ে আসবি।'

থানার নামেই জহর ভয় পাইয়া গেল। স্বদেশী থানা-পুলিশের নাম শুনিলেই তাহার গা ঘিন-ঘিন করিয়া উঠে। থানা-পুলিশের সংস্পর্শে আসিলে, তাহার বিশ্বাস, ভদ্রসন্তানের আত্মসম্মান নষ্ট হয়। সে কহিল, 'চল তবে দেখি যদি কোথাও—'

কিন্তু কোথায় লইয়া গিয়া এই চিরপরিচিত দুঃশীল লোকটাকে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। এমন করিয়া কত দুর্দান্ত অতিথিপনা তাহাকে অকাতরে সহ্য করিতে হইয়াছে। আশ্রয় তাহার কোথাও নাই, সেইজন্যই হয় ত আশ্রয় পাইবার আশায় বন্ধুবান্ধব তাহার কাছে অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংসারে ইহাই বোধ করি একটি বিচিত্র নিয়ম। যাহারা দরিদ্র বিধাতা তাহাদের হৃদয় দিয়াছেন বড়, সঙ্গতি দেন নাই। যাহারা উপবাস করিয়া শুকাইয়া মরে তাহাদের ঘরেই আসে উপবাসী অতিথি। যে-ধর্মশালার মাথার চালা ফুটা হইয়া গিয়াছে তাহারই ভিতর সমাগম হয় পথশ্রান্ত তীর্থযাত্রীর মেলা।

জহর নীরবে দুলালকে সামলাইয়া লইয়া চলিতেছিল। দুলাল

গলিয়াছে চোখ বুজিয়া বিগলিত স্নেহে ও বন্ধুত্বের আতিশয্যে একটা হাত দিয়া জহরের গলা জড়াইয়া ক্ষণে-ক্ষণে সে প্রলাপ বকিয়া উঠিতেছিল। সে কেবলই প্রমাণ করিতে চায়, বুকের ছাতি তাহার একচল্লিশ ইঞ্চির উপরে, ইচ্ছা করিলে পথের উপরে এখনই জহরকে পিষিয়া মারিতে পারে।

অবশেষে আন্দাজ রাত্রি এগারোটা নাগাদ জহর তাহাকে লইয়া কাঁসারিপাড়ার বাড়ির কাছে আসিল। শ্রীমতী একমাসের দরুন ভাড়া অগ্রিম দিয়া গেছে, সুতরাং এখনও বহুদিন এখানে তাহার থাকিবার অধিকার আছে। কাল এমনি সময়ে পথের ধারে এই দুইখানি ঘর শ্রীমতীর কলকণ্ঠে থাকিয়া থাকিয়া মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ শ্মশানের মতো সমস্তই অনড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

রাস্তার দিকে জানালাগুলি বন্ধ। জহর একবার ভিতরের নিস্তব্ধ অন্ধকারে উঁকি মারিয়া চুপি-চুপি কহিল, 'গোলমাল ক'রো না যেন, ভেতরে ভদ্রলোকেরা আছে, ঘরে ঢুকেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে. বুঝলে ?'

দুলাল জড়িতকণ্ঠে কহিল, 'এই তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি—'

গা ছুঁইতে গিয়া সে সেখানেই একবার জহরকে কোলে তুলিয়া আবার নামাইয়া দিল।

ভিতরে লইয়া গিয়া জহর নিজের ঘরের শিকল খুলিয়া তাহাকে ভিতরে ঢুকাইল। ঘর অন্ধকার। খুঁজিয়া-খুঁজিয়া দেশালাই বাহির করিয়া সে আলোটা আগে জ্বালিল। দুলাল ঘাড় গুঁজিয়া ততক্ষণে দেওয়ালের একধারে বসিয়া পড়িয়াছে। জহর নিজের বিছানাটা তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল।

দুলাল বলিতে লাগিল, 'মাইরি তোকে ধন্যবাদ! তা বলে বাবাজি মনে করচ আমি শান্ত! আমি ভাল লোকের কাছে ভাল লোক, মন্দ লোকের কাছে—'

'আঃ কথা ব'লো না, চুপ কর।'

'চুপ করেই আছি, বুঝলে বাবাজি, চুপ করে না থাকলে ফুঁ দিয়ে তোমাদের উড়িয়ে দিতাম। তোমরা কত অন্যায় করচ বল ত? কত অপমান করচ, মুখটি বুজে আমরা—তা বলে মেরো না বাবা, মারের চোটে মরা মানুষ জাগে বুঝলে, তার চেয়ে চিরকাল ধরে অপমান করো—অপমান আমাদের গায়ে লাগে না—'

জহর তাহার কথার শব্দে ভীত হইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিল। তারপর বলিল, 'যদি কেউ টের পায় তা হ'লে কী কেলেঙ্কারি হবে তা তুমি ভাবচ না দুলাল?'

দুলালচাঁদ কাৎ হইয়া উঠিয়া বসিল। তারপর আবার শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'গেরুয়া কাপড় পরেছ নাকি বাবাজি, তুমি ত এত বাজে লোক ছিলে না। ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা, সেবার বারুইপুরের গাঁয়ের পথে তোমার কীর্তি—হে হে হে—' বলিয়া সে এমনিই উচ্চ-কণ্ঠে হাসিল যে জহর তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া থামাইতে বাধ্য হইল।

এক মিনিট শান্ত থাকিয়া দুলাল আবার বলিল, 'তোর এ সময় ভারি সুযোগ মিলেছে রে। মাতাল যখন নর্দমায় পড়ে বাবাজি, রাস্তার লোক তখন কেমন সাধু সাজে দেখেছ?'

জহর এবার একটু হাসিল। কিন্তু হাসিয়াও সে রাগ করিয়া কহিল, 'দেখেছি দেখেছি, তুমি এখন থামো।'

ঠিক এমনি সময় বাহির হইতে বন্ধ দরজায় কে করাঘাত করিল। দুইজনে মুহূর্তে নির্বাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল। আলোটা এতই টিম্-টিম্ করিয়া জ্বলিতেছিল যে কেহ কাহারও মুখ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইল না। তাহা হইলে দেখা যাইত, ভয়ে জহরের মুখখানা পাথরের মত সাদা ও অচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

আবার দরজায় শব্দ হইল। চুপি-চুপি দুলালচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, 'দরজা খুল্‌তে বল্‌চে নাকি?'

জহর ভীতকণ্ঠে কহিল, 'তোমাকে বললাম চেঁচামেচি ক'রো না, ভদ্রলোকের বাড়ি, কর্তা টের পেয়েছেন।'

এবার দরজায় জোরে-জোরে হাত চাপড়াইবার শব্দ হইল। জহর উঠিতে যাইতেছিল, দুলাল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি।'

'না না, সর্বনাশ, তুমি এ অবস্থায়—অপমান করবে কিন্তু।'

দুলাল হাসিয়া আর একবার তাহার বুকের ছাতিটা বিস্তৃত করিয়া দেখাইয়া উঠিয়া গেল। জহরের গা কাঁপিতেছিল। দুলাল গিয়া সটান দরজাটা খুলিয়া দিল।

কিন্তু দরজা খুলিয়া ঈষৎ আলোয় সে যাহা দেখিল তাহাতে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী রমণী। দেখিতে-দেখিতে তাহার চোখের নেশা ছুটিয়া গেল।

জহরও মুখ তুলিল, কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে আলো লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং আলোটা একটু বাড়াইয়া নারীটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হইল! না, স্বপ্নও নয়, মায়াও নয়, চোখের ভ্রমও নয়!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে-ধীরে তাহার পড়িয়া গেল। দুলালের দিকে তাকাইয়া সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'তুমি যাও নি শ্রীমতী?'

'কি মনে হচ্ছে?' বলিয়া শ্রীমতী সোজা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আসিল তারপর কহিল, 'গেলেই বোধ হয় ভাল হ'তো, নয়? এসে ও-ঘরে শুয়েছিলাম, শুনছিলাম তোমাদের রঙ্গরস।' বলিয়া সে আগুনের ফিন্‌কির মতো একটুখানি হাসিল।

জহরের গলা বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চিৎকার করিয়া সে একবার শ্রীমতীকে এ-ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিবার চেষ্টা করিল

কিন্তু তাহার আওয়াজ ফুটিল না। ঐ কদাকার মদমত্ত লোকটার কুৎসিত দৃষ্টি হইতে শ্রীমতীকে সেই মুহূর্তেই না সরাইতে পারিয়া অপমানে তাহার মাথা হেঁট হইয়া আসিল।

ভয়ানক রাগ চাপিয়া দুলালের কাছে গিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠে শ্রীমতী কহিল, 'কে আপনি?'

'আমি?' বলিয়া দুলাল একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আমি কেউ নয় ঠাকরুন।'

'এখানে তবে কি দরকার?'

'কিছুই নয়—এই বাবাজির সঙ্গে দেখা হ'লো, অনেক দিনের বন্ধু—'

'মিথ্যে কথা, উনি কারো বন্ধু নন্।'

'বেশ, নন্—আপনি যখন বল্‌চেন তখন—'

শ্রীমতী হাত বাড়াইয়া পথের দিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিল, 'এক্ষুণি চলে যান্—যান, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

এরকম আদেশ দুলাল জীবনে এই প্রথম শুনিল। বুকের ছাতি হঠাৎ তাহার শীর্ণ হইয়া আসিল। মুহূর্তমাত্র দাঁড়াইতে আর তাহার সাহস হইল না। দরজার বাহিরে গিয়া বলিল, 'বাবাজি, বলি ও বাবাজীবন?'

বাবাজীবনের হইয়া শ্রীমতীই অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'যা বল্‌তে হয় আমাকে বলুন।'

দুলালচাঁদ কিন্তু আর সে-কথা শুনিল না। ঘরের ভিতরে তাকাইয়া মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, 'বিয়ে করেছ তা হ'লে? ঘরে যে বাঘিনী পুষে রেখেছ সে কথা কই আগে আমাকে—?'

শ্রীমতী জোরে একটা ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ বলচি—যান, বেরিয়ে চলে যান।'

পথে নামিয়া চলিয়া যাইবার আগে দুলালচাঁদ শুধু একটি দুর্বল আস্ফালন করিয়া গেল, 'আচ্ছা দেখে নেবো, এ অপমানের শো[illegible]

আমি একদিন'—বোধ করি চোখের জল চাপিতে চাপিতেই সে চলিতে লাগিল।

সদর দরজা বন্ধ করিয়া শ্রীমতী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া জহর তখন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মিনিট-দুই নীরব থাকিয়া শ্রীমতী নিজের মনে হাসিয়া কহিল, 'লোকটার গুণ আছে, মেয়েলোকের সম্মান রাখতে জানে।'

খানিকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরের মধ্যে সে অস্থির হইয়া পায়চারি করিল। তারপর অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর বিস্ময়কর ভাবে বদলাইয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, 'এসব কী তোমার?'

জহর মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইল। শ্রীমতী কহিল, 'এই তোমার পরিচয়? এরা তোমার বন্ধু?'

হঠাৎ সর্বাঙ্গ জহরের জ্বালা করিয়া উঠিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, এরাই আমার বন্ধু। এরা বন্ধু ব'লে আমার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।'।

'তা হ'লে বুঝবো, তুমিও এই?'

জহর আবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'তুমি কি ভেবেছিলে আমি একটা ভয়ানক ধার্মিক, যুধিষ্ঠির?'

শ্রীমতী তিক্তকণ্ঠে কহিল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি ভদ্র।'

'যাক্, এত রাতে আর ভদ্রতা শেখাতে এসো না।' জহর এবার ফাটিয়া উঠিল—'ভদ্র যেন তুমিই। তুমি কী? তুমি কোন জাতের?'

পাছে বাহিরে কেহ শুনিতে পায়, শ্রীমতী গিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, পরে আরো কাছে আসিয়া কহিল, 'তারপর? অপমানের ভাষা এর আগে তোমার মুখ থেকে শোনা হয় নি—তারপর?'

জহর কহিল, 'বলই না তোমারই বা কী পরিচয়? চলে ত গিয়েছিলে ফিরলে কেন আবার? কি মতলব নিয়ে? আমি না হয় অভদ্র, ইতর, চরিত্রহীন—তুমি কি ভাল হতে পারলে?'

মৃদু হাসিয়া সমস্ত তিরস্কারগুলি উড়াইয়া দিতেই এক মুহূর্তে জহর দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল। শ্রীমতী পুনরায় কহিল, 'পিঠে আমার কুলো আর কানে তুলো। আচ্ছা, আমার ওপর তোমার একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা, সত্যি নয়?'

জহর ভিজিয়া একেবারে স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তরে শুধু বলিল, 'সত্যিই ত।'

'বাঃ লক্ষ্মী ছেলে। কী সরল তোমার স্বভাব। কী সুন্দর। যা বল তা আবার স্বীকারও কর। তুমি যুধিষ্ঠির নও কে বলে? আমি ত সাদা চোখে দেখছি তোমার দেবচরিত্রে লেশমাত্র খুঁত নেই। তুমি প্রশান্ত, সচ্চরিত্র, তোমার ললাটে প্রতিভা, চোখে আলো—' শ্রীমতী হাসিয়া-হাসিয়া বলিল, 'তোমার সৌজন্য, দয়া, তোমার মহৎ হৃদয়, তোমার কন্দর্পের মতো অতুলনীয় রূপ, তোমার সুকোমল ব্যবহার—'

জহর অধীর হইয়া বলিল, 'চলে যাবো ঘর ছেড়ে, তাই চাও?'

শ্রীমতী তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ আমি, না-হয় গায়ের চামড়াখানা আমার একটু চক্‌চকে, কিন্তু তুমি? তুমি উদার, আদর্শচরিত্র, সর্বত্যাগী, সত্যাশ্রয়ী। হে দেবতা, বিছানা পাতা রয়েছে, তুমি নিদ্রা যাও, আমি সারানিশি জেগে-জেগে তব পদসেবা করি। সামান্য নারী আমি—হে অসামান্য, তোমার অনন্ত মহিমা—' বলিতে বলিতে শ্রীমতীর দম ফুরাইয়া যাইতেই সে হাসিয়া চুপ করিল।

জহর বলিল, 'তোমার এই অসৎ আচরণ আমার মনে থাকবে।'

'অসৎ আচরণ?' বলিয়া শ্রীমতী একটু থামিল, তারপর দরজার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া নির্ভয়কণ্ঠে বলিল, 'এমন প্রাণখোলা প্রশংসা তুমি শুনেছ কোনোদিন? একে তুমি বলচ অসৎ আচরণ? ওই লোকটার সঙ্গে তুমি বুঝি এতক্ষণ খুব সৎ আচরণে ব্যস্ত ছিলে?'

কথা কহিতে জহরের আর প্রবৃত্তি হইতেছিল না, তবু কহিল, 'আমি কি তোমার কাছে প্রশংসা চেয়েছিলাম ? তুমি শুদ্ধ ভাষায় মৌখিক প্রশংসা ক'রে আমাকে অপমান করেচ। আমি যা কোন-দিনই নই তাই আমাকে বল্‌চ। আমি যদি তোমাকে এই সব বল্‌তে থাকি ?'

'কি ?' বলিয়া শ্রীমতী তাহার দিকে তাকাইল।

জহর বলিল, 'আমি যদি বলি, তুমি নারীজাতির শিরোমণি, বহ্নিশিখার মতো তোমার তেজ, উর্বশীর মতো তুমি সুন্দরী, সাবিত্রীর মতো তুমি সতী, সীতার মত পবিত্র, তুমি দিক্‌বিজয়িনী, তুমি কল্যাণময়ী—তোমার এসব ভাল লাগবে ?'

শ্রীমতী কহিল, 'চমৎকার লাগবে।'

'তা হ'লে বলবো তুমি যশের কাঙাল।'

হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, 'যশের কাঙাল যারা নয়, তারা মরা মানুষ।'

ক্ষুব্ধকণ্ঠের একটা আওয়াজ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জহর এবার চুপ করিয়া গেল। মুখ ফিরাইলে দেখিতে পাইত একজনের মুখ অনির্বচনীয় আনন্দে ইতিমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কৌতুক করিয়া সে কহিল, 'যাক্‌, ঘণ্টাখানেক ধরে, বেশ একখানা নাটকের অভিনয় হয়ে গেল।'

কণ্ঠের গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া জহর কহিল, 'অভিনয় তোমার ভালই হয়েছে। নায়িকার চরিত্র-অভিনয়ে মিস্ মলিনাবালাকেও তুমি হারিয়ে দিয়েছ। কী তোমার নিখুঁত অঙ্গভঙ্গী, কি আবৃত্তি, দর্শকরা নির্বাক্, মন্ত্রমুগ্ধ—'

শ্রীমতী হাসিয়া বলিল, 'তুমি ত বলবেই, ফ্রি-পাশে থিয়েটার দেখতে এসেচ—তা ছাড়া অভিনেত্রীটির সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। দেখো, যেন সাপ্তাহিক কাগজে এ-প্রশংসা ছাপিয়ো না—জনসাধারণের চোখে ধুলো দেওয়া আজকাল বড় কঠিন।'

'নির্লজ্জ!' বলিয়া উঠিয়া জহর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া গেল বটে কিন্তু কোথাও সে গেল না। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে সোজা কলের দিকে চলিয়া গেল এবং মুখে-মাথায় খানিক জল দিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীমতী কহিল, 'লজ্জা আমার অত্যন্ত অল্প তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু এখনো যেটুকু আছে তাও বুঝি আর থাকে না। এবারের সমস্যাটা সমাধান করবে কি ক'রে?'

জহর বলিল, 'কেন?'

শ্রীমতী বলিল, 'আমাদের সম্বন্ধে একটা কথা বাড়ির লোকেও জানলো, বাইরের লোকও জেনে গেল। জানলাম না শুধু আমরাই। গোঁজা মিল দিয়ে কদিন চলবে?'

এবার জহর আর অস্পষ্ট কথা কহিল না। বলিল, 'দিন চলবার কথাই বা ভাবচ কেন শুনি? ছাড়াছাড়ি হলেই ত সব গোলমাল চুকে গেল। তুমি চলে গিয়েছিলে, আবার ফিরলে কেন?'

শ্রীমতী কহিল, 'এই নিয়ে তিন বার তুমি এই কথা শুনতে চাইলে। তোমার কি মনে হয়? কেন ফিরলাম?'

'কেন?' জহর একটা ঢোক গিলিয়া কহিল 'এ অবস্থায় সবাই যা ভাবে, আমাদেরও তাই ভাবতে হবে!'

'সবাই কি ভাববে আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি করবার জন্যে ফিরেছি?'

'তাদের ধারণাটা আরো কিছুদূর অগ্রসর হতে পারে!'

'অর্থাৎ তোমার বন্ধুটি যা বলে গেল? বেশ, তা হ'লে এ অবস্থায় কি করবে ভাবচ?'

'তুমি থাকো আমি যাই।'

'গেলেই কি সব পরিষ্কার হবে? এখন হয় ত লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই হয়রান হবে। তবে তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে

গেছ কি না। তখন কি তারা এ কথাটা বুঝবে আমার মতন মেয়েকে কেউ ত্যাগ করতে পারে না, আমি বরং সবাইকে—' বলিয়া শ্রীমতী হাসিল।

তাহার এই অসঙ্কোচ বাহাদুরি দেখিয়া জহরের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, 'সত্যি কথাটাই তারা বুঝবে।'

'তার মানে, তুমি অনায়াসেই আমায় ত্যাগ ক'রে যেতে পারো?'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'পারো।' শ্রীমতীর গলার আওয়াজ হঠাৎ কোমল হইয়া আসিল—'কিন্তু অনায়াসে নয়। বিয়ের আগে রংপুরে একটি ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তার সঙ্গে প্রেমেও পড়ি নি, ছেড়েও এসেছিলাম, কিন্তু অনায়াসে নয়। বহুদিন পর্যন্ত মন ছুট্‌তো তার কাছে নিতান্ত অকারণে। এমনিই হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোথায় যে বাঁধাবাঁধি তার খোঁজ কি কেউ জানে? ছোটবেলায় মনে আছে, পাড়ার একটি মেয়ে একদিন হাসতে-হাসতে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল, আমি কিন্তু সেদিন কেঁদে ভাসিয়ে ছিলাম। অথচ মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপও ছিল না। এমনিই হয় বোধ হয়। রেলগাড়ি যখন যাত্রীর দল নিয়ে চলে যায়, আমার বুকের ভেতরটা তখন হু-হু ক'রে ওঠে। অনায়াসে কাউকেই ছাড়া যায় না, বুঝলে?'

জহর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। জানালার বাহিরে মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার থম্‌-থম্‌ করিতেছে। বড় রাস্তার কোথায় পথের একটা কুকুর থাকিয়া-থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। আশেপাশের সাড়াশব্দ বহুক্ষণ হইতেই থামিয়া গেছে। মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, 'তুমি আবার ফিরে এলে কেন?'

শ্রীমতী কহিল, 'কেন এলাম? জানিনে। বোধ হয় যে বাড়িতে রাত্রি বাস করা যায়, তার উপর একটা মায়া জন্মায়। সারাদিন ত ঘুরলাম পথে, কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। মনে-মনে

কেবল একটা দুরাশা, মেয়ের মত মেয়ে হয়ে বাঁচ্‌বো। যেদিকে চোখ ফেরাই, দেখি অবারিত মুক্তি, অবাধ অবকাশ, কিন্তু তার শেষ কোথায়? সুমুখে পেছনে যে দিকেই ফিরলাম, লক্ষ্যহীন দিশেহারা পথ। সে পথ যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নিরাশ্রয়। বল ত মেয়েমানুষের মন তখন কিসের কথা ভাবে?'

'আমি কেমন ক'রে জান্‌বো বল?'

'হ্যাঁ, আমিও জানি নে। শুধু ভাবলাম, এ কেন? এর কি দরকার? স্বাধীন হলাম, উপার্জন করলাম, অগাধ অর্থ হয় ত হাতে এল, আয়-ব্যয় করলাম অজস্র, অপরিমিত। তারপর দেশ জয় করলাম, করলাম না-হয় সমাজ-সংস্কার, লোককে হিত শিক্ষা বিলিয়ে বেড়ালাম, কিন্তু তার কি দরকার ছিল? জীবনে উন্নতি করাটাই কি একমাত্র মানুষের লক্ষ্য?'

জহর বলিল, 'এবার তুমি অন্য কথায় যাচ্ছ। যা বল্‌চ তা হয় ত এই রাতের বেলা তোমার ভাবতেই ভাল লাগ্‌চে।'

'বোধহয় তাই হবে। ফিরে এলাম কেন একথা দরজা পর্যন্ত এসে নিজেই আমি ভেবেছি। কেন ফিরলাম? অথচ জানতাম তুমিও আর কোনোদিন ফিরবে না। তবে কি ফিরেছিলাম তোমার খালি ঘরটা দেখবার জন্য? তুমি নেই এই ভাবনাটাই কি আমাকে আবার টেনে আন্‌লো? অন্য কেউ হলে ভাবতো, আমি তোমার ভালবাসায় পড়েচি, তোমার মনও হয়ত এই কথা শুনে তোমার অজ্ঞাতে খুশি হয়ে উঠেছে, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি এম্‌নিই এলাম। স্বামীকে ছেড়ে এসেচি, তার কথা মনে হলে ঘৃণায়-লজ্জায় আমার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, কোনদিন তার কাছে ফিরে যাবার দুর্বুদ্ধি আমার যেন না আসে; তবু ভাবি, তার জান্‌লায় গিয়ে একবার উঁকি মেরে তাকে দেখে এলে কেমন হয়। আমার মনের দৃষ্টি কতবার ছুটে গেচে তার কাছে, কিছুতেই ধরে রাখতে পারি নি। একে তোমরা কী বলবে? প্রেম? মোহ? না আর কিছু?'

'আর কিছুই নয়, শুধু মেয়েমানুষের মন।'

'মেয়েমানুষের নয়, মানুষের মন। মনের কাছে মানুষ হার মেনেচে। দুঃখের স্মৃতি আর সুখের স্মৃতি—মনের কাছে তাদের সমানই মাধুর্য।'

জহর একবার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আসল কথা তুমি ফিরে এসেচ তোমার আর কোথাও আশ্রয় ছিল না বলে।'

উদাসীন হইয়া শ্রীমতী বলিল, 'বোধ হয় তাই হবে।'

বহুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে নির্বাক্ হইয়া রহিল। যে কথাটা এইমাত্র শেষ হইয়া গেল তাহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার কাহারও প্রয়োজন ছিল না সমস্ত আলোচনার শেষ হয়ত এমনি করিয়াই হয়। যেখানে তাহার মৌখিক পরিসমাপ্তি সেইখানেই তাহার সত্যকারের আরম্ভ।

অনেকক্ষণ পরে জহর ডাকিল, 'শ্রীমতী?'

শ্রীমতী হাসিল, হাসিয়া বলিল, 'আমার নামটা তোমার মুখে বেশ সুস্বাদু লাগে, নয়?'

'হতেও পারে!' হঠাৎ জহর বলিয়া ফেলিল, 'ভাল লাগে বলেই হয় ত লোকের বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে তোমার নাম লিখে বেড়াই। এমনো হতে পারে শ্রীমতী, আমার অভাবকে আমার চোখে ধরিয়ে দেবার জন্যেই তুমি এসেচ।'

শ্রীমতী করুণ হাসিয়া কহিল, 'সেইজন্যেই বলছিলাম অনায়াসে কাউকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।'

জহর একবার থামিয়া কহিল, 'আচ্ছা শ্রীমতী?'

শ্রীমতী মুখ তুলিল। জহর বলিল, 'তুমি অমনি করে আমার বন্ধুটিকে তাড়িয়ে দিলে কেন বল ত?'

'তার জন্যে কি তোমার মন খারাপ হচ্ছে?'

'ভাবছিলাম এত সহজেই তুমি তাকে অপমান করতে পারলে? সে ত তোমার কাছে কোনো অন্যায় করে নি।'

শ্রীমতী কহিল, 'ভদ্রলোকের বাড়িতে মাতলামি করাটাই কি ভাল হ'তো তুমি বলতে চাও?'

জহর বলিল, 'দরজাটা বন্ধ ছিল, রাতটা সে এখানে কাটিয়েই যেতে পারতো। বন্ধুর আশ্রয় পেয়ে আনন্দে সে একটু-আধটু প্রলাপ বক্‌ছিল মাত্র।'

শ্রীমতী কহিল, 'সেইজন্যেই তাড়ালাম। কে-এক জন থাকে, আরাম তাদের সহ্য হয় না। নিজের হাতেই তারা নিজের দুঃখের সৃষ্টি করে। সে-দুঃখে তারা কাঁদে, নিজেকে অভিশাপ দেয়, সংসারকে দুঃখের রঙে রাঙিয়ে হা-হুতাশ করে—ওপরে বিধাতা বসে হাসেন। তাদের ওপর আমার দয়া-মায়া নেই। যারা মাতাল হয়ে ঘরে ঢুকে নরম বিছানা চায়, তাদের অপমান ক'রে তাড়ানোই উচিত।'

'তুমি তা হ'লে তার জন্যে দুঃখিত নও?'

'এতটুকু না। অপমান ক'রে তাড়ালেই তবে এ সব লোকের একদিন চোখ ফুটতে পারে।'

'সে ত কারো অসম্মান করে নি?'

'অসম্মান করেচে সে নিজেকে। নেশা ক'রে সত্যি মাতাল যে হতে পারলো না, আরামের লোভ যার মনে সচেতন হয়ে রইলো, তার ত আত্মসম্মান ব'লে কোনো পদার্থ-ই নেই। যে লোক সত্যি-কারের মাতাল, সে সন্ন্যাসী। সে নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত।'

'কিন্তু আমি ভুলতে পারবো না। শ্রীমতী, আজ সারারাত সে পথে পথে বেড়াবে। তার আত্মসম্মান জ্ঞান না থাকতে পারে, কিন্তু তার আশ্রয় যে নেই। যে সর্বস্বান্ত তাকে লক্ষ্মীছাড়া ব'লে গাল দিতে পারো, কিন্তু তাকে উপবাসে রাখতে চল্‌বে কেন? মানুষের ওপর এই কি মানুষের বিচার?'

শ্রীমতী ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, 'যারা নেশা করে বেড়ায় তাদের ওপর তোমাদের এমন অকারণ মমতা কেন? এ'কি আজকালকার ফ্যাশান নাকি?'

যারা নেশা করে তারা জীবনের ব্যর্থ মানুষ।

'থামো, বড় বড় কথা বলে নেশার বিজ্ঞাপন ক'রো না। নেশা ক'রে যারা জীবনের ব্যর্থতা ঢাকতে চায় তারা নিতান্তই অকর্মণ্য। জীবন কখনো কারো ব্যর্থ হতে পারে না। যাদের হয় তারা স্থবির পঙ্গু।'

জহর চুপ করিয়া রহিল। শোভাকবি নিজের মনের সঙ্গে সে কথাটাকে মিলাইতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, 'আচ্ছা, তুমি যখন আমাকে এই নোংরা বস্তির মধ্যে দেখলে তোমার কি মনে হ'লো?'

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমতী নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে তাকাইল। এমনি করিয়া বহুবার দুইজনে চোখাচোখি হইয়াছে। শ্রীমতীর চোখের দীপ্তি এমনি সহজ এবং প্রখর যে সে-দৃষ্টির সুমুখে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারা যায় না। যায় না বলিয়াই জহর বহুবার মাথা হেঁট করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এবার সে সঙ্কোচ বোধ করিল না। বলিল, 'মানে, তুমি যা আমায় জেনে রেখেছিলে তা হয়ত আমি নই, আমার একটা দিক তোমার চোখে আজ স্পষ্ট উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।'

শ্রীমতী হাত দিয়া বিছানাটা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে বলিল, 'কি রকম?'

জহর বলিল, 'তোমার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ। এতদিন তুমি হয়ত শ্রদ্ধাসহকারে একটা প্রাসাদ মনে-মনে গড়ে তুলেছিলে, কিন্তু সামান্য ভূমিকম্প সইতে না পেরে সেটা যখন চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে, তখন দেখা যায় সে প্রাসাদের নীচে ছিল চোরা-বালির স্তূপ।'

শ্রীমতী মনে-মনে চিত্রটি কল্পনা করিয়া হাসিয়া উঠল।

জহর কহিল, 'তোমার কি এখন মনে হচ্ছে শ্রীমতী, আমি আজ তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছি?'

শ্রীমতী কহিল, 'আমার কি মনে হচ্ছে সে কথা শুনে তোমার লাভ কি? মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি চলচে বলেই আজ মানুষের এত অশান্তি!'

'তবু ত এই সাধারণ কথাটাও তোমার মনে হতে পারে, আমি ইতর, অসচ্চরিত্র, নোংরা—'

'যদি তাই মনে হয় কি করবে?'

'কিছুই করবার নেই। শুধু ভাব্‌বো অতি সহজেই তুমি আমার পরিচয় পেয়ে গেলে!'

শ্রীমতী কাৎ হইয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'মেয়েদের কাছে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা এখনকার ছেলেদের একটা বদ্ অভ্যাস। তুমি কি নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে?'

'শ্রদ্ধেয় আমার মধ্যে কিছু নেই শ্রীমতী!'

'সে বিচার আমার, তোমার নয়। আমার সব চেয়ে হাসি পায় তখন, মানুষ যখন নিজের চরিত্র-পরিচয় নিজের মুখে দেবার চেষ্টা করে।'

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল। পরম নিশ্চিন্ত মনে গা এলাইয়া শ্রীমতীকে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল, 'ওঠো, ও-বিছানাটায় তুমি শুয়ো না!'

'কেন? দোষ কি?'

কি একটা কথা স্মরণ করিয়া বলিল, 'না শোয়াই ভালো। নিজের ঘরে গিয়ে তুমি শোও না?'

শ্রীমতী হাসিয়া বলিল, 'কোনটা আমার ঘর আর কোন্‌টা তোমার, ভুলেই গেচি।'

জহর বলিল, 'কিছু খেলে না?'

খাওয়ার কথা শুনিলেই শ্রীমতীর রাগ হয়। বলিল, 'মেঠাই-মণ্ডা তোমার ঘরে যেন থৈ-থৈ করছে। যদি ক্ষিদে পেয়েচে বলি, তুমি এখন খাবার এনে খাওয়াতে পারবে?'

'তা ধর সুন্দরী মেয়ের ফরমাস—সুন্দরী মেয়ের অনুরোধে কত লোকে কত দুঃসাহসিক কাজ—'

শ্রীমতী, অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, 'তোমার কাছে থাকার একটা সুবিধে এই যে, আমি নিরাপদ।'

'তার মানে?'

'মানে, বিপদ-আপদের ভয় বিশেষ নেই!'

ক্ষুব্ধকণ্ঠে জহর বলিল, 'তুমি এমন জায়গায় ঘা দাও যেখানে যে-কোনো পুরুষ আঘাত পায়। ভয় নেই কেমন করে জানলে?'

চোখ বুজিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, 'ও আমরা জানতে পারি, অনুভব করতে পারি। তুমি পুরুষ কিন্তু বর্বর পুরুষ নয়।'

'তোমরা অনুভব করতে পারো পুরুষের চরিত্র?'

'অনুভব করতে পারি শুধু চরিত্রটা নয়, গোটা পুরুষটাকে। চোখ বুজিয়ে পুরুষকে চেনা মেয়েদের প্রকৃতি।'

জহর আর কথা কহিল না। শ্রীমতী ও-পাশ ফিরিয়া কথা কহিতেছিল, এ-পাশে তাহার মাথার বড় খোঁপাটা বালিশের উপরে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তাহার চুলের বিচিত্র গন্ধকে হঠাৎ ফুলের গন্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। সুন্দরী নারীর অসম্বৃত কেশপাশের সুগন্ধসৌরভ কেমন করিয়া রাত্রির অন্ধকারে একটি মায়াবাস বিস্তার করিতে থাকে তাহাই ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ জহরের মনে পড়িয়া গেল, একবার বহুকাল আগে কোথাকার একটা ধর্মশালায় এক মাড়োয়ারী তীর্থযাত্রীর দলে সে ভিড়িয়া গিয়াছিল। দুইটি যুবতী ছিল সেই দলে। ধর্মশালায় একটিমাত্র ঘর। ঘরটা বড়। কিন্তু গভীর রাত্রে শুইয়া-শুইয়া জহর সেই মেয়ে দুইটির চুলের গন্ধে কেমন একটি অপরিচিত সূক্ষ্ম সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়াছিল—তাহা চিরদিন তাহার স্মরণে থাকিবে। স্মরণে থাকিবে তাহার কারণ, মানুষের বোধ করি এমনিই হয়। এ রহস্য সম্ভবত আজিও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, কোন একটি বিশেষ গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও ইঙ্গিত মানুষের

মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া নিরুদ্দেশ করিয়া দেয়। মানব-মনের এ চিরন্তন রহস্য।

শ্রীমতীর চুলের মৃদু-মধুর গন্ধকে অনুসরণ করিয়া জহরের কল্পনা এই নিরন্ধ্র রাত্রির অন্ধকারের জাল উত্তীর্ণ হইয়া কোথায় যেন দিশা-হারা হইয়া ছুটিতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িয়াও তাহার কল্পনার সে গতি থামিল না।

একটা অস্ফুট আলোচনার শব্দে তাহাদের দুইজনেরই ঘুম ভাঙিয়া গেল। জহর আগেই জাগিয়া উঠিয়া বসিল। চোখ রগ্‌ড়াইয়া বলিল, 'কিসের গোলমাল?'

শ্রীমতী বিরক্ত হইয়া এ-পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়াই কহিল, 'বোধ হয় আমাদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা চলচে।' বলিয়া সে আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, উঠিল না।

জহর কান পাতিয়া খানিকক্ষণ বাহিরের কথাবার্তা শুনিল, তারপর বলিল, 'এইবার ওঠো।' বলিয়া সে নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে তখন বেলা বাড়িয়া গিয়াছে।

কাপড় গুছাইয়া মাথার চুলের রাশি ফিরাইয়া শ্রীমতী এইবার উঠিয়া বসিল। বলিল, 'চা তৈরি করি, আগে খেয়ে নাও, নইলে কথাবার্তা শুনে হয় ত তোমার মেজাজ গরম হয়ে যাবে। এখন ত আর বাড়িভাড়া পাওনা নেই যে, মারলেও কথা কইবে না।'

জহর হাসিয়া বলিল, 'তা সত্যি। তবে মেজাজ আর আমার গরম হয় না, আমি ভুলে গেচি।'

স্টোভ জ্বালিয়া আগে চা তৈরি হইতে লাগিল। যথাসময়ে চা পান করিয়া জহর দরজা খুলিল। বাড়ির যিনি বড় ছেলে, তিনি সদর দরজায় দাঁড়াইয়া একটি লোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন। জহরকে দেখিয়া বলিলেন, 'নমস্কার।'

জহর কহিল, 'নমস্কার।'

তিনি কহিলেন, 'আপনাকে দেখতেই পাই না যে একটু আলাপ-সালাপ করবো। কাজ-কর্মে খুব ব্যস্ত থাকেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এইটে আমাদের মরশুমের সময় কি না। ধান পাট বিক্রি হয়ে গেছে, টাকাকড়ি আদায় করবার সময়—'

লোকটি কহিল, 'কাল অনেক রাত পর্যন্ত আপনাদের এখানে কি গোলমাল হচ্ছিল বলুন ত?'

'কালকে? ওঃ মনে পড়েছে, আমাদের একটি প্রজা এসে—টাকাকড়ি নিয়ে গোলমাল কিনা—'

এমন সময় একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'প্রজা কিন্তু জমিদারকে সমীহ করে না দেখলাম। যে ভাষায় তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করে গেলেন বাবা সে আলাপ একটি বোতলে হয় না। কি ব্যাপার বলত?'

জহর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'কি বলচেন আপনি?'

'বলছি যে—' বলিয়া ভদ্রলোকটি একটু হাসিলেন, তারপর কহিলেন, 'এটা গেরস্থ বাড়ি কিনা, মেয়েছেলেরা রয়েছেন, মাতলামি করার এখানে একটু অসুবিধা আছে। তুমিই বল না বাবা—'

'আপনার কি ধারণা কাল রাতে আপনার বাড়িতে মাতলামি হয়ে গেছে?'

'ধারণা ত নয় বাবা, সত্যি ঘটনা। সুতরাং এমন ঘটনা আর না ঘটে তার ব্যবস্থা তোমরা আজই একটা কর বাবা!'

'অর্থাৎ?'

বড় ছেলেটি কহিল, 'অর্থাৎ ঘর দুখানা যদি খালি হয় তা হলে আমরা অন্য ভাড়াটে বসাতে পারি।'

শ্রীমতী আর ভিতরে থাকিতে পারিল না, মাথায় ঘোমটা তুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'বেশি দূর বোধ হয় আপনাদের পড়াশুনো নেই, তা হ'লে বুঝতেন আইনের চোখে আপনাদের এই

অভদ্র দাবি একটুও টেকে না। আপনারা কি বলতে চান্ আমাকে বলুন।'

পিতা আর একটু উষ্ণ হইয়া কহিলেন, 'কথাবার্তা হচ্চে পুরুষের মধ্যে, তুমি মা ঘরে যাও।'

অধিকতর উষ্ণ হইয়া শ্রীমতী কহিল, 'আমি আপনার মা-ও নই, আমাকে তুমি বলে ডাকবার অধিকারো আপনাকে দিই নি, একটু ভেবেচিন্তে কথা বলবেন।' বলিয়া সে একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, 'আপনাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবার রুচি আমার হতো না, কিন্তু মাতব্বরি করা হয়েচে এই কথা বলে কত বড় অসম্মান যে আপনারা আমাকে করলেন, সে কথা বোঝবার মত সামান্য শিক্ষাও আপনাদের নেই। আপনারা আবার গিয়ে পাঠশালায় ভর্তি হোন্।'

পুত্র কহিল, 'মুখ সাম্‌লে কথা বলবেন। মেয়েমানুষ বলে আপনাকে—'

শ্রীমতী হাসিল, কহিল, 'আবার ভুল হ'লো। মেয়েমানুষের ভদ্রভাষা হচ্ছে মহিলা, এটা মুখস্থ করে রাখুন।'

পুত্রটি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, পিতা তাহা পিঠ ঠুকিয়া পথে নামাইয়া দিলেন। ছোক্‌রা পথের উপর গোঁজ-গোঁজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শ্রীমতী জহরের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'এ-বাড়ির মালিককে বলে দাও যে আমরা তাঁদের ইচ্ছায় আজ উঠে যেতে রাজি নই, কারণ একমাসের ভাড়া আমরা আগাম দিয়ে এ বাড়িতে এসেছি।'

'ভাড়া যে দিয়েছেন তার প্রমাণ নেই।'

'নেই? ও, হ্যাঁ, রসিদখানা আমরা ভদ্রতা ক'রে নিই নি বটে। তবুও এটা আমরা জানিয়েই দিচ্ছি, আপাতত আমরা উঠতে রাজি নই।'

কর্তা কহিলেন, 'তিন দিনের ভাড়া কেটে নিয়ে বাকিটা ফেরত দিলেও না?'

জহর বেয়াকুবের মত দাঁড়াইয়া ইহাদের দিকে তাকাইয়াছিল। শ্রীমতী তাহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া হাসি চাপিয়া কহিল, 'তা হলেও না। আমরা নিজের সুবিধে মতন উঠে যাবো, কারো কথায় নয়। যদি দরকার হয় আপনারা পুলিশে খবর দিতে পারেন।'

বাহির হইতে পুত্রটি এইবার গর্জন করিয়া কহিল, 'পুলিশ নয়, গায়ের জোরে আমরা তুলে দেবো।'

জহর ফিরিয়া দাঁড়াইতেছিল, শ্রীমতী তাহাকে টানিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিল, তারপর হাসিতে হাসিতে কহিল, 'বেশ ত, তাতেও আপত্তি নেই। তবে আমরা দু'জন একত্র হ'লে আপনাদের একটু অসুবিধে হবে, আপনাদের যে রকম চেহারা, মনে হচ্ছে আমি একলাই আপনাদের সামলাতে পারবো।' বলিয়া সে এক লীলায়িত ভঙ্গীতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

ভিতরে জহর পায়চারি করিতেছিল। শ্রীমতী একবার তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিল। যে-কোন নারীই জহরকে দেখিয়া খুশি হইবে। শুধু তাহার ভস্মাচ্ছাদিত রূপ দেখিয়া নয়, তাহার বলিষ্ঠ বাহু, সুবিস্তৃত বক্ষপট, সুন্দর মাংসপেশী—দেহের কোথাও তাহার বিন্দুমাত্র ফাঁকি নাই। সে কহিল, 'একটা কেলেঙ্কারি না ঘটে। তোমাকে আমার ভয় করে বাপু।'

জহর কহিল, 'ভয় নেই, দু-চার ঘা মার খাওয়া পর্যন্ত আমি চুপ করেই থাকবো।'

'তারপর?'

'তারপর বলতে পারি নে। তারপর হয় ত গুহা থেকে বাঘ বেরিয়েও পড়তে পারে। মেয়েদের অসম্ভ্রম আমি অনেক অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমার অসম্মান আমার সহ্য হবে না শ্রীমতী।'

সেদিন আর রান্নাবান্না চড়িল না, দুইজনে স্নান করিয়া ঘরে তালাচাবি দিয়া এক সময় বাহির হইয়া পড়িল।

পথে বাহির হইয়া তাহারা দুই ঘণ্টা ধরিয়া লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কলিকাতা নগরীর সুপ্রশস্ত রাজপথগুলিতে তখন এক প্রকার বিচিত্র কলরব ও আন্দোলন উঠিয়াছে। অসংখ্য মানুষ, অগণন গাড়ি-ঘোড়া, মোটর, ট্রাম, বাস্—কোথাও চিৎকার, কোথাও সোরগোল, ভিড়, মারামারি, বক্তৃতা, তামাসা, শোভাযাত্রা, সমস্তটা মিলিয়া-মিশিয়া তালগোল পাকাইয়া এক অপূর্ব রসসৃষ্টি হইতেছে। ইহাদেরই ভিতর শ্রীমতীকে লইয়া এতক্ষণ ধরিয়া জহর ঘুরপাক খাইল। ট্রামে উঠিল, বাসে চড়িল, তারপর হাঁটিল, হাঁটিতে হাঁটিতে ট্যাক্সি করিল এবং ট্যাক্সি হইতে এক হোটেলের দরজায় আসিয়া থামিল।

ভাত-তরকারির হোটেল। সুন্দরী যুবতী সঙ্গে আসিয়াছে দেখিয়া হোটেলওয়ালা তাদের আলাদা ঘরে জায়গা করিয়া দিল। সেখানে গিয়া দুইজনে দুইখানি আসনে বসিলে থালায় করিয়া ভাত এবং আনুষঙ্গিক তরকারি প্রভৃতি আসিল।

পেট ভরিয়া পরম তৃপ্তিতে দুইজনে আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া দেখিল, ব্যয় আহারের অনুপাতে সামান্যই হইয়াছে। যাহা হউক, হিসাব চুকাইয়া বাহিরে আসিয়া জহর কহিল, 'এবারে কি করা যাবে বলত ?'

শ্রীমতী কহিল, ভাতের একটা নেশা আছে, এবার ঘুম পাবে।'

জহর কহিল, 'চল তবে গঙ্গায় গিয়ে স্টিমারে চড়ি গে। তার নিচের তলায় গিয়ে ঘুমানো যাবে। ঘণ্টা-তিনেক ত পারাপার করা চলবে, তারপর নামবার সময় টিকিট দিলেই হবে।'

শ্রীমতী বলিল, 'তার চেয়ে চল ট্রেনে ক'রে কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক্। ট্রেনের দোলায় ঘুমোতে আমার ভারি ভাল লাগে।' বলিয়া সে একখানা গাড়ি ডাকিতে গেল, জহর বাধা দিল। বলিল, 'চল হেঁটে যাই।'

হাঁটিতে-হাঁটিতে তাহারা হাওড়ার পথের দিকে চলিল। পথ ঘুরিয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতে পিছনে কাহার ডাক শুনিয়া দুইজনেই একেবার থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি যুবক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একেবারে শ্রীমতীর হাত ধরিয়া বলিল, 'দিদি, আপনি এদিকে?'

শ্রীমতী আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিল, 'বিমল যে, ভাল ত?'

বিমল বলিল, 'বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, দেখি আপনারা চলেছেন, ওই দেখুন আপনার ছোট বোন এখনো দাঁড়িয়ে। চলুন, বাসায় চলুন।'

শ্রীমতী কহিল, 'এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই বিমল, ইনি হচ্ছেন প্রফেসর, যে-কলেজে আমি পড়তাম সেই কলেজের। আর ইনি হচ্ছেন আমার ভগ্নিপতি, বুঝলেন মাস্টারমশাই?'

জহরের সহিত নমস্কার বিনিময় করিয়া বিমল তাহার হাত ছুঁইয়া কহিল, 'আসুন মাস্টারমশাই।'

অবস্থা বিমলদের যথেষ্ট ভাল, ঐশ্বর্যের প্রচুর চিহ্ন তাহাদের বড় বাড়িখানার সর্বত্র বিদ্যমান। নিচে চাকর বামুন বসিয়া জটলা করিতেছিল, তাদের দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের বৈঠকখানায় জনকয়েক ছেলে-ছোকরা ইলেকট্রিকের পাখার তলায় বসিয়া তাস-পাশা খেলিতেছে। সিঁড়ির কাছে আসিয়া শ্রীমতীর ছোট বোন রমা হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল। দিদির হাত ধরিয়া সে উপরে লইয়া গেল। বিমল কহিল, 'মাস্টারমশাই, আপনিও আসুন ওপরে।'

উপরে উঠিয়া একখানা ঘরে লইয়া গিয়া বিমল কহিল, 'বসুন

এই ইজিচেয়ারটায়, বিশ্রাম করুন। এটা আমার লাইব্রেরী, যদি কোনো বই পড়তে ইচ্ছা হয়—দাঁড়ান আমি আসচি।'

একটু পরে রমাকে লইয়া সে আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নমস্কার করিয়া রমা কহিল, 'দিদি আপনার কাছে পড়েচেন, আমার কিন্তু সে ভাগ্য হয় নি।'

জহর কহিল, 'কোন কলেজে আপনি পড়তেন?'

রমা বিমলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, 'কলেজেও নয় ম্যাট্রিক পর্যন্ত, তাও পাশ করি নি, এমন সময়—' বলিয়া সে লজ্জায় চুপ করিয়া গেল।

জহর কহিল, 'এমন সময় বুঝি একদিন শাঁখ বেজে উঠ্‌লো?'

হাসিতে-হাসিতে চলিয়া যাইবার সময় রমা বলিল, 'আপনার জন্যে চা ক'রে আনি।'

বিমল তাহার সহিত গল্প করিতে বসিয়া গেল।

শুইবার ঘরে ঢুকিয়া রমা দরজাটা একটু ভেজাইয়া দিল। শ্রীমতী তখন তাহার পুত্রটিকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। রমা কহিল, 'একটা ছেলে কি মেয়েও ত তোমার হ'ল না যে শান্ত হয়ে এক জায়গায় থাকবে। হ্যাঁ, তারপর?'

'তারপর আর কি।' শ্রীমতী বলিয়া চলিল, 'ঝগড়া বাধলো পুরুষ যখন কাপুরুষ হয়ে ওঠে তখন আমি সইতে পারি নে রমা।'

রমা কহিল, 'বাধ্‌লো রমণীবাবুর সঙ্গে?'

'না বেধে উপায় ছিল না। বিষয় গেল, টাকাকড়ি গেল, গয়না গেল, এমন কি ঘরের জিনিসপত্র পর্যন্ত—তাও সয়, মদ খেয়ে বাইরের মেয়েমানুষ এনে মাতলামি তাও না-হয় ক্ষমা করা যায়, কিন্তু যেদিন শুনলাম আশেপাশের বাড়ির বৌ-ঝিরা পর্যন্ত উত্ত্যক্ত হয়ে উঠ্‌লো, তারা কলতলায় যেতে পায় না, ছাতে উঠ্‌তে পায় না—সেদিন আমার এল বিজাতীয় ঘৃণা, সেদিন আর সহ্য হ'লো না রমা, ঝিয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভোর

রাতে বেরিয়ে পড়লাম। উঃ সমস্ত পৃথিবী তখন আমার চোখে অন্ধকার।'

'বাবার ওখানে গিয়ে উঠলে না কেন? তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তিই ত তোমার। তিনি ত আর তোমাকে—'

শ্রীমতী কহিল, 'বাবার ওখানেই যাবার কথা, তা জানি, কিন্তু কমন করে যাই বল ত? কি কৈফিয়ৎ দেবো তাঁকে গিয়ে। স্বামীর চরিত্র নিয়ে বাবার কাছে আলোচনা করবো—তার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা ভাল।' বলিতে-বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিল।

রমা বলিল, 'একে তুমি চিরদিন অশান্ত, তার ওপর এই হ'লো। ওখান থেকে বেরিয়ে তুমি আমার কাছে এলে না কেন?'

'কেন আসি নি সে কথা আমার মন নিয়ে না বুঝলে বোঝানো যাবে না ভাই। মানুষ যখন সবচের চেয়ে বড় আশ্রয় ত্যাগ করে, সে হয় মরিয়া।'

রমা কহিল, 'আমার কাছে খবর যখন এল, আমি একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। কোথায় খবর নিই, কাকে জিজ্ঞাসা করি—ঘরের মধ্যে বসে ছটফট করতে লাগলাম। এ-ক'দিন তুমি কোথায় ছিলে দিদি?'

'প্রথমে ঝিয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম, দেখি তার মতলব ভাল নয়, সে এক ভয়ানক বিপদ রমা, এমন দিনে দেখা হ'লো মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে; উনি আমার বিপদের বন্ধু, দুঃখের বন্ধু।'

'এবার বাবার কাছে যাবে ত?'

'যাবো, কিন্তু থাকবো না।'

'থাকবে না? তবে—'

শ্রীমতী একটু হাসিয়া বলিল, 'কোথাও থাকবো না ভাই, থাকবো নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে। যে-মেয়ে আমার মতন অবস্থায় পড়ে, যার বাপের বিষয়-সম্পত্তি নেই, সে কেমন ক'রে দাঁড়ায় আমি তাই দেখাবো।'

কিন্তু তোমার আশাই ত বাবা করেন দিদি। একে মা নেই।'

'তা আমি জানি রমা। তারপর, তুই কেমন আছিস্ বল্? ছেলের কি নাম রাখ্‌লি?'

'নাম এখনো রাখা হয় নি। পঞ্চানন কি ভজহরি যা হোক একটা রাখ্‌তে হবে।'

দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। রমা কহিল, 'কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম দিদি, কোন অবস্থাই কোনদিন তোমাকে কাবু করতে পারলো না।, কাবু হতে কোলে যদি একটা ছেলেপুলে থাক্‌তো।'

'হাঁ, তা হলে কাবু হতাম।' বলিয়া কোলের ঘুমন্ত সুন্দর ছেলেটির মুখে হেঁট হইয়া শ্রীমতী একটি পরিপূর্ণ চুম্বন বসাইয়া দিল। তারপর মুখ তুলিয়া পুনরায় কহিল, 'দিবি তোর ছেলেটাকে আমার কাছে?'

রমা বলিল, 'দিতেই আমার ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে তোমার মতনই আমার ছেলে বেপরোয়া, জালছেঁড়া, পোলোভাঙা হোক। দুরন্ত ছেলে আমার খুব ভালো লাগে।' বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া চায়ের জল চড়াইতে বসিল।

চা হইয়া গেলে সে ডাকিল, 'কানাই?'

কানাই সাড়া দিয়া দরজার কাছে আসিল।

রমা কহিল, 'লাইব্রেরী-ঘরে সাড়াশব্দ শুন্‌ছি, দেখে আয় ত বাবা ক পেয়ালা চা লাগবে?'

কানাই গিয়া দেখিয়া আসিয়া কহিল, 'বাবুকে নিয়ে ছ পেয়ালা বৌমা।'

চা এবং খাবার সাজাইয়া কানাইকে দিয়া সে পাঠাইয়া দিল। তারপর নিজের হাতে সে একপেয়ালা চা ও জলখাবারের একটি ডিস্ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'এসো দিদি, ও-ঘরে যাই।'

দুই বোনে লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে একটি রীতিমত মজলিস বসিয়াছে। কাছে গিয়া রমা ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর

চা ও খাবার রাখিয়া কহিল, 'আপনার ছাত্রীর জন্যে চা দিতে দেরি হলো মাস্টারমশাই।'

সকলেই আজিকার এই নবাগতা তন্বী সুন্দরীটির দিকে চাহিলেন। এমনি করিয়া অপরিচয়ের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া এত সহজে যে কথা বলিতে পারে তাহার সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল সকলের মনে আনাগোনা করিতে লাগিল। অথচ ইহাকে প্রগল্‌ভা নারী বলিয়া কোনো একটা বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করিবার উপায় নাই। মনে হইল, ধারালো কৌতুক ইহার দুই আয়ত চক্ষু হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

বিমল বলিল, 'এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই, ইনি আমাদের অতিথি।'

শ্রীমতী কহিল, 'আমি নিজেই পরিচয় দিচ্ছি। হ্যাঁ, তার আগে বিমলের ভুলটা শুধ্‌রে দিই। আমি এঁদের অতিথি নই, অভ্যাগত মাত্র। আমার পরিচয়টা আমার দিকে তাকালেই খানিকটা ভেবে নেওয়া যায়, বাকি সামাজিক পরিচয়টুকু হচ্ছে আমি এ-বাড়ির কর্তা এবং গিন্নীর দিদি, আর ওই যে উনি বসে আছেন, ওঁর আমি ছাত্রী।'

মিস্টার রায় কহিলেন, 'এর আগে আপনার দর্শন মেলে নি ত?'

'মেলা কঠিন, দর্শনের ব্যাপার কি না। মাস্টারমশাই চুপ ক'রে রইলেন যে? আপনার কি ঠাণ্ডা চা খাওয়া অভ্যাস?'

জহর কহিল, 'হ্যাঁ, কথায়-কথায় গরম হয়ে উঠলাম কিনা, সুতরাং চা-টা ঠাণ্ডা হওয়াই দরকার।' বলিয়া সে পেয়ালাটা তুলিয়া লইল।

শ্রীমতী স্বচ্ছ হাসি হাসিয়া কহিল, 'তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই বিমল, মাস্টারমশাই এমনিই, ঠিক হারমোনিয়মের মতো রীডের ওপর আঙুল না টিপলে ওঁর কথা বেরোয় না।'

ছোকরা উকিল অমলেন্দু বলিল, 'বেশ ত ভাল করেই আপনি বাজান না, আমরা ওঁর গান শুনি?'

'কি মাস্টারমশাই, বাজাবো নাকি, কল আপনার বেগড়ায় নি ত ?'

রমা তাহার কথা শুনিয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। জহর কহিল, 'কল যদি না বিগড়ে থাকে, মর্চে ধরেচে, তোমারো ত বাজানো প্র্যাকটিস নেই।'

বিমল বলিল, 'রূপক ছেড়ে দিয়ে যদি সত্যি গানই এঁদের একটা শুনিয়ে দেন তা হ'লে কেমন হয় দিদি ?'

'অত্যন্ত একঘেয়ে হয়। পৃথিবীতে এসে গান গেয়ে খুশি করা ছাড়াও মেয়েদের অন্য কাজ আছে বিমল।'

হঠাৎ সকলে যেন একটা কঠিন ধাক্কায় চকিত হইয়া শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকাইল। জহর মুখ তুলিল না বটে কিন্তু হাসিয়া চায়ের পেয়ালাটা আর একবার মুখের কাছে ধরিল।

'এটা কিন্তু খুব সত্যি বিমলবাবু।' অমলেন্দু বলিল।

এবার জহর কথা কহিল, বলিল, 'জীবনের বড়-বড় সত্যগুলো কিন্তু প্রকাশ করা সঙ্গত নয়।'

বিমল কহিল, 'ঠিক বলেচেন মাস্টারমশাই, সংসার মনোহর হয়ে উঠেছে মিথ্যা নিয়ে, সত্য নিয়ে নয়।'

'এবার তোমার সঙ্গে আমার মিলবে। জগৎটা আমার চোখে অতি প্রিয়, তার কারণ এখানে নরঘাতক আর ধার্মিকের মূল্য প্রায় একই। একজন পায় ঘৃণা, আর একজন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।'

মিঃ লাহিড়ী কহিলেন, 'আপনি কি বলতে চান্ মুড়ি মিছরির এক দর ?'

'ধার্মিকেরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাত্র হলেও পরলোকে—'

শ্রীমতী খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং সে-হাসির বেগ মিনিট দুই ধরিয়া থামিতেই চাহিল না। হাসি থামিলে কহিল, 'পরকালে তাঁদের নরক ভোগ হওয়াও ত সম্ভব।'

'নরক ভোগ, আপনি বলেন কি ?'

শ্রীমতী কহিল, 'পৃথিবীতে একদল সমাজচ্যুত বেকার আছে, তাদের দলের কতকগুলি লোক সভ্যতার নামে মানুষের বন্ধনই সৃষ্টি করে আর বাকি লোকগুলি করে ধর্মপ্রচার অর্থাৎ মানুষকে পঙ্গু করবার ফন্দী। মনুষ্য-সমাজের হিত করবার মতো অন্যায় স্পর্ধা সংসারের আর কিছু নেই, যারা করে তাদের ক্রুশে বিদ্ধ ক'রে মারাই উচিত।'

মনে হইল জহর ভিন্ন তাহার কথাগুলিকে একটুখানি মানিয়া লইবার মতো মুখও ইহাদের ভিতর কাহারও দেখা যাইতেছে না। দেখা না গেলেও তাহার কিছু যায় আসে না। সে অবলীলাক্রমে হাসিয়া বলিল, 'আপনিই বলুন ত মাস্টারমশাই, যারা মানুষকে বিষ খাইয়ে মারে তাদের বুঝতে পারি, কিন্তু যারা ধর্মবাণী শুনিয়ে মানুষের মনকে অভিভূত করে, অকর্মণ্য করে, তারা মানবজাতির সব চেয়ে বড় শত্রু নয় কি?' বলিয়া শ্রীমতী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পিছন ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল।

জহর মুখের হাসি সংযত করিয়া একখানি বই খুলিয়া লইয়া বসিয়াছিল। আজ সে মন খুলিয়া শ্রীমতীর একবার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। একটু আগে এই ঘরে এতগুলি লোকের সম্মুখে শ্রীমতীর আবির্ভাবও যেমন হইয়াছিল অকস্মাৎ, তিরোভাবও হইল তেমনি একটি সুন্দর, নাটকীয় রসসৃষ্টির ভিতর দিয়া। এতগুলি কথা সে বলিয়া গেল কিন্তু ইহার মধ্যে তার জ্বালাও নাই, উষ্মাও নাই—কথাগুলি লইয়া সে খেলা করিয়া গেল মাত্র। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না, তাহা তাহার গ্রাহ্যই নাই; মুখে আসিল, মুখের কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। কথা বলার দায়িত্ব সে নিজেও কিছু লয় না, সংসারে বিশ্বাসও তাহার কিছুর প্রতিই নাই। বড় বড় তত্ত্ব লইয়া যাহারা বক্তৃতা করিয়া যায়, নিজ জীবনে তাহারা কিছুই বিশ্বাস করে না।

বেলা পড়িয়া আসিল, বন্ধুবান্ধব একে-একে বিদায় লইয়া চলিয়া

গেলেন, নিচে অনেকের মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। বিমল যখন তাহাদের পৌঁছাইয়া দিতে নিচে নামিয়া গেল তখন শ্রীমতী আসিয়া একবার লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া কাছে আসিয়া ইজি-চেয়ারের একটা হাতলের উপর বসিয়া জহরের একটা হাত ধরিল। বলিল, 'ভারি বিপদে পড়লাম যে! এরা ত আমাকে এখন ছাড়বে না?'

জহর বলিল, 'সেই প্রার্থনাই ত শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন কচ্ছি, যেন না ছাড়ে।'

'কেন? তুমি বুঝি আর আমাকে সহ্য করতে পারছ না?'

মুখের হাসি চাপিয়া জহর বলিল, 'ভগবান জানেন আমার মনের কথা, আমার হ'লো শাঁখের করাত।'

অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতো শ্রীমতী তাহার হাতখানা একবার মুচড়াইয়া দিল। বলিল, 'শোনো. আমাকে এখন এখানে থাকতেই হবে—'

জহর বলিল, 'যদি না থাকো তা হ'লে বুঝবো তোমার চরিত্র রীতিমত সন্দেহজনক।'

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, 'তুমি এখন কী করবে?'

'খাবো দাবো, ডুগ্‌ডুগি বাজাবো।'

'ঠাট্টা নয়, বল!'

জহর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য! কি করবো, সে ফর্দ তোমার নিয়ে কি হবে? ছাড়ো, ওঠো এখান থেকে, কেউ এসে পড়বে।'

'আসুক, বল তুমি।'

জহর চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীমতী কহিল, 'দিন-কয়েক আমি এখানে থাকবো। তারপর যাবো বাবার ওখানে, তুমি আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করবে ত?'

'কেন?' জহর মুখ তুলিল।

শ্রীমতী একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'তাই বলছি, রাগ করছ কেন? যদি না যাও তা হ'লে ত আমার নালিশ করবার কিছুই নেই।'

বাহিরে পায়ের শব্দ হইতেই সে উঠিয়া সরিয়া গেল। বিমল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, 'দিদি, আপনার প্রশংসায় সকলে মুখর হয়ে গেলেন।'

শ্রীমতী কহিল, 'আমার মতামতের প্রশংসা না আর কিছুর বিমল?'

বিমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, 'শিক্ষিত লোকের প্রশংসা কি না তাই ঠিক বোঝা গেল না।' বলিয়া সে বাহির হইয়া আবার চলিয়া গেল।

শ্রীমতী আবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একখানি হাত বাড়াইয়া আজ প্রথম জহরের মাথার চুলগুলি নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, 'ঠাট্টা করবে না, একটা সত্যি কথা বলবে?'

জহর বলিল, 'ছাত্রীর সঙ্গে কি ঠাট্টার সম্পর্ক?'

'আচ্ছা, ছাত্রীই না হয় হলাম। বল ত তোমার শেষ লক্ষ্যটা কি?'

'শেষ লক্ষ্য? কেন, মানুষের শেষ লক্ষ্য—মৃত্যু?'

'সে একশোবার, তার আগে পর্যন্ত?'

জহর বলিল, 'এটা তোমার মেয়েলি মনের পরিচয়, বিষয় বুদ্ধি। কেউ জানে তার ভবিষ্যৎ? তুমি জানো তোমার নিয়তি কোথায় টেনে নিয়ে যাবে?'

শ্রীমতী হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, বল ত তুমি সংসার করবে কি না?'

'তোমার মাথা ব্যথার হেতু?'

'শুধু কৌতূহল। জানো ত মেয়েমানুষের মন?'

জহর বলিল, 'সংসারের ওপর মমতা আমার ভয়ানক শ্রীমতী। বড় ভালবাসি আমি সংসারী হতে।'

'হও না কেন?'

জহর চুপ করিয়া বইখানার দিকে তাকাইয়া রহিল। শ্রীমতী তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া কহিল, 'উত্তর দিচ্ছ না যে?'

একটু উদাস হাসিয়া মুখ তুলিয়া জহর কহিল, 'কী উত্তর দেবো?'

'বল যে, 'ওগো, এই কারণে আমি সংসারী হতে পারলাম না। সে কারণটা কি বল। ব্যর্থপ্রেম?'

'আরে রামোঃ!' বলিয়া জহর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

'তবে অর্থাভাব?'

'অর্থাভাব হলেও কি মানুষের সংসারী হতে বাধে?'

'তবে? তবে? তবে কী, বলতেই হবে!'

জহর উত্ত্যক্ত হইয়া কহিল, 'তুমি পরস্ত্রী, তোমার এ-কৌতূহল কেন শ্রীমতী?'

শ্রীমতী এবার চুপ করিয়া সরিয়া আসিল। জহর বলিল, 'আজ তোমার কথাবার্তায়, ধরনধারণে তুমি যেমন চঞ্চল, তেমনি কেমন যেন একটা বিরক্তিকর আত্মীয়তার ছুঁচ ফুটচে। এ ত তোমার অভ্যাস নয়?'

এ একেবারে জহরের নিজস্ব চেহারা। শ্রীমতী হাসিমুখেই কহিল, 'কি তোমার মনে হচ্ছে?'

'এ ঠিক প্রেম নয়, এর মধ্যে খানিকটা সহানুভূতি আর অনুকম্পা মেশানো রয়েছে।'

'আর ওই যে ছুঁলাম তোমাকে তার কী?'

'কিছুই না, সামান্য একটু পরকীয়া রসের ইঙ্গিত। এসব কেন বল ত?'

'বোধ হয় তোমাকে আজ ছাড়তে হবে তাই জন্যে। তোমার পথটা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কোথাও ছায়া নেই!' বলিয়া শ্রীমতী

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে বাহিরের দিকে তাকাইল, তারপর 'আসছি, বসো—' বলিয়া একটি ছোট্ট নিশ্বাস চাপিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন আর একা নয়, পিছনে রমা। আসিয়া বলিল, 'মাস্টারমশাই যাচ্ছেন যে।'

রমা হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, 'আপনার চেয়ে বড় বন্ধু দিদির আর কেউ নেই। কত বড় দুর্দিনে যে আপনি তাকে— আবার আপনি কবে আসবেন বলে যান্ মাস্টারমশাই।'

'একদিন এর মধ্যে এলেই হবে।'

শ্রীমতী কহিল, 'এখন ক'দিন ওই বাড়িতেই আপনি থাকবেন, চট করে যেন বাড়ি-বদল করবেন না। বুঝলেন?'

শান্ত ছেলেটির মতো জহর মাথা নাড়িল। শ্রীমতী মেঝের উপর হাঁটু পাতিয়া গলায় আঁচল দিয়া পায়ের ধূলা তুলিয়া লইল।

'ওঁকে ডেকে দিই।' বলিয়া রমা বাহির হইয়া যাইতেই সে দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তারপর একবারটি এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া জহরের পায়ের ধূলামাখা হাতখানি জহরেরই মাথায় মাখাইয়া দিল। বলিল, 'বয়ে গেছে পায়ের ধুলো নিতে।'

জহর রাগ করিয়া কহিল, 'ক্লাশে গিয়ে তোমাকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দেবো। যদি না দিই তা হ'লে আমার নাম—'

শ্রীমতী হাসিয়া বলিল, 'আর আমি তার ওপর দাঁড়িয়ে একালের মাস্টারমশাইদের চারিত্রিক অধোগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবো।'

উচ্চকণ্ঠে দুইজনে হাসিয়া উঠিবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিমল আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

বিদায় লইয়া জহর যখন পথে নামিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পথে লোকজনের সমারোহ কমে নাই বরং সন্ধ্যার মুখে বাড়িয়াই গিয়াছে। বড় রাস্তাটার মোড়ে আসিয়া প্রথমেই

তাহার মনে হইল, কোন্ দিকে যাওয়া যায়। যেদিকেই যাওয়া যায় সেই দিকই তাহার পক্ষে অবারিত। আঃ, এবার সে বাঁচিয়া গেল। শ্রীমতীর জন্য সম্ভবত মনে মনে তাহার একটা দুশ্চিন্তা ছিল, আজ বিমলচন্দ্র মূর্তিমান মুক্তির মতো আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিল। বিমলের কাছে সে চিরকৃতজ্ঞ। অনাত্মীয় স্ত্রীলোককে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার মতো বিড়ম্বনা সংসারে আর কিছু নাই, সুন্দরী স্ত্রীলোক হইলে আরও অসুবিধা। যাক, শ্রীমতী এবার বাঁচিয়া গেল। হাতের কাছে এতবড় আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বেওয়ারিশের মতো তাহার সহিত এ কয়দিন পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ানো শ্রীমতীর উচিত হয় নাই। পথে-পথে কেনই বা এমন করিয়া সে বেড়াইয়া গেল? স্বাবলম্বী হওয়া সকলেরই প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জন্য এমন অযৌক্তিক ব্যাকুলতা কেন? শ্রীমতীর বড় হইয়া উঠিবার একটা উচ্চাশা আছে বটে, কিন্তু তাহার স্পষ্ট অভাব ত কিছুই নাই!

যাক্ শ্রীমতী! তাহার দুরন্তপনায় এই কয়দিন ধরিয়া জহরের দৈনন্দিন জীবনের নিয়মানুবর্তিতা ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার প্রত্যহের বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি পরম তৃপ্তিকর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, শ্রীমতী তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, অথচ তাহার দৌড় এই পর্যন্তই। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া এক বৃহৎ আদর্শবাদ মাথায় লইয়া যে-মেয়ে সমাজ-দ্রোহিণী সাজিয়া পথে নামিয়া আসিয়াছিল, আপন সহোদরার একটি সামান্য আশ্রয় পাইয়া তাহার দ্রুতগতি আজ থামিয়া গেছে। এদেশের মেয়েরা এতই বিষয়বুদ্ধি লইয়া থাকে যে, শেষরক্ষা করিতে পারে না। খুব সম্ভবত শ্রীমতীর স্বপ্ন ছিল, আদর্শ উদার সমাজ, সুশৃঙ্খল স্বাস্থ্যময় জীবন, স্বচ্ছন্দ সংসার, অকলঙ্ক ভালবাসা! এমন আজগুবী স্বপ্ন লইয়া এক শ্রীমতীই চিৎকার করিয়া বেড়াইতে পারে। শ্রীমতীর গর্জন আছে বর্ষণ নাই!

চুলোয় যাক্ শ্রীমতী! পথের উপর একটা চায়ের দোকান পাইয়া জহর আসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ বসিয়া-বসিয়া একে-একে

তিন পেয়ালা চা সে নিঃশেষ করিল। দাম চুকাইয়া দিয়া সে যখন আবার পথে নামিল, দেখিল একটা লোক নানারঙের ফুল বিক্রয় করিতেছিল। সে একটা জুঁই ফুলের মালা কিনিয়া হাতে জড়াইয়া চলিতে লাগিল।

চলিতে-চলিতে কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইল, বাজনা-বাদ্য করিয়া চতুর্দোলায় চড়িয়া এক ধনীর পুত্র বিবাহ করিতে চলিয়াছে। সে এক বিরাট শোভাযাত্রা। ইংরেজি ব্যাণ্ড, মাদ্রাজী ফ্লুট, ঘোড়-সওয়ার, কাগজের হাতি ও রাক্ষসী, মাটির পুতুল-নাচ, ছেঁড়া তাজমহল, সমস্ত পথ জুড়িয়া বরযাত্রীদলের এক বিপুল উৎসাহ। যে-লোকটা সানাই-বাঁশী বাজাইতে-বাজাইতে চলিয়াছিল, জহর তাহার সঙ্গ ধরিল। লোকটা জাতিতে সম্ভবত হিন্দু নয়, মাথার পিছন দিকটা অতি কদর্যভাবে ক্ষুর বুলানো। চোখ দুইটা নেশায় রাঙা, আপন মনে বাঁশী বাজাইতে-বাজাইতে হুঁশ নাই যে, তাহার দুই ঠোঁটের কস বাহিয়া ফেনা গড়াইতেছে। কিন্তু এমন করিয়াই সে বাঁশী বাজাইতেছিল যে, জহর তাহাকে ছাড়িতে পারিল না।

কতদূর পর্যন্ত তাহারা গেল, কোন্ পথে ঘুরিল, পথের গাড়ি ঘোড়া লোক-লস্কর, আলো-বাজনা সমস্তটাই জহরের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে ছায়াবাজির মতো মিলাইয়া গিয়াছিল। বহুদূর পর্যন্ত বাঁশী শুনিতে শুনিতে গিয়া একসময় তাহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিল, লোকটা বাঁশী থামাইয়া পকেটের ভিতর হইতে একটা পাঁইট বোতল বাহির করিয়া ছিপি খুলিয়া মুখের কাছে ধরিল। ঢক্-ঢক্ করিয়া খানিকটা কি যেদ গিলিয়া সে আবার বোতলটা পকেটে রাখিয়া দিল। দুর্গন্ধে তখন আর তাহার নিকট থাকা যায় না। জহর চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাঁশীর আওয়াজ আবার উঠিতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুরের মাধুর্যে আবার তাহার দুই কান ভরিয়া গেল, তখন প্রথমেই মনে হইল, শিল্পীরা হয় ত এমনই হয়। মানব-সমাজকে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দিয়াছে, ব্যক্তিগত জীবনে

তাহারা হয় ত নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, তাহাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি সাধারণ মানুষের রুচিকর নয়।

বাঁশী যখন থামিল, দেখিল, তখন চারিদিক হইতে শাঁখ ও উলুধ্বনি উঠিয়াছে। বরকে দেখিবার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি। জহর লজ্জিত হইয়া পাশ কাটাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বড় একটা বাগানবাড়ির মধ্যে সে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

'আরে মশাই, যান কোথায় অত ঠেলেঠুলে?'

'ও-দিকে এগুচ্ছেন কেন, পথ নেই যে?'

'দয়া করে ও-দিক দিয়ে যান্, এ-দিকে অন্দরের পথ।'

চারিদিকের তীব্র আলোয় জহরের চোখে তখন ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে। লোকের ভিড়ের মধ্যে হাঁকপাক করিয়া সে একবার প্রাণপণে বাহির হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান আর অন্দরমহলটাই শুধু তাহার নজরে পড়িল, লোকের ভিড়ে বাহিরের পথটা আর দেখা গেল না।

'মালা পেয়েছেন? আসুন মালা পরিয়ে দিই।' বলিয়া একটি লোক তাহার গলায় একছড়া বেলফুলের মালা পরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। এমন বিপদে জহর জীবনে পড়ে নাই, অতি কষ্টে ভিড়ের ভিতর দিয়া হাতড়াইতে-হাতড়াইতে সে পলাইবার পথটা এতক্ষণে আবিষ্কার করিল। তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিতেই হঠাৎ এক জায়গায় দুইদিক হইতে জলের ছাট তাহার মুখে-চোখে, জামা-কাপড়ে, সর্বাঙ্গে আসিয়া লাগিল। এ আবার কি রসিকতা? দেখিল, গোলাপের গন্ধে তাহার সর্বশরীর ছাইয়া গিয়াছে। এবার একেবারে মরিয়া হইয়া সে গেটের কাছে আসিয়া পড়িল।

'আরে, জহর যে! সোনার চাঁদ, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ওহে সৌরীন, এই ছাখো তোমার বাল্যবন্ধু হাজির, এবার আমাদের দল জম-জমাট!'

একটি যুবক আবার তাহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ভিড়ের মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সৌরীন আসিয়া তাহাকে ধরিল। তাহার কান ধরিয়া বলিল, 'গাধা, তিন দিন ধরে খুঁজেছি তোকে, ছিলি কোথায়? রাধারাণীর যে বিয়ে আজ! তোকে নেমন্তন্ন করবো বলে—'

রাধারাণী সৌরীনের ছোটবোন।

জহর বলিল, 'আমি বুঝি জানি নে যে রাধারাণীর বিয়ে? সব জানি। তার বিয়েতে তুই আমায় নেমন্তন্ন করবি সেই অপেক্ষায় থাক্‌বো? এই দেখ্‌ রাস্তা থেকে নিজে মালা কিনে এনেছি; এই হাতে জড়ানো। তারপর? সেই পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে হ'লো ত?'

'হ্যাঁ, সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্‌। তুই জান্‌লি কেমন ক'রে?'

'জানি না? সমস্ত জানি। ডেপুটি ত দূরের কথা, পঞ্চম জর্জের বড়ছেলেও রাধারাণীকে পছন্দ করতো।'

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সৌরীন কহিল, 'ওঃ তোকে দেখলে বাড়িতে সবাই খুশি হবে। সেদিন রাধারাণী কত দুঃখ করছিল তোর দেখা পাওয়া গেল না বলে। চল্‌ তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবি।'

জহর বাধা দিয়া বলিল, 'আচ্ছা যাবো একটু পরে। যাবোই ত।'

ভিতর বাড়িতে স্টেজ্‌ বাঁধা হইয়াছিল। ছোট-ছোট মেয়েদের নাচ, গান, লাঠিখেলা এবং যাদুবিদ্যা দেখানো হইবে। অমরেশ কহিল, 'এই ত জহরকে পাওয়া গেল, তবে আর কি, এ ত একেবারে জাগ্‌লারিতে ওস্তাদ, ভাই তোর সেই তাসের বাজিটা—'

সৌরীন বলিল, 'ব্যস্‌ কেল্লা মার দিয়া, সে-লোকটার চেয়ে জহর ঢের ভাল করবে। তোর সেই ভেনট্রিলোক্যুইজামটা—উঃ সেটা অদ্ভূত! চল্‌, ভেতরে আয়, মেয়েদের গান শেষ হয়ে এল!'

পাঁচ-সাত জন বন্ধুবান্ধব মিলিয়া তাহাকে অন্দর-মহলের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

বিবাহ-লগ্নের বিলম্ব ছিল। ভিতর বাটীর প্রকাণ্ড উঠানে পাল টাঙাইয়া আসর করা হইয়াছে। একদিকে স্টেজ্ বাঁধা। তাহারই উপর অত্যুগ্র আলোকের সম্মুখে জরির সাজ-সজ্জা করিয়া কয়েকটি মেয়ে নাচিয়া-নাচিয়া গান গাহিতেছিল। গানের বিষয়-বস্তু হইল, দীর্ঘ বিরহের পর নববসন্তে প্রিয়-মিলন। চারিদিকে সম্ভ্রান্ত শ্রোতা ও শ্রোত্রীর দল অসংখ্য চক্ষু মেলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। একটি বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া এমন শত-সহস্র নরনারীর ভিড় জহর ইতিপূর্বে বোধ হয় আর কোথাও দেখে নাই। সে যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

গান থামিতেই সহস্র-সহস্র করতালির অভিনন্দনে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। তাহার পর হইল সঙের নাচ—হাসির সমুদ্র রোল উঠিল। হাসিয়া-হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া সকলে আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

এইবার জহরের পালা। সকলে তাহাকে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া স্টেজের উপর উঠাইয়া দিল। বহুদিনের অনভ্যাসে প্রথমটা সে কথা বলিতে গিয়া থতমত খাইয়া গেল, এই বিপুল জনতার মাঝখানে তাহার হাত-পা আসিল না। অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টি তাহার দিকে নিস্পন্দ হইয়া তাকাইয়া আছে। মুহূর্তে তাহার গায়ের রক্ত ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল।

কী যে করিবে, কী বলিবে—সব তাহার গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ আর বিলম্ব নয়, এইবার লোকে তীব্রকণ্ঠে বিদ্রূপ করিয়া উঠিবে। মঞ্চের উপর দুই-একবার পায়চারি করিয়া নিস্তব্ধ দর্শকগণের মুখের উপর জহর হঠাৎ মরিয়া হইয়া চিৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'আপনারা সবাই দেখচেন আমি আজ দাড়ি কামাই নি। কামাই নি ত? দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন আমার দাড়ি।'

দুই-এক জন বলিয়া উঠিল, 'তা ত দেখছি, কামান নি।'

'কে বলে কামাই নি?' বলিয়া সে একখানা রুমাল বাহির করিয়া মুখ ঢাকিল। মুখ যখন খুলিল, তখন দেখা গেল তাহার দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করিয়া কামানো। সকলে হাততালি দিয়া উঠিল। এ ত আশ্চর্য জাতুকর!

'এবার শুনুন আপনারা, একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বল্‌বো। তাঁকে আপনারা দেখতে পাবেন না, অথচ তিনি আমার পাশে আছেন।' বলিয়া গলা ঝাড়িয়া জহর আরম্ভ করিল। প্রথমে ডাকিল, 'শ্রীমতী?'

সুন্দর নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, 'কি বলচ?'

'দাঁড়াও, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'বিমলদেব বাড়ি।'

'সেখানে কে আছে।'

'আমার ছোটবোন।'

'শোনো, কবে আসবে?'

'আর আসবো না, চল্‌লাম।'

'শুনে যাও, আমি থাকবো কেমন করে?'

'তা আমি জানি নে, চল্‌লাম।'

'আচ্ছা শোনো, আমি তোমায় ভালবাসি।'

'মিথ্যে কথা, তুমি আমায় ভালবাস না। চল্‌লাম।'

জহর বলিল, 'তোমার বিরহ আমাব সইবে না শ্রীমতী।'

দূর হইতে নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, 'এ তোমার বাড়াবাড়ি।'

'তোমার দিব্যি ক'বে বল্‌চি শ্রীমতী, দিন আমার কাট্‌বে না।'

শ্রীমতী কহিল, 'মিছে কথা, সকলেরই দিন কাটে, তোমারো—'

'শ্রীমতী শুনে যাও!'

নারীর কণ্ঠস্বর নিকটে আসিয়া কহিল, 'কি বল?'

'তুমি যেয়ো না, এমন ক'রে আমায় কাঙাল ক'রে যেয়ো না!'

খিল্‌-খিল্‌ করিয়া স্ত্রীলোকের হাসির শব্দ হইল। জহর বলিল, 'বিশ্বাস কর, তুমি গেলে আমি সব হারাবো।'

'কী-ই বা তোমার আছে যে হারাবে? ভিখারী ছিলে, এবার না হয় কাঙালই হবে।'

'আমার কিছু নেই, তোমার ভালবাসা পেলে আমি ঐশ্বর্যবান হতে পারি শ্রীমতী। আমি বড় হতে পারি, মানুষ হতে পারি।'

নারীকণ্ঠ কহিল, 'আমি তোমায় ভালবাসি, কিন্তু তুমি তার দাম দিতে পারবে না।'

'শুনে যাও শ্রীমতী, চলে যেয়ো না।'

'না, আমি চল্‌লাম।'

'শুনে যাও, ফিরে চাও?'

দূর হইতে উত্তর আসিল, 'না।'

চিৎকার করিয়া জহর ডাকিল, 'শ্রীমতী?'

বহুদূর হইতে শেষবার জবাব আসিল, 'আমার আশা ছেড়ে দাও।'

বিস্ময়-বিমুগ্ধ নিস্তব্ধ দর্শকমণ্ডলী অবাক হইয়া দেখিল, স্টেজের উপরকার উজ্জ্বল আলোয় ব্যর্থ প্রেমিকটির দুইটি চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিক হইতে অজস্র ও অসংযত হাততালি উঠিয়া সমস্ত আসরটাকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। এমন ভৌতিক প্রেমালাপ তাহারা জীবনে শুনে নাই। আশ্চর্য এই শিল্পী, অভূতপূর্ব ইহার জাদুবিদ্যা।

তারপর তাসের নানারকম বাজি শুরু হইল, সকলে চিৎকার হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। তাহার পর টাকার খেলা। সে খেলা শেষ হইলে জহর অমরেশের নিকটে একটি ট্যাঁক ঘড়ি চাহিয়া লইল। ট্যাঁক ঘড়িটি সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে সে যখন টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল, একটি বর্ষীয়সী মহিলা নিকটবর্তী বারান্দা হইতে উত্ত্যক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এসব ঢের দেখেছি, এ আর নতুন কি?' বলিয়া তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

'দাঁড়ান, নতুন কিছু দেখতে চেয়ে চলে যাবেন না।' বলিয়া জহর

মঞ্চের উপর হইতে নিচে নামিয়া উক্ত মহিলাটির নিকটে আসিল। দর্শকগণ পরম ঔৎসুক্যে তাহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল।

জহর বলিল, 'আমাদের ঘড়িটা নিয়ে চলে যাচ্ছেন, বেশ লোক ত আপনি?'

'ঘড়ি? ঘড়ি আমি কি জানি?' মহিলাটি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

'নিশ্চয় জানেন, ঘড়িটা আছে আপনার কাছে। পরের জিনিস আপনি না বলে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? নিজের ট্যাক দেখুন দেখি।'

মহিলাটি হতভম্ব হইয়া হাত বুলাইয়া নিজের ট্যাক পরীক্ষা করিলেন। কিছু পাওয়া গেল না। তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন, 'ভারি নচ্ছার লোক ত তুমি? ভদ্রলোকের মেয়েছেলেকে—'

জহর বলিল, 'ট্যাকে নেই, তবে নিশ্চয়ই আঁচলে বেঁধেছেন।'

আঁচল ঝাড়িতে গিয়া তিনি দেখেন, আঁচলটা ভারী, তাহার খুঁটে অমরেশের ঘড়িটি বাঁধা। ঘড়ি বাহির হইয়া পড়িতেই মহিলাটির মুখখানি অপমানে বিবর্ণ হইয়া গেল। চারিদিক তৎক্ষণে হাসি, হাততালি, চিৎকার, প্রশংসা ও আনন্দধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়া মহিলাটি সেখান হইতে ভিড়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন।

খেলা শেষ হইলে বিপুল অভিনন্দন ও প্রশংসায় জহরকে সকলে প্লাবিত করিয়া দিল। এই বলিষ্ঠকায় সুশ্রী যুবকটির অলৌকিক শক্তিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া মেয়েরা ধন্য-ধন্য করিতেছিল। এ যেন কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া আজিকার সম্মিলিত শত-শত নরনারীর হৃদয় লইয়া অতি স্বচ্ছন্দে খেলা করিয়া চলিয়া গেল। অদ্ভুত ইহার শক্তি।

বিবাহ লগ্নের আর বেশি বিলম্ব ছিল না। উঠানের এদিকে আটচালার নিচে বরযাত্রীর প্রথম দল তখন সমারোহের সহিত আহার করিতে বসিয়াছে। অনেকে সেইদিকে গিয়া তদ্বিব করিতে-ছিল। এমন সময় সৌরীনের পিছনে পিছনে অন্দরমহলের বারান্দা

হইতে রাধারাণী উঠানের ছোট দরজায় নামিয়া আসিল। বলিল, 'কই দাদা, তোমার বন্ধু?'

'দাঁড়া তুই এখানে, আমি ডেকে আনি।' বলিয়া সৌরীন বাহির হইয়া গেল।

আলো বাঁচাইয়া অতি উদ্বেগে, অতি সন্তর্পণে রাধারাণী সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকক্ষণ বাদে ঘুরিয়া-ফিরিয়া সৌরীন আসিয়া বলিল, 'স্টুপিডকে দেখতে পাচ্ছি নে, হতভাগা গেল কোথায় বলত?' ..

'দেখতে পেলে না?' বলিয়া রাধারাণী গলা বাড়াইয়া বাহিরে একবার চোখ বুলাইয়া চারিদিকে তাকাইল, তারপর চিন্তিত হইয়া বলিল, 'সে হয় সুমুখেই থাকে, নৈলে কোথাও থাকে না দাদা।'

'দেখি, দীনেশটা গেছে তাকে খুঁজতে। হতভাগা খেয়েও গেল না।'

ভাই-বোনে প্রতীক্ষা করিতে-করিতে দীনেশ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'কোথাও তাকে পাওয়া গেল না ভাই। ভেতরে, বাইরে, রাস্তায়—কোথাও না। অদ্ভুত ছেলে যা হোক।'

'অদ্ভুত সে চিরকাল। তুই আর একটু দাঁড়া রাধারাণী, আমি আর একবার তাকে—'

কিন্তু রাধারাণী আর দাঁড়াইল না। অন্ধকারে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'তুমি কি তাকে চেনো না দাদা, সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও তোমরা তাকে আনতে পারবে না।'

এদিকে বিবাহের উৎসব লইয়া সকলেই যখন নানাদিকে ব্যস্ত, জহর তখন পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে চলিয়াছে। পথের ঠিক নাই, তবু মনে হইল এ পথ অনেকদূর। নূতন বাড়ি তৈরি করিয়া রাধারাণীরা যে এ-দিকে আসিয়া বাস করিতেছিল তাহা সে জানিত না। এতক্ষণে গলার ফুলের মালাটি খুলিয়া সে হাতে লইল।

চলিতে চলিতে মনে হইল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। যে-সম্মান ও গৌরব এইমাত্র সে অর্জন করিয়া আসিল তাহাতে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই। জনসাধারণ প্রশংসা অথবা নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত থাকে —তাহারা এইটুকু বুঝে না, যে হতভাগ্য তাদের আনন্দ বিলায়, যে দরিদ্র তাহাদের চিত্ত-বিনোদন করে, তাহার দিন চলে কেমন করিয়া। সংসারে এ-দৃশ্য নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে-রসিক সকলের হাস্যোদ্রেক করে, তাহার ব্যক্তিগত জীবন অতি করুণ, পৃথিবীতে তাহার জন্য কাঁদিবার লোক নাই। যাহাকে সকলে পাইলে আনন্দিত হয়, আপনার জীবনের দুঃখে সে হয় ত নিজেই অশ্রুকাতর। এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে একটি অতি অকরুণ বিদ্রূপ নিহিত রহিয়াছে।

এদিকে ময়রার দোকান একটিও নাই, দুই-একখানি যাহা ছিল এত রাত্রে তাহা বন্ধ হইয়া গেছে। আজ রাত্রে আর আহারাদি করিবার কোনও উপায় নাই। পথের উপরে একটা বিরাটকায় গরু শুইয়া-শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল, জহর তাহার পাশ দিয়া আসিতে আসিতে একবার দাঁড়াইল। তারপর হাতের দুই ছড়া মালা লইয়া তাহার শিংয়ে জড়াইয়া দিয়া আবার চলিতে লাগিল।

এমনি করিয়া বহু পথ অতিক্রম করিয়া গভীর রাত্রে সে কাঁসারীপাড়ার বাসার দরজায় আসিয়া হাজির হইল। অন্ধকারেও উপর দিকে চাহিয়া সে বেশ বুঝিতে পারিল আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, আজ অসময়ে একবার বৃষ্টি নামিবে। তাহার খাওয়া হইল না বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা পড়িলে অতি আরামেই তাহার সুখনিদ্রা হইবে। শ্রীমতীর জ্বালায় গতরাত্রে তাহার তেমন ভাল ঘুম হয় নাই।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। দরজায় উঠিয়া তাহার মনে পড়িল, ঘরের তালার চাবি শ্রীমতীর কাছে। দরজা খুলিবার অন্য কোনও উপায় নাই। মুখের ভিতর হইতে তাহার কে যেন হাসিয়া

উঠিল। এ-হাসির সহিত কাহারও হাসি মিলে না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া পথে নামিয়া সে আবার একদিকে চলিতে লাগিল। পা দুইটা এবার তাহার ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে।

আকাশের আয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছিল, এবার গুরু-গুরু মেঘগর্জন শুরু হইল। দুর্যোগ এবং দুর্দিনে জহরের দুইটি বস্তুর অভাব ঘটে, সঙ্গী এবং আশ্রয়। যেখানে সে দুঃখ পায় সেখানে সে একা। অথচ আজিকার রাত্রে বর্ষণের কোন হেতু ছিল না —গ্রীষ্মকালের উত্তাপও নাই; বর্ষা-বাদলের সময়ও নয়। বৃষ্টি যখন সত্যই তাহার মাথার উপর সপ্‌-সপ্‌ করিয়া পড়িতে লাগিল, মনে হইল আকাশের এই বিশ্বাসঘাতকতা শুধু তাহারই জন্য। সে শপথ করিয়া বলিতে পারে, দিকে-দিকে আজিকার রাত্রি জ্যোৎস্না-ময়ী, দক্ষিণ বাতাসের অনির্বচনীয় মাধুর্যের মধ্যে সংসারের শ্রান্ত ক্লান্ত নরনারী গা এলাইয়া দিয়া নৈশ বিলাস করিতেছে, ফুলদল দিয়া তাহাদের হইয়াছে ফুলশয্যা, আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমালা সভা করিয়া তাহাদের অভিনন্দিত করিতেছে, বিরহ-মিলনের করুণ ও মধুর রসলোক সৃজন করিয়া শিয়রে প্রদীপ জ্বালিয়া সুখরজনীর কোলে সবাই শায়িত। কোথাও দেখা যাইবে ঐশ্বর্যের আনন্দ, সৌভাগ্যের অপরিমেয় সমারোহ, যশ ও খ্যাতির প্রাচুর্য, দানে দয়ায় দাক্ষিণ্যে আজিকার রাত্রি হয় ত কাহারও কাছে চিরস্মরণীয় বোধ হইতেছে। কোথাও দেখা যাইবে ফেনিল মত্ততা, বিষাক্ত আনন্দ, প্রগল্‌ভ রসের ইঙ্গিত, ভ্রূ-বিলাসের গোপন ইশারা, প্রসাধন চাতুর্যের উন্মত্ত আকর্ষণ, অসংযত ও অন্ধ উল্লাসের বিক্ষুব্ধ বিশৃঙ্খলা।

কিন্তু আর একটা দিক? যেখানে নির্জন নদীতীরের নিভৃত অন্ধকারে একাকী পক্ষী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, এ বসন্ত-ঋতু কি তাহার জন্য নয়? যাহারা পীড়ন সহিল কিন্তু অভিমান করিল না, যাহাদের জীবনের সকল সম্ভাবনা পদদলিত

হইয়া গেল, শত চেষ্টা করিয়াও এ-সংসারের সুকঠিন বিরুদ্ধতার মধ্যে যাহারা মাথা তুলিতে পারিল না, এ বসন্ত-ঋতু কি তাদের জন্য নয়? মানুষের হিতসাধন করিতে আসিয়া মানুষের দেওয়া অপমানে যাহাদের মাথা হেঁট হইয়া গেল, ভালবাসিতে গিয়া যাহাদের সমগ্র জীবন কলঙ্কিত হইল, নির্বিচার লাঞ্ছনা ছাড়া এ পৃথিবীর নিকট যাহাদের আর কোনো পাওনা নাই—এ বসন্ত-ঋতু কি তাহাদের জন্য নয়? আজিকার এই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বসন্ত-রাত্রে তাহারা কোথায়, যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, যাহাদের ঘরে আলো জ্বলে না, যাহাদের ক্ষুধার অন্ন নাই, ভাষার অভাবে যাহারা আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে না, যাহারা শ্রমিক, রেলের কুলী, জাহাজের খালাসী, সমুদ্রের তীরে মাছ ধরিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করে, ঐশ্বর্যশালীর পদলেহন না করিলে যাহারা লাঞ্ছিত হয়—তাহারা কোথায়? দিনযাপনের দুর্বিষহ যাতনা যাহাদের, যাহাদের মাথায় লজ্জার বোঝা, পরিবারের গ্লানি, জীবনকে লইয়া যাহাদের গণিকা-বৃত্তি, যাহাদের স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন, আশা সুদূরলুপ্ত, ভগ্ন-স্বাস্থ্য স্পন্দহীন-প্রাণ—তাহারা কোথায়? যাহারা বঞ্চিত, প্রতারিত, অবৈধ দেহ-লালসায় যাহাদের জন্ম, যাহারা ঘৃণ্য পরিত্যক্ত, উপেক্ষা ও অনাদর যাহাদের পাথেয়, বাঁচিয়া থাকাই যাহাদের কঠিনতম শাস্তি—আজিকার এই রাত্রে সে হতভাগারা কোথায়? এই বৃষ্টি, এই দুর্যোগ, আকাশের এই গুরুগর্জন, এই প্রলয়ান্ধকার—এ যে শুধু তাহাদেরই জন্য।

জলে ভিজিতে ভিজিতে একটা বাগানের গেট-এর কাছে আসিয়া জহর দাঁড়াইল, দেখিল লোহার শিকল জড়াইয়া তালাচাবি বন্ধ। এ-দিক ও-দিক একবার তাকাইয়া রেলিং টপ্‌কাইয়া সে ভিতরে ঢুকিল। কিয়দ্দূর গিয়া একটা শেড-এর নিচে একখানা বেঞ্চের উপর সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। জামা, কাপড় জলে ভিজিয়া তখন সপ্‌-সপ্‌ করিতেছিল।

শুইয়া পড়িল, কিন্তু আজ রাত্রে তাহার ঘুম হইবে না। তা না হোক্, বহুরাত্রি এমনি করিয়া তাহার জাগরণে কাটিয়া যায়, সে জন্য তাহার কষ্ট কিছু নাই। অন্ধকার আকাশের দিকে সে মুখ ফিরাইয়া ভাবিল, ঘুমাইবে না, একি তাহার অভিমান? অভিমান কাহার উপর? দুইটি উজ্জ্বল দৃষ্টি বাহিরের দিকে নিবদ্ধ করিয়া মনে মনে জহর বলিল, অভিমান তাহার কাহারো উপর নাই। এই দরিদ্র পৃথিবী, তাহার চেয়ে দরিদ্র মানুষ, এখানে সে অভিমান করিবে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? মানুষে তাহাকে কী দিতে পারে? কতটুকু তাহাদের সাধ্য? সে ত আরামের লোভ করে না, আনন্দ পাইবার আশা ত তাহার নাই, তবে কেন সে দুঃখকে লইয়া আজ বিলাস করিবে?

কিন্তু সাধারণের মনের সহিত জহরের মন মিলে না। একটু আগে যে-অসংলগ্ন কথাগুলা তাহার মাথার মধ্যে জট পাকাইতেছিল, তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তাহার বিবাগী মন আবার কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিল।

মনে হইল, দুঃখ পাইবার মতো করিয়া বিধাতা শ্রীমতীকে সৃষ্টি করেন নাই। যে-আশা ও ইচ্ছা লইয়া সে সংসার ত্যাগ করিয়া পথে নামিয়া আসিয়াছে, সে তাহার উপযুক্ত নয়। ভিতরের বিদ্রোহ ও তিক্ততা তাহাকে দিকে-দিকে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইবে, অথচ তাহার সার্থকতা কোথায়? যে-আদর্শ ও স্বপ্ন লইয়া পুরুষ যুগে-যুগে ঘরছাড়া হইয়া গিয়াছে, নারীর বিদ্রোহী মন সেগুলিকে আশ্রয় করিলে এই গ্লানিপঙ্কিল পৃথিবীর ধূলা ও রৌদ্রের আঁচ তাহাকে শুধু বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্তই করিবে, আর কিছু নয়। শ্রীমতীর মধ্যে বিদ্রোহ আছে, প্রেরণা আছে, কিন্তু সংগ্রাম নাই। উৎসাহ আছে কিন্তু শক্তি নাই।

কিন্তু যাক্ শ্রীমতী। শ্রীমতী তাহার কাছে শেষ হইয়া গিয়াছে। এমন বন্ধন কোথাও সৃষ্টি করে নাই যাহাতে শ্রীমতীর

সহিত তাহার বার-বার দেখা হইতে পারে। আজ মাঠের মাঝখানে বসিয়া এই সেদিনকার শ্রীমতীর জন্য যে ব্যর্থপ্রেমের বিলাপ করিতে পাইতেছে না, ইহা বিধাতার অসীম অনুগ্রহ বলিতে হইবে। সামান্য কয়েকদিনের জন্য তাহার জীবনের রঙ্গমঞ্চের উপর আসিয়া খেলা করিয়া শ্রীমতী ছায়াচিত্রের মতো আবার সরিয়া গেল। শ্রীমতী তাহার কাছে মাত্র ক্ষণিকা, ক্ষণপ্রভা। অথচ, এমন একদিন ছিল যে দিন শ্রীমতীর জন্য বিলাপ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইত। সে দিন তাহার চক্ষে ছিল জীবনের অনন্ত আশা, অপরিমিত পরমায়ুর ক্ষুধা, উজ্জ্বল কামনা, অফুরন্ত প্রেম, জ্বলন্ত উদ্দীপনা। সে-দিনগুলি সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

রাত্রির শেষ প্রহরটিও তাহার অর্ধনিমীলিত চোখ দুইটার উপর দিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল, দেখিতে-দেখিতে ভোরের বাতাস বহিতে শুরু করিল, বাগানের গাছগুলিতে নানাকণ্ঠে পাখি ডাকিতে লাগিল, রেলিংয়ের পাশে রাস্তাটায় ঝাড়ুদারের ঝাড়ুর শব্দ শুরু হইল। জহরের বিনিদ্র চক্ষে ক্লান্তি ছিল না, পূর্বদিগন্তের ঝাপ্সা আলোয় সে একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। এই দিকটায় তাহার বাল্যকালের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওই তাহাদের পাঁচিলঘেরা ইস্কুল; তাহার পাশে খেলিবার মাঠ, মাঠের গায়ে সেই দেবেন বসুদের শিবমন্দির, শিবমন্দির ছাড়াইয়া ওই দেখা যাইতেছে সেই পুরাতন বারোয়ারীতলা—সমস্ত আছে শুধু সে নাই! উহাদের দিকে তাকাইবার অধিকারটুকু সে বিসর্জন দিয়াছে। তাহার সঙ্গীরা কে কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান নাই, কেহ বাঁচিয়া আছে, কেহ হয় ত বা নাই। শুধু যে তাহার জীবনের উপর দিয়া একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে তাহা নয়, একটা জন্ম পার হইয়া গিয়াছে। পুরাতন কাহারও সহিত পথে-ঘাটে কোথাও দেখা হইয়া গেলে এখন আর কেহ তাহাকেও চিনিতে পারিবে না। মহাকালের ফুৎকারে সে আজ নিশ্চিহ্ন হারাইয়া গিয়াছে। নিয়তির সে ক্রীড়নক।

রাঙা সূর্যের আভায় সারা আকাশ যখন ছাইয়া গেল, সে তখন ধীরে-ধীরে বাগানের খোলা গেট দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দিন দুই পরে আবার জহরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। দেখিলে মনে হইবে দুইদিনের সম্পূর্ণ ইতিহাসটা তাহার সর্বাঙ্গে বড়-বড় আঁচড় টানিয়া লেখা। সে যেন ফুরাইয়া ফতুর হইয়া গিয়াছে। কালবৈশাখীর মুখে পড়া সে যেন একখানা জাহাজ—বিশৃঙ্খল, চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত। একটা হিংস্র বন্য শ্বাপদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সে যেন এইমাত্র পলাইয়া আসিল।

কাঁসারীপাড়ার বাড়ির দরজায় উঠিয়া স্বভাবতই সে কর্তার বড-ছেলের চোখে পড়িয়া গেল। শনিবার বলিয়া লোকটা বোধ করি একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কহিল, 'আসুন, দুদিন যে আপনার দেখা নেই? কোথায় ছিলেন?' বলিয়া জহরের আপাদমস্তক সে একবার লক্ষ্য করিল।

এই অভাবনীয় এবং অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা পাইয়া জহর বিস্মিত হইল। কহিল, 'তালুকে গিয়েছিলাম নতুন প্রজা বসাতে, পথে ভারি কষ্ট গেছে। আচ্ছা, আমাদের ঝগড়াটা কি এর আগে মিট্-মাট্ হয়ে গিয়েছিল?'

লোকটা হাসিয়া কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের আর কোনো নালিশ নেই, ঝগড়া রেখে কি লাভ বলুন না? আপনার স্ত্রী এসে সব মিট্‌মাট্ ক'রে গেছেন। তিনি বাস্তবিকই ভাল লোক।'

একটু থতমত খাইয়া জহর বলিল, 'হ্যাঁ, তাঁকে এক আত্মীয়ের বাড়ি রেখে বিশেষ দরকারে আমি—কখন এসেছিলেন?'

'কাল সকালে। আপনার জন্যে ঘরের চাবি আর একখানা চিঠি—দাঁড়ান সেগুলো এনে দিচ্ছি।'

'আর কিছু বলে গেছেন?'

'আজ্ঞে না। এসেছিলেন মোটরে, বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিল কিনা তাঁর।'

চাবি লইয়া ঘর খুলিয়া জহর চিঠি পড়িল—খামে মোড়া চিঠি—

'প্রিয়, তোমার দেখা পেলাম না, সম্ভবত ব্যস্ত আছো। চাবিটা আমার কাছে থেকে গিয়েছিল, ক্ষমা করো। বিশেষ বিপদের সংবাদ পেয়ে আজই আমি বিমলের ওখান থেকে চলে যাচ্ছি। তুমি চিঠি পেয়েই নিচের ঠিকানায় চলে আসবে, অন্যথা না হয়।—শ্রীমতী'

অন্যথা হইল না, একটুমাত্র বিশ্রাম না করিয়াই ঘরে পুনরায় তালাবন্ধ করিয়া জহর ঠিকানা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পুরা একদিন যখন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তখন কাছে পয়সা থাকিলে সে অন্তত এক পেয়ালা চা খাইয়াও লইতে পারিত। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি করিয়া এখন আর যাইবারও বা এত কি প্রয়োজন? শ্রীমতীর বিপদ-আপদ নিশ্চয় কাটিয়া গিয়াছে, বিপদ কখনও সাহায্যের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে না। দুর্ভাগ্য আসে যুদ্ধ করিতে, বিপদ আসে লুণ্ঠন করিতে। অসতর্ক মুহূর্তে ডাকাতের মতো মানুষকে গুপ্তহত্যা করিয়া উধাও হইয়া যায়; শ্রীমতীর কাছে একেবারে না গেলেও আর বোধ হয় ক্ষতি ছিল না।

কিন্তু যাইবে না ভাবিয়াও সে খুঁজিতে-খুঁজিতে সারকুলার রোডের উপর একটা বড় বাগান-বাড়ির ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিকানাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বাড়ি ভুল করে নাই। তখন বেলা ছয়টা বাজে, পশ্চিমের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অতি সন্তর্পণে গেট পার হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে দারোয়ানকে দিয়া খবর পাঠাইল। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া সে উদাসীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বুলাইতে লাগিল। ফটক-ওয়ালা বাড়িতে প্রবেশ করিতে সে পছন্দ করে না। বাল্যকাল হইতে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের প্রতি তাহার একটি ভয়মিশ্রিত স্বাভাবিক

বিতৃষ্ণা ছিল, সে-বিতৃষ্ণা এখন ঔদাসীন্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই অবসরে সে একবার এই প্রাসাদখানির ঐশ্বর্যের পরিমাণটা দেখিয়া লইল। হ্যাঁ, বড়লোক বটে। ধনী ব্যক্তির ঐশ্বর্যই সে এতকাল দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখানে আসিয়া একটি দুর্লভ বস্তু প্রথমেই তাহার নজরে পড়িল, ইহাদের সুসঙ্গত এবং সুকুমার রুচিজ্ঞান। চারিদিকে তাকাইয়া জহর মনে-মনে প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

পর্দা তুলিয়া শ্রীমতী বাহিরে আসিল এবং আসিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, 'কাল যে এলে না?'

যেন একটি দীর্ঘ যুগ পরে চির-আরাধ্যা দেবীর দুর্লভ দর্শন লাভ ঘটিল। আবেগে অভিভূত হইয়া জহর বলিল, 'এইমাত্র গিয়েই তোমার চিঠি পেলাম। বিপদ-আপদ কেটে গেছে ত?'

'হ্যাঁ, ভেতরে এসো।'

শ্রীমতী যেন নূতন মানুষ বনিয়া গিয়াছে। গম্ভীর ও সংযতবাক্।

কোথা হইতে যেন একটা ভয়ানক বাধা আসিয়া জহরের দুই পায়ে জড়ো হইল। সে কহিল, 'যাবো, কেউ নেই ভেতরে?'

'কথা কাটাকাটি ক'রো না।' বলিয়া সে আগে-আগে চলিল।

দোতলায় বড় একটা হল ঘরে ঢুকিয়া জহর নিজেই একটা গদি আঁটা চেয়ার আশ্রয় করিয়া বসিল। বলিল, 'কি বিপদ তোমার গেল বলবে?'

শ্রীমতী কোনও ভূমিকা না করিয়া কহিল, 'কাল বাবা মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন? কাল? তোমার বাবা জীবিত ছিলেন না কি?'

শ্রীমতী তাহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল, তারপর কহিল, 'কাল, এর একটু আগে। মা গিয়েছেন ছোটবেলা জানতে

পারি নি, কাল জানলাম। বাবার সঙ্গে কাল মায়েরো মৃত্যু হয়েছে।' বলিয়া শ্রীমতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার কণ্ঠস্বরের সুদূর কারুণ্যে অকস্মাৎ এ-বাড়িটির সমস্ত চেহারাটা যেন একটি মুহূর্তেই জহরের চোখে বদ্‌লাইয়া গেল। শুধু এ বাড়িটাই নয়, মনে হইল এই নারীটির মতো একাকী অসহায় এবং ভাগ্যহত সংসারে বুঝি আর নাই। সে কহিল, 'মা-বাপ ত চিরদিন থাকে না শ্রীমতী! এ সংসারে নিত্যদিন—'

শ্রীমতী তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, 'কাল থেকে যে পরিমাণ সান্ত্বনা সহানুভূতির উচ্ছ্বাস শুনলাম, তাতে একখানা মহাকাব্য তৈরি হয়ে যায়। তুমি অন্তত আর সান্ত্বনার কথা ব'লো না।'

জহর একটু আহত হইয়া নীরবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ সজাগ হইয়া কহিল, 'আচ্ছা এ বাড়িতে কি মানুষ নেই?'

শ্রীমতী কহিল, 'না, বাবাই ছিলেন একা। চিরদিনই একা। মায়ের মৃত্যুর পর আর তিনি মানুষের জটলা সইতে পারতেন না। দুই বোন ছিলাম তাঁর দুই চক্ষু, পুত্র সন্তান ছিল না। আমরা বড় হলাম, বিয়ে হ'লো, কিন্তু বড় জামাইয়ের অমানুষিক জীবনযাত্রা দেখে তাঁর বুক ভেঙে গেল, আমাকে পর্যন্ত আর তিনি সইতে পারতেন না, আমারো ছিল প্রচণ্ড অভিমান। তিন বছর পরে কাল সে অভিমান আমার ভাঙলো।'

জহর কহিল, 'তুমি ত পিতৃ-পরিচয় কিছুই আমাকে আগে দাও নি? আজ আমি অবাক্ হচ্ছি যে—'

শ্রীমতী কহিল, 'পিতৃ-পরিচয় দেবার মতো বলেই তোমার কাছে চেপে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া সকলের চেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে আত্ম-পরিচয়, এই আমার ধারণা। যাক্, যেদিন আমি স্বামীকে ছেড়ে চলে গেলাম, সেইদিনই বাবার কানে খবর এসে পৌঁছলো

এবং আজ আমার এই আনন্দ যে, তিনি আমাকে খোঁজাখুঁজি করবার জন্যে লোকজন মোতায়েন করেন নি। তিনি জানতেন আমার কোন বিপদ নেই, তীরে একদিন আমার জাহাজ ভিড়বেই।'

'মৃত্যুর আগে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো, কতক্ষণ আগে?'

'দেখা হ'লো কিন্তু কথা হ'লো না। মস্তিকে তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছিল, দুদিন জ্ঞান হয় নি, জ্ঞান আর হ'লোও না। কিন্তু সেই মৃত্যুর কাছে বসে যে সংবাদ শুনলাম তাতে আমি একেবারে পাথর হয়ে গেলাম।' বলিয়া সে হলের বারান্দার বাহিরে সূর্যাস্ত-কালের আরক্তিম আকাশের দিকে তাহার ভারাক্রান্ত কমল চক্ষু দুইটিকে একবার প্রসারিত করিয়া দিল, তারপর পুনরায় কহিল, 'অত্যন্ত স্থূল স্পষ্ট সংবাদটা আমার কানে এল, তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে তিনি উইল ক'রে গেছেন।'

জহর কহিল, 'সে ত তাঁর করবারই কথা। রমা অর্ধেক পাবেন ত?'

'করবার কথা তাঁর একেবারেই নয়, রমাকেও তিনি একটি কপর্দক দেন নি, কারণ তার স্বামীর আছে অজস্র অপরিমিত; অত বড় জমিদারী নদীয়া জেলায় তার মতো আর কারো নেই, কিন্তু সে কথা ত নয়—বাবার চিরদিনই আশা এই সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে তিনি জনসাধারণের কল্যাণে নামবেন—ইস্কুল হবে, হাসপাতাল হবে, দরিদ্রের সেবার সুবিধা থাকবে, মেয়েদের অর্থকরী বিদ্যা শেখানো চলবে—'

'এ-ইচ্ছা তাঁর গেল কেন?'

'যাবার কারণটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগচে। আমার নামে সমস্ত লিখে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে যে-চিঠি তিনি আমাকে লিখে রেখে গেছেন, সেখানা আজ সকালে রমা চলে যাবার পর তাঁর বাক্স থেকে পেলাম। সে-চিঠির বক্তব্য শুনলে সমস্ত সমাজ সচকিত হয়ে উঠবে।'

জহর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। সে কহিল, 'শুধু তোমাকেই বলি, মেয়ে যে তাঁর চরিত্রহীন স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চলে গেছে এতে অপার আনন্দ, এই আনন্দই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল আমার নামে যথাসর্বস্ব লিখে দেবার। তিনি বলে গেছেন, আমাকে শিক্ষা দেওয়া তাঁর ব্যর্থ হয় নি। বাবা ছিলেন গতির উপাসক, প্রগতির পূজারী। তাঁর কতকগুলো ধারণা ছিল শুনলে তোমরা হাসবে। তিনি বলতেন, যারা সত্যিকার শিক্ষিত মেয়ে, বাঙালীর ছেলেকে যেন তারা বিবাহ না করে। যারা শিক্ষিত ছেলে তারা যেন বাঙালীর মেয়েকে ঘরে না আনে। তিনি অধার্মিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সকল ধর্মত্যাগী তাঁর সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, একদিন তাঁব সমস্ত সম্পত্তি জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হবে।'

জহর বলিল, 'কিন্তু সে ত আর হ'লো না।'

শ্রীমতী একটু ম্লান হাসি হাসিল। বলিল, 'সে জন্যে মৃত্যুর সময় তিনি দুঃখ ক'রে যান নি। সমস্ত ভারই তিনি আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে গেছেন। চিঠিতে বলেছেন, আমি যে-পন্থায় চলবো, তার উপরেই থাকবে তাঁর অকৃপণ আশীর্বাদ। তিনি কোথাও আমাকে উপদেশ দিয়ে যান নি। পরলোকের পথে দাঁড়িয়ে আমার বিচার এবং বিবেচনা তিনি হাসিমুখে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেবেন।' বলিতে-বলিতে তাহাব দুইটি চক্ষের অশ্রুর রেখা ঘন হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সে সুইচ্ টিপিয়া পাখাটা খুলিয়া দিয়া আসিল।

জহর বলিল, 'তোমার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের কথা বললে না ত?'

শ্রীমতী খানিকক্ষণ কি-যেন চিন্তা করিল, তারপর কহিল, 'কেউ নেই, থাকলে তবু কিছু আশা করতে পারতাম। তাই ত ভাবছি, এর ভার বইবো কেমন ক'রে। এদের মাঝখানে আজ আমি বন্দী হলাম।'

'আচ্ছা ধর, এমন যদি হয় তোমার স্বামী অনুতপ্ত হয়ে, তোমার কাছে এসে মার্জনা চাইলেন—সংসারে এমন ত নিত্যই ঘটে—'

শ্রীমতী কহিল, 'তোমার কথার আওয়াজে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করছ, সে চেষ্টা ক'রো না। সে লোকটাকে তোমার চেয়ে আমি চিনি। আমি তোমাকে স্পষ্ট কথা হয় ত বলতে পারবো না, কিন্তু নিজের কাছে আমি অত্যন্ত স্পষ্ট।' বলিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পুনরায় কহিল, 'বলি খাওয়া-দাওয়া হয়েছে না তিন দিন থেকে হরিমটরই চলচে? কি চেহারাই হয়েছে তোমার?'

জহর নিরুত্তরে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল, এ মেয়ে যতই স্পষ্ট হউক, তার পক্ষে চেনা অত্যন্ত কঠিন। সে আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

একবার ভিতরে গিয়া মিনিট তিনেক পরে শ্রীমতী আবার ফিরিয়া আসিল। হলের মধ্যে ইতিমধ্যে একটু-একটু করিয়া অন্ধকার ঘন হইতেছিল, প্রথমেই সে ঘষা কাঁচের ডুম পরানো বড় আলোটা জ্বালিয়া দিল, তাহার উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন আলোটা ঘরের ছাদে প্রতিফলিত হইয়া সুস্নিগ্ধ দীপ্তিতে নিচে আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই অল্পক্ষণের জন্য যে নীরবতাটুকু এখানে বিরাজ করিতেছিল তাহা অকস্মাৎ বিদীর্ণ করিয়া দিয়া সে মুখের একটা শব্দ করিল, তারপর ঠোঁট উল্টাইয়া জহরের কথার বিদ্রূপাত্মক নকল করিয়া কহিল, 'স্বামী অনুতপ্ত হয়ে এসে ক্ষমা চাইবেন!' উত্তেজিত হইয়া সে পুনরায় কহিল, 'তুমি জানো তার চরিত্রের মধ্যে কোথাও এক-বিন্দু ঐশ্বর্য নেই? অসৎকর্ম করাই তার জন্মগত প্রবৃত্তি। মনের ভেতরটা তার অন্ধকূপ—বিষাক্ত পোকামাকড়ের বাসা। সে করে নি এমন পাপ নেই, ভাবে নি এমন কুচিন্তা নেই, তার সান্নিধ্যে এলে তার সমস্ত চরিত্রটা থেকে একটা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ বেরোয়। যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সর্বনাশ করাই তার রীতি, অন্যের কলঙ্ক প্রচার

করাই তার পেশা, মেয়েদের অপমান করাই তার ধর্ম। অথচ সে দুর্দান্ত নয়, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তার বলিষ্ঠতা বা দৃঢ়তা নেই, সে অত্যন্ত কাপুরুষ। হ্যাঁ, কাপুরুষ, হীনচেতা, কুৎসিত। আমি সকলের চেয়ে আশ্চর্য হতাম তখন যখন দেখতাম এক পেট মদ খেয়েও সে মাতাল হ'তো না। নেশা করলেই যেন তার ভিতরের চিত্রটা বাইরে ফুটে উঠতো; মনে হ'তো, লিকলিকে কতকগুলো বিষধর সাপ তার সর্বাঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসচে, চোখে তার ক্রুর দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল। মানুষকে মুখোমুখি খুন করবার সাহস তার হয় নি, কিন্তু বহুবার সে গুপ্তহত্যার সাহায্য করেছে।'

জহর বলিল, 'কিন্তু তাকেই ত তুমি বিয়ে করেছিলে?'

শ্রীমতী অকপটে কহিল, 'শুধু বিয়ে নয়, বিয়ের আগে তাকে ভালবেসেছিলাম। তোমাদের ভাষায় যাকে বলে প্রেম!'

'ভালবেসেছিলে? অথচ—'

'হ্যাঁ, ভালবেসেছিলাম। বাবা তাকে অপছন্দ করতেন, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে দেখে বিরক্ত হতেন, আভাষ-ইঙ্গিতে বারণ করতেন, তবু তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। এমন কিছু রূপবান্ সে নয়, কিন্তু কোথায় যেন তার একটা মোহ, চুম্বক-শক্তি, আকর্ষণ। বড়-বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে যখন হেসে আলাপ করতো, আমি সংসার ভুলে যেতাম। তার চোখে, কথায়, ইশারায় অদ্ভুত একটা মোহ। একবার কেউ তার সঙ্গে আলাপ করলে আর একবার তাকে ফিরে আসতেই হবে। এই সর্বনাশা আকর্ষণে অন্ধ হয়ে আমি একটু একটু ক'রে এগিয়ে গিয়েছিলাম।'

'একটুও সজাগ হও নি?'

'বরাবরই সজাগ ছিলাম, আমার মোহও ছিল সজাগ। কিন্তু তার আলাপে এমন একটা ক্ষণস্থায়ী আন্তরিকতা থাকতো যে, আমি কোনো দিনই এড়াতে পারি নি। তাকে এড়ানো বড় কঠিন্।'

জহর চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী পুনরায় কহিল, 'একদিন

সে হঠাৎ বললে, আমাকে সে বিয়ে করবে। পাত্র হিসেবে সে মন্দ কি? যথেষ্ট অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, চেহারার দিক থেকেও নিতান্ত খেলো না। বাবার অসম্মতি লক্ষ্য করে, সে আমাকে অনুরোধ করলো, আমি যেন সব ব্যবস্থা করি। তাই-ই করলাম, বিয়ে হয়ে গেলো। মাথায় সিঁদুর পরে স্বামীর ঘর করতে গেলাম। কিন্তু একটি সপ্তাহ পার হ'লো না। সে মনে করলে, আমি তার করতলগত, সে হ'লো স্বেচ্ছাচারী। আমার ঘুম ভাঙলো, চেয়ে দেখি, এ কোথায়? কার হাতে পড়লাম? এ যে জন্ম-চরিত্রহীন। এ শুধু মাতাল নয়, শুধু উচ্ছৃঙ্খল লম্পট নয়, এর রুচি প্রবৃত্তি জীবনযাত্রা সমস্তই যেমন কুৎসিত তেমনি জঘন্য। আশ্চর্য, সেদিন আমার ধারণা হ'লো পুরুষের ঘরে না ঢুকলে পুরুষমানুষকে চেনা যায় না। সেদিন থেকে দীর্ঘ তিন বছর ধরে লোকটা আমার ঘৃণাই পেয়ে এল।'

জহর বলিল, 'কিন্তু এর মধ্যে আর-একটা কথা থেকে যায় শ্রীমতী।'

'তা জানি।' শ্রীমতী একটুখানি উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'বাইরের লোক চট্ করে সে কথাটা বিশ্বাস করবে না, এই বল্‌তে চাও ত? সে আমি জানি। যাই হোক, সে-গল্প আজ তোমার না শুনলেও চল্‌বে। এসো ও ঘরে যাই।' বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। বাহিরে তখন রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে।

দুই-তিনটা দালান এবং ঘর পার হইয়া তাহারা আর-একটা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এটা বোধ করি খাবার ঘর। মাঝখানে অয়েলক্লথ মোড়া বড় একখানা বেঞ্চ পাতা। নিচে মেঝের উপর পাশাপাশি দুইখানি আসন। একখানি আসনের সম্মুখে শ্বেত-পাথরের থালায় নানাজাতীয় ফলমূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজানো। জহরকে সেইখানে খাইতে বসাইয়া শ্রীমতী দরজার বাহিরে একবার তাকাইয়া ডাকিল, 'লখিয়া?'

ডাক শুনিয়াই একটি যুবতী মেয়ে ধীরে-ধীরে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি সুশ্রী, হিন্দুস্থানী ধরনের কাপড় পরা, হাতে দুগাছি সোনার বালা, ছোট কপালখানি জুড়িয়া তাহার বড় একটা উল্কি আঁকা। নতমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীমতী কহিল, 'আমার ত এসব কিছু খেতে নেই, অশৌচ—একটুখানি সরবৎ শুধু দে; আর এর জন্যে এক পেয়ালা চা।'

লখিয়া ঘাড় নাড়িয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল।

'কী, তোমার যে আর মাথা তোলবার সময় নেই, মাথা হেঁট করে খেয়ে চলেছ! বলি, মন ছুটলো কোন্‌দিকে?'

জহর কহিল, 'ওই তোমার দোষ শ্রীমতী, এমন বেয়াড়া প্রশ্ন করো যে আমি দমে যাই। এত বড় বিপদ গেল, তোমার একটু পরিবর্তন হলো না!'

'তাই নাকি? তোমার যে মাসির দরদ! মেয়েদের পরিবর্তন বাইরে যে হয় না, হয় ভেতরে। এটুকু বুঝি জেনে রাখো নি? দু-পাঁচদিন কান্নাকাটি ক'রে যারা শোক সামলে উঠে বসে, তাদের দলে আমি নাম লেখাই নে। চোখের কান্নাটাই তোমাদের চোখে বড়, তাই মৃত্যুর আসল চেহারাটা তোমরা বোঝ না! বাবার মৃত্যু কাল হয়েছে বটে, কিন্তু আমার চোখে সে মৃত্যু প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের, যতদিন বাঁচবো সে মৃত্যু আমার পাশে পাশে থাকবে, সে অভাব তোমরা বুঝবে না। আমার হাসিতে কান্নায় দুঃখে আনন্দে, এমন কি আমার ঠাট্টা-বিদ্রূপে পর্যন্ত সে মৃত্যু মিশিয়ে থাকবে। যাক্ সে কথা, সে হয় ত তোমার বোধের বাইরে।' বলিয়া শ্রীমতী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটি মুহূর্তেই মুখের চেহারা বদলাইয়া হাসিয়া কহিল, 'একটি সুন্দরী মেয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো এবং ফরমাস শুনে চলে গেল, তার সম্বন্ধে তোমার কোনো কৌতূহল হবে না? তোমার মন ত পুরুষের মন!'

জহর বলিল, 'যদি হয়েই থাকে তবে সে অন্যায় কৌতূহল। পুরুষের মন বলে নিজের জাতকে বাঁচিয়ো না, তোমাদের কৌতূহল আরও তীব্র। আমরা সুন্দরী মেয়ে দেখলে নানা উদ্ভট কল্পনা করি, তোমরা সুন্দর পুরুষ দেখলে সে বিবাহিত কিনা জানবার চেষ্টা করো। আমাদের এটা স্বভাব, আর তোমাদের ওটা প্রকৃতি।'

একজন বুড়া চাকর একথালা খাবার লইয়া ঢুকিল এবং তাহারই পিছনে আবার আসিল সেই মেয়েটি, হাতে তাহার এক পেয়ালা গরম চা। মাথার ঘোমটা এবার সে আর-একটু টানিয়া দিয়াছে বটে কিন্তু জহর আর মুখ তুলিয়া তাকাইল না।

চা ও খাবার রাখিয়া দুইজনেই যখন বাহির হইয়া চলিয়া গেল, শ্রীমতী তখন একটু হাসিয়া বলিল, 'ওর নাম লখিয়া।'

জহর বলিল, 'তা ত শুনলাম।'

'মেয়েটি বাল্য-বিধবা।'

'তাও ত দেখলাম।'

'ভারি শান্ত মেয়ে।'

'তাই মনে হ'লো বটে।'

শ্রীমতী কহিল, 'বাবা যখন লক্ষ্ণৌতে ছিলেন, ওর মা আমার মায়ের কাছে চাকুরি করতো, ওর বাপ ছিল না। মা-ও যখন ওর মারা গেল তখনো ও বড় হয় নি। বাবা ওকে নিয়ে মানুষ করতে লাগলেন। ঠিক সময় বিয়ে দেওয়া হ'লো কিন্তু ভাগ্য মন্দ, অল্প-দিনের মধ্যেই মাথার সিঁদুর মুছে লখিয়া ফিরে এল। সেই থেকেই এখানে রয়েছে। শুনলাম বাবা ওর আর-একবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আহা, মেয়েটি ভারি চমৎকার! জাতে হিন্দুস্থানী, কিন্তু আচার-ব্যবহারে কথাবার্তায় সম্পূর্ণ বাঙালী। বাঙালী মেয়ের মতন কাপড় পরা শুরু করেছিল কিন্তু আমি মানা করেছি, ও বৈশিষ্ট্যটুকু থাকুক। রাতে ও আমার কাছে শোয়।' বলিয়া সে খাইতে বসিয়া গেল। খাওয়া শেষ করিয়া চায়ের পেয়ালাটা কাছে

লইয়া জহর বলিল, 'ওর চেয়ে বেশি আমার দুর্ভাগ্য, তার কারণ, মেয়েমানুষের ইতিহাস শুনতে-শুনতে আমার জীবনটা কাটলো।'

শ্রীমতী কহিল, 'শুধু শুনেই এসেছ, ইতিহাস রচনা করবার শক্তি হয় নি।'

'না, সে-প্রবৃত্তি আমার কোনদিনই নেই।'

'নেই? দুলালচাঁদের সেদিনকার ইঙ্গিতটা আমি এখনো ভুলি নি মনে রেখো। অবশ্য ও-দিকটা দিয়ে তোমাকে বিচার করা চলে না, তোমার আর একটা পরিচয়ও রয়েছে।'

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং রাত যে ঠিক কত তাহাও জানা গেল না। খুব সম্ভবত নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। এ-বাড়ির সীমানা চারিদিকে এতই বিস্তৃত যে, পথের কলরবও আর শুনিবার উপায় নাই। ঝি চাকর বামুন দারোয়ান এবং বাহিরের অন্যান্য লোক—তাহারা যে কোথায় একান্তে আছে তাহা এখান হইতে বুঝিবার উপায় ছিল না। বিশাল পুরী যেমনি নিঃসঙ্গ তেমনি স্তব্ধ এবং জীবনচিহ্নহীন। মানুষের অভাবে ইহার সকল দিক নিরন্তর যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বাহিরের অটল নীরবতার দিকে জহর একবার মাত্র তাকাইয়া কহিল, 'সে-পরিচয় আমার লজ্জা শ্রীমতী, সে আমার দৈন্য।'

'তা হোক, সেখানে ফাঁকি ত আর নেই। চল, এ-ঘর থেকে।'

'চল, অনেক রাত হলো।' একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জহর উঠিয়া দাঁড়াইল।

দালান পার হইয়া শুইবার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া শ্রীমতী কহিল, 'ভেতরে এসো।'

জহর ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'আজ নয়, এর পর কথা কইতে বসলে ও দিকে রাত পুইয়ে যাবে। আজ আমি যাই শ্রীমতী।'

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কোথায় যাবে এত রাতে?'

'কেন, বাসায়? কাঁসারীপাড়ায়?'

শ্রীমতী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া হাসিয়া উঠিল—'সে-বাসার বড়াই আর ক'দিন থাকবে ?'

'যদিন থাকে।'

'ভারি ছেলেমানুষী তোমার। মরিয়া হয়ে ভবঘুরে হয়ে জীবন কাটাবারো একটা ধরন আছে, তোমার তাও নেই।'

'তা নেই, তবু যেতে ত হবে।'

'যাবার জন্মে কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে শুনি ?'

রাগ করিয়া জহর কহিল, 'তবে কি এখানে শেকড় নামাবো তুমি বলতে চাও ?'

'তাই ত বলতে চাই।' বলিয়া শ্রীমতী হাসিল। দালানের উজ্জ্বল আলোয় তাহার সুন্দর দাঁতগুলি পর্যন্ত একবার ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল

'একটা লোকলজ্জাও আছে শ্রীমতী।'

শ্রীমতী আবার হাসিয়া বলিল, 'লোকলজ্জা তোমাকে যেন চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। এত রাতে আর চলাচলি করো না বাপু, আর সহ্য হয় না কই যাও দেখি কত বড় সাধ্যি তোমার ?'

'তবে যা খুশি কর, এ তোমার ভয়ানক অত্যাচার।' বলিয়া জহর তাহার পিছনে-পিছনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

খাটের উপর পরিষ্কার বিছানাটা দেখাইয়া দিয়া শ্রীমতী বলিল, 'উঠে শুয়ে পড়। আমার দুঃসময়ে কত করেছ তুমি, আমায় একটু সেবা করতে দাও ? বল, পা টিপে দেবো ?'

জহর চটিয়া উঠিয়া কহিল, 'ছি শ্রীমতী !'

শ্রীমতী মুখ টিপিয়া হাসিল, তারপর পুনরায় কহিল, 'ভয় নেই, লখিয়াকে নিয়ে আমি পাশের ঘরেই আছি। সবুজ আলোটা জ্বেলে শুয়ো, ঐ সুইচ-বোর্ড, দরকার হলে ডেকো।'

'না, দরকার আমার হবে না।'

'না হলেই ভালো। দাঁড়াও মশারিটা ফেলে দিয়ে যাই।' বলিয়া

সে মশারিটা ফেলিয়া অতি যত্নে তাহার ধারগুলি গদির নিচে গুঁজিয়া দিতে লাগিল।

জহর বলিল, 'বাড়িওয়ালা মাতাল বলে গাল দিয়েছিল, অন্যায় করে নি। এসব মাতলামি ছাড়া আর কি? ঘর দোর পড়ে রইলো, এক গাড়ি জিনিস-পত্তর, আমি রইলাম এখানে, সেখানে যদি তালা ভেঙ্গে সব চুরি হয়ে যায়?'

'কী সর্বনাশ হবে বল ত?' শ্রীমতী একেবারে শিহরিয়া উঠিল।

তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়া জহর পুনরায় কহিল, 'না, ঠাট্টা নয় শ্রীমতী, একদিন ত সে সবের দরকার হয়েছিল। মনে রেখো সে-ঘর একদিন আমাদের আশ্রয় দিয়েছে।'

শ্রীমতী কহিল, 'অতীতকালের দিকে মুখ ফেরানো আমার স্বভাব নয়। সেদিন সে-ঘর আশ্রয় দিয়েছে, আজ দিচ্ছে এই ঘর। আমার কাছে এদের দাম একই। ঐশ্বর্য কিম্বা দারিদ্র্যের মধ্যে আমার মন একই অবস্থায় থাকে। আজ যদি আমার এ আশ্রয় যায় আমি একটু অসুবিধায় পড়বো কিন্তু দুঃখিত হবো না। কিন্তু সে আমার নিজের কথা। তুমি দেখছি অত্যন্ত মায়াবদ্ধ মানুষ, তুমি এগিয়ে চলতে জানো বটে কিন্তু পেছনের টান্ তুমি ছাড়তে পারো না। কে আমাদের কী বলে গাল দিল তাও যেমন শুনবে না, আমাদের কী ছিল আর কী নেই এ নিয়েও মাথা ঘামাবে না। যাকে ছেড়ে এসেছ তাকে যেতে দাও।'

জহর বলিল, 'তোমার অনেক আছে তুমি ছাড়তে পারো, কিন্তু আমি ভাবচি সেখানে আছে আমার কুড়ি-পঁচিশ দিনের রাতের বাসা। খাই বা না খাই, রাতে ঘুমোতে পারবো।'

দক্ষিণ দিকের দুইটি জানালা খুলিয়া শ্রীমতী একবার দাঁড়াইল। প্রথম শুক্লপক্ষের চাঁদ একটু আগে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অনেকদূরে বড়রাস্তার দুই-একটা আলো দেখা যাইতেছিল। নিচের বাগানের

উপর দিয়া যে বাতাস ভাসিয়া আসিয়া তাহার মুখ চোখ স্পর্শ করিয়া ভিতরে ঢুকিতেছিল, তাহাতে মনে হইল, নূতন বসন্তকালে তাহাদের মাঠ ফুলে-ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। নানাবর্ণের ফুলের এক প্রকার সংমিশ্রিত অতি-মিষ্ট গন্ধ তাহার প্রতি নিশ্বাসে প্রবেশ করিয়া কেমন যেন বিহ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া সে ধীরে-ধীরে নিজের হাতেই দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজ অন্ধকার রাত্রে একাকী আলো জ্বালাইয়া এই ঐশ্বর্য ও বিলাসময় ঘরখানির মধ্যে বসিয়া জহরের আর একবার মনে হইল, এ পৃথিবী সত্যই অত্যন্ত কৌতুকময়। গত পরশু এক কর্দমাক্ত মাঠের ধারে শুইয়া এ পাশ ও পাশ করিয়া তাহার রাত্রি কাটিয়াছে, কাল সমস্ত দিন ধরিয়া কয়েকজন ছোক্‌রার নিকটে স্বাস্থ্য ও সংযম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছে, রাত্রি যাপন করিয়াছে গঙ্গার ধারে একটা পানের দোকানে, বুড়ী পানওয়ালীকে মা মা বলিয়া এবং অশ্রু-বিগলিত ভক্তিতে তাহার পদসেবা করিয়া এবং প্রসাদ পাইয়া। আর আজ? দুগ্ধফেননিভ শয্যা, রসনাতৃপ্তিকর প্রচুর আহার, অনাবিল আরাম, প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং সর্বশেষ এইমাত্র একটি পরমা-সুন্দরী নারী তাহার উপর অভিমান করিয়া মরালগ্রীবা বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। চমৎকার! এ পৃথিবী এখনও অত্যন্ত হাস্যরসাত্মক এবং কৌতুকময়। বাঃ—সুন্দর, অপরূপ!

ঘুম ভাঙ্গিতেই সে দেখিল সকালের রৌদ্রে তাহার ঘর ভরিয়া গিয়াছে। প্রথমেই তাহার মনে হইল সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ঘণ্টা দুই আগে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, মাথাটা তখনও অনিদ্রায় ভারী হইয়া আছে। সবুজ আলোটা তখনও জ্বলিতেছিল, মশারির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আগে সে আলোটা নিভাইয়া দিল। ঘরের একদিকে প্রকাণ্ড একখানা আয়নার ভিতরে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। গত তিনদিন হইতে নিজের এই বিসদৃশ বাউল-পরিচ্ছদের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। সেদিনকার নূতন কাপড়-জামাগুলি শুধু অপরিষ্কারই হয় নাই, কোথায় কেমন করিয়া যে এগুলি ছিঁড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছে তাহাও সে অনেক চেষ্টা করিয়া মনে করিতে পারিল না। ঘরের চারিদিকের বহুমূল্য আসবাবগুলির সঙ্গে তাহার এই পরিচ্ছদ এমনিই বেমানান হইয়া উঠিল যে, সে জানালা দিয়া মাঠে লাফাইয়া পড়িয়া পাঁচিল টপকাইয়া পালাইবার কৌশল খুঁজিতে লাগিল। সমস্ত ঘরখানা যেন তাহার দিকে তাকাইয়া বিদ্রূপ করিতেছে।

প্রথমেই তাহার রাগ হইল শ্রীমতীর উপর। এমন দুর্দমনীয় মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। সম্ভবত বাল্যকালে পিতামাতার আদর পাইয়াছে, শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু শাসন পায় নাই। কাল রাত্রির অন্ধকারে চলিয়া গেলে আজ এমন ভাবে তাহাকে লজ্জায় পড়িতে হইত না। জহর ক্রুদ্ধ হইয়া একখানা চেয়ারে আসিয়া বসিল। এত বেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল কিন্তু পাশের ঘরে রাজ-রাণী বোধ করি এখনও নিদ্রিত, দাস-দাসীরা পদসেবা না করিলে বোধ করি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবে না! বাস্তবিক, এই ধনী লোক-

গুলির উপর সে কোন দিন খুশি হইতে পারিল না। ইহারা অনিয়ম বিশৃঙ্খলা এবং স্বেচ্ছাচার লইয়াই শুধু ঘর করে না, ইহাদের চরিত্রের কোন সঙ্গতি নাই, জীবনে ইহারা বৈচিত্র্যহীন, দরিদ্রকে শোষণ করা ইহাদের নীতি, মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা ইহাদের ধর্ম—ইহাদের মতো ভয়ঙ্কর জীব সংসারে আর কেহ নাই। ইহারা অচল এবং জড়, কিন্তু সচল যখন হয় তখন আরও ভয়ানক। ইহাদের লোভের খোরাক যোগাইতে শ্রমিকেরা হয় ক্রীতদাস; ইহারা আফিং খাওয়াইয়া মানুষকে নির্জীব করিয়াছে, মদ খাওয়াইয়া সর্বস্বান্ত করিয়াছে, যন্ত্র বসাইয়া মানুষকে বিকল করিয়াছে। ইহারা কোথাও বাড়িওয়ালা, কোথাও মনিব, কোথাও বড়বাবু, কোথাও বা হুজুর। সমাজের শাসনভার ইহারা লয় আপনার উদরপূর্তির জন্য, রাজ্যের শাসনভার লয় প্রজা শোষণের জন্য। ইহাদের পুঁজি আত্মশ্লাঘা, কাজ আত্মপ্রচার। কি ভাগ্য, ধনীর সংখ্যা এদেশে অল্প, তাই এখনও বাস করা চলিতেছে।

চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া সে দরজাটা খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু বাহির হইতে পারিল না, মার্বেল পাথরের দালানটা বিদ্রূপ করিয়া যেন হাসিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, সুমুখের বড় আয়নাটা সে চুরমার করিয়া ভাঙিয়া দেয়। রাগে তাহার সর্বশরীর রি-রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

পায়ের শব্দ পাইয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, লখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের ভিতরেই আর একটা দরজা খুলিয়া দিতেছে। ও-দরজাটা এতক্ষণ সে লক্ষ্যই করে নাই, এবার দেখিল সেটা বাথ্-রুম। একখানা সাবান ও তোয়ালে রাখিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় লখিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার আপনার চা এনে দেবো?'

'আনো।' বলিয়া সে সোজা বাথ্-রুমে গিয়া ঢুকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া দেখিল, একখানা টিপয়ের উপর

চায়ের সহিত প্রচুর প্রাতরাশ সাজানো, লখিয়া তাহাকে দেখিয়া একখানি চেয়ার তুলিয়া আনিয়া কাছে পাতিয়া দিল। বাস্তবিক, ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে আতিথ্য লইলে সুবিধা অনেক। জহর সানন্দে আসিয়া বসিয়া গেল। ইহারা খাইতে জানে বটে!

লখিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, এইবার কহিল, 'আপনি কি এখুনি স্নান করবেন দাদাবাবু?'

জহর মুখ ফিরাইতে পারিল না, একটু বিপন্ন হইয়াই কহিল, 'এই—একটু দেরি আছে।'

'আপনার কাপড়-চোপড় সমস্তই কল-ঘরে রেখে এসেছি।'

জিজ্ঞাসা করিতে বাধিলেও জহর এবার বলিয়া ফেলিল, 'তাঁর ঘুম কি এখনো ভাঙে নি?'

লখিয়া কহিল, 'দিদিমণির কথা বল্‌চেন? তিনি ত নেই, ভোর-বেলাতেই মোটরে করে বেরিয়ে গেছেন।'

'কখন আসবেন?'

'সে কথা বলে যান্ নি।'

জহর আবার একটু রাগিয়া গেল। কহিল, 'স্নান ক'রে আমাকেও এখনি বেরিয়ে যেতে হবে।'

মাথা দোলাইয়া লখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'সে হবে না, দিদিমণি আপনাকে যেতে মানা ক'রে গেছেন।'

জহর একটু শ্লেষের হাসি হাসিল। কহিল, 'তাই নাকি? বাঃ, তুমি ত বেশ বাংলা বলতে পারো লখিয়া? এখানে কত মাইনে পাও?'

লখিয়া কহিল, 'কিছুই না।'

'কিছুই না? সে কি, তোমার চলে কি ক'রে? ও, বুঝতে পেরেছি, এরা বুঝি ভালমানুষ পেয়ে তোমাকে শোষণ করছে?'

'আমার ত কিছুই দরকার নেই দাদাবাবু?'

'দরকার নেই? সে কি, আজ যদি তোমার চাকরি যায় তবে কি সম্বল নিয়ে দাঁড়াবে?'

লখিয়া অকপটে জবাব দিল, 'আমি ত এখানে চাকরি করি নে, আমি এ-বাড়ির মেয়ে।'

মেয়েটির সহিত আলাপ করিয়া জহর অতি আনন্দ পাইতেছিল, বলিল, 'এ ধারণা অবশ্য থাকা ভাল। তোমাকে এখানে কি করতে হয় লখিয়া?'

'বিশেষ কিছুই না, ঘুরে ঘুরেই ত বেড়াই!'

জহর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আচ্ছা লখিয়া, তুমি কি ক'রে বুঝলে তোমার দিদিমণির মানা আমি শুনবো?'

লখিয়া হাসিমুখে বলিল, 'ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আজ অবধি কেউ দিদিমণির অবাধ্য হতে পারে নি। উনি ত কখনো অন্যায় করেন না, তাই ওঁর কথা সবাই এত মানে। এত বড় মানুষের মেয়ে তবু পরের জন্যে উনি চিরদিন দুঃখ পেয়ে এসেছেন। এর জন্যে, কত লাঞ্ছনা, কত কলঙ্ক—যারা ওঁকে জানে না—' তাহার উলকি-কাটা সুশ্রী মুখখানি দেখিতে-দেখিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিতে লাগিল, 'তারাই ভুল বুঝে ওঁকে অসম্মান করে, নিন্দে রটায়।'

জহর বলিল, 'এবার তোমাকে বুঝলাম। ওঁর অধীনে তুমি আছো, তুমি ত একথা বলবেই লখিয়া?' বলিয়া শেষ চুমুক দিয়া চায়ের পেয়ালাটা সে নামাইয়া রাখিল।

লখিয়া কিন্তু এবারেও বিনীত হাসি হাসিল। বলিল, 'আমাকে দমাতেও পারবেন না, ঠকাতেও পারবেন না। আপনি যদি এর চেয়েও কড়া কথা বলেন তা হ'লেও আমার অপমান হবে না দাদাবাবু।'

জহর মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইল। আঘাত খাইয়া লখিয়ার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নির্মল হাসির রেখা তাহার মুখের উপর হইতে তখনও সরিয়া যায় নাই। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

'আমি ঝি নই, আমি দিদিমণির ছোট বোন।' বলিয়া লখিয়া

আর দাঁড়াইল না, সমস্ত আঘাতগুলি যেন হাসিয়া ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

স্থাণুর মতো জহর নীরবে সেখানে বসিয়া রহিল। শুধু যে তাহার চলিয়া যাইবার উৎসাহই চলিয়া গিয়াছে তাহা নয়, তাহার নড়িবারও শক্তি ছিল না।

জানালা হইতে রৌদ্র সরিয়া গেল, বাহিরের বাতাস গরম হইয়া উঠিল, কেবল সূর্যের তরল কিরণে বসন্তকালের সুদূর আকাশটা তাহার অপলক দৃষ্টির সম্মুখে ঝক্-মক্ করিতে লাগিল। অলস মন্থর দিন। এই দীর্ঘ দিন লইয়া সে কি করিবে? গাছের শুক্‌নো পাতা খসিয়া নূতন কিশলয় জন্মিতেছে, মুখে কুট লইয়া এক-একটা পাখি এ-দিকে ও-দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, জানালার নিচে বিস্তৃত সবুজ মাঠের গাছগুলি ফুলে-ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উদাসীন সে, তাহার কোন কাজ নাই। আজ বহুদিন পরে একটি অপরিচিত বেদনায় ভিতরটা তাহার টন্-টন্ করিয়া উঠিল। মনে হইল, তাহার প্রতিদিনের দিন-যাপনের আড়ালে ভিতরে আর-একটা তৃষ্ণার্ত মানুষ যে হা-হা করিতেছে, ইহাকে সে ভুলিয়া থাকে কেমন করিয়া? সে ত আপন প্রাপ্য বুঝিয়া পায় নাই!

অনেকক্ষণ বসিয়া-বসিয়া সে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতী এখনও আসিয়া পৌঁছিল না, সে এবার স্নান করিয়া লইবে। দরজার বাহিরে আসিতেই দালানের একপ্রান্তে কল-ঘরটা দেখিতে পাইয়া সে সেইদিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মাঝে গোটা-তিনেক বড় বড় ঘর পার হইতে হয়, শেষের ঘরটির কাছে আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। সাড়া দিয়া বলিল, 'এইটি বুঝি তোমার ঘর লখিয়া? বাঃ, বেশ সাজানো গোছানো দেখ্‌ছি, এই ঘরে থাকো? বই-টইগুলো কে পড়ে? তুমি নাকি?'

লখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, 'ওসব আমার পড়া হয়ে গেছে, ওগুলো ইস্কুলের বই।'

'ইস্কুলের? তুমি কি এখন কলেজে পড় নাকি?'

'হ্যাঁ, গেল বছর ভর্তি হয়েছি।'

'বেশ বেশ, বড় খুশি হলাম শুনে।' বলিয়া জহর সোজা কল-ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া স্নান করিয়া সে বাহির হইতেই সুমুখে দাঁড়াইয়া শ্রীমতী হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'বাঃ এ যে একেবারে রাজবেশ! লখিয়া যেতে দেয় নি ত, কেমন জব্দ?'

জহর বলিল, 'শুনলাম তুমি বারণ ক'রে গেছ?'

'আমি? আমি কেন বারণ করবো? আমি কাউকে বাধা দিই নে।'

'এ মন্দ নয়, লখিয়া দেয় তোমার দোহাই, তুমি দাও লখিয়ার দোহাই। মাঝ থেকে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ—'

ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া লখিয়াও মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

জহর কহিল, 'তোমাকে যতটা বোকা আর শান্ত মনে হয়েছিল. তুমি ত তা নও লখিয়া? ডাল-রুটির সঙ্গে ঝোল-ভাতের তফাতই এই। যাই হোক, বুঝলে শ্রীমতী, সকাল-বেলা কোন কাজ ত ছিল না, বসে-বসে তোমার বিরুদ্ধে লখিয়াকে উত্তেজিত করলাম, নিন্দা করলাম, ধনী বলে গাল দিলাম, কিন্তু লখিয়া তোমার নুন খায় বটে! মন্তর-তন্তর তুমি কিছু জানো। শেষকালে লখিয়ার উপর চটলাম, ঝি বললাম, বললাম তোমার চাকরি যাবে, এরা তোমাকে ঠকাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না, মুখের ওপর হেসে দিয়ে চলে গেল।'

শ্রীমতীর পিঠের পাশে মুখ লুকাইয়া লখিয়া হাসিতেছিল, শ্রীমতী কহিল, 'দাদাবাবুকে তোর কেমন লাগলো রে?'

লখিয়া বলিল, 'আর একবার আলাপ ক'রে বলতে পারি।'

জহর এবং শ্রীমতী উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিল। শ্রীমতী কহিল, 'এতখানি সময় পেলি, চিনলি নে?'

'কেমন ক'রে চিন্‌বো, একটা দিক যে এখনো জানা হয় নি। তোমার কথা না তুললে আমি কাউকেই চিন্‌তে পারি নে দিদিমণি।'

কথাটা হাস্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু একটিমাত্র ছত্রের ভিতর দিয়া যে-ভঙ্গীতে এই হিন্দুস্থানী মেয়েটি তাহার দিদিমণির সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিল তাহা অনির্বচনীয়। লখিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিবার জাদু জানে।

শ্রীমতী কহিল, 'মুখপুড়ি, যা দূর হ।' বলিয়া আর কোনোদিকে না তাকাইয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। লখিয়াও হাসিতে হাসিতে ঢুকিল অন্য ঘরে।

জহর ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। এটি শ্রীমতীর শয়ন-কক্ষ। আসবাবপত্রের আড়ম্বর নাই, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। একদিকে গোটা-চারেক পাথরের প্রতিমূর্তি, তাদেরই মাঝখানে ব্রোঞ্জ-এর বুদ্ধমূর্তি। জানালার ধারে একটা মেহগনির স্ট্যাণ্ড-এর উপর বড় একটা স্ফটিকাধারের মধ্যে কয়েকটি রঙ-বেরঙের মাছ জলের মধ্যে খেলা করিতেছে। পাশাপাশি সাজানো কয়েকটা আলমারির মধ্যে বই ঠাসা।

একবার চারিদিকে তাকাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় বেরিয়েছিলে?'

একখানা কৌচের উপর দেহ ভাঙিয়া শ্রীমতী কাৎ হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, 'কতকগুলো কাজ সেরে এলাম, সরকারমশাই একা পারেন না। শোনো বলি, বসো, কাঁসারীপাড়ার বাসা উঠিয়ে দিয়ে এলাম, কী হবে রেখে?'

'জিনিসপত্রগুলো?'

'এমন কিছুই ছিল না, বিলিয়ে দিতে বলে এলাম।'

জহর চিন্তিত হইয়া কহিল, 'এটা কিন্তু ভাল দেখাবে না শ্রীমতী।'

'কোনটা?'

'তুমি আমার সকল দিক বন্ধ ক'রে একটা দিক খুলে দিতে চাইছ। মনে হচ্ছে তুমি আর চাও না যে, আমি এ-বাড়ি থেকে যাই।'

শ্রীমতী কহিল, 'কেনই বা যাবে এখান থেকে? পা বাড়ালেই ত মরুভূমিতে গিয়ে পড়বে?'

জহর বলিল, 'পৃথিবীতে সকলের জন্যেই ত গাছের ছায়া আর সরোবরের জল নেই, তার জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ কী। তবু আমি জানি, এ-পৃথিবী মরুভূমি নয়, মরুভূমি যদি থাকে ত সে আমারই মনে।'

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীমতী কহিল, 'তুমি এখানে থাকতে চাও না?'

'না শ্রীমতী। এ ভুল তুমি আমাকে ক'রো না যে, তোমার সঙ্গে এই ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস ক'রে আমি সব ভুলে যাবো। এমন যদি হয় যে এইজন্যেই আমি অপেক্ষা করেছিলাম তবে সে লজ্জা থেকে আমাকে বাঁচাও শ্রীমতী। জগতে সকলের চেয়ে বড় পাপ আত্ম-প্রবঞ্চনা। কামিনী আর কাঞ্চন হলেই যে-জাতের দুঃখটা ঘোচে, সে-জাতের দুঃখ আমার নয়।'

শ্রীমতী কহিল, 'কাঞ্চনটা না হয় বুঝলাম কিন্তু কামিনীটা কি আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি, একথা বলতে আমার বাধা নেই। তোমার মধ্যে যে রসরূপ, তা আমায় নিশ্চিন্ত করবে, মুগ্ধ করবে, সে আমি চাই নে।'

'এ সব কি তুমি চাও না?'

'চাই, ভয়ানক চাই, কিন্তু এরা হচ্ছে মানুষকে অকর্মণ্য করার অস্ত্র। বুকের ভেতরটা আমার কাঙাল, উপবাসী, কিন্তু খাবার সন্ধান পেলেই তাকে ছুটতে দিই নে, অমনি রাশ টেনে ধরি। মানুষের সঙ্গে আমি মিশি অতি সন্তর্পণে, ভয়ে-ভয়ে, আল্গা হয়ে, পাছে আমার আসল রূপটা তাদের কাছে ধরা পড়ে। আমার সে-

রূপ অতিরিক্ত লোভী, ক্ষুধাতুর, দীন ও দরিদ্র। আমার চরিত্রে বিহ্বলতা নেই শ্রীমতী।'

শ্রীমতী কহিল, 'সেইজন্যই তোমার দুঃখের পরিমাণ এত। নিজেকে ভাসিয়ে দিতে গেলে যে বিস্তৃত হৃদয়ের দরকার তা তোমার নেই। মনে মনে তোমার কেবলই দ্বন্দ্ব। এ-দিকে যাবো, না ও দিকে যাবো, ভালবাসবো, কি বাসবো না; ছেড়ে দেবো, না ধরে রাখবো, সর্বস্বান্ত হবো, না সর্বগ্রাস করবো; সমস্যা নিয়েই কেবল তোমার বিপদ। বাঁচতে তোমার রুচি নেই, অথচ মরবারও নামে ভয় পাও, ভগবানকে মানো না অথচ দুর্ভাগ্য এলে আকাশের দিকে তাকাও; ভূত বিশ্বাস করো না কিন্তু অন্ধকারে গা ছম্‌-ছম্‌ করে; ভালবাসার জন্যে ছুটে বেড়াও অথচ ভালবাসার ওপরে শ্রদ্ধা নেই — সংসারে তোমার চেয়ে দরিদ্র আর কেউ নয়। তুমি খেপ্পা, বেপরোয়া, বেলয়। তুমি উচ্ছৃঙ্খল নও, ছন্নছাড়াও নও, তুমি একটি আস্ত অনৈক্য। তুমি বীরও নও, বিদ্রোহীও নও, তুমি বিধাতার বাঁকামুখের বিদ্রূপ।'

জহর মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল, এবার মুখ তুলিয়া কহিল, 'থাক, আর গাল দিয়ো না।'

শ্রীমতী কহিল, 'এ ত গাল নয়, এ তোমার সমালোচনা।'

'সমালোচনাই বটে, একেবারে আধুনিক সমালোচনা। প্রতিপাদ্য বিষয় ছেড়ে ব্যক্তিগত গালাগালিই এর লক্ষ্য।'

এমনি সময়টায় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া লখিয়া কহিল, 'দিদি-মণি, এবার খাবার দিতে বলবো?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি ভাই লখিয়া। চল, ওঠো, বেলা হয়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে নাও, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।' বলিয়া শ্রীমতী নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জহরও উঠিল।

মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হইয়া গেল। দিন-তিনেক ধরিয়া বিলাসপুরী মানুষের সমাগমে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রাদ্ধের পরে একে-একে বিদায় লইবার পর আবার চারিদিক স্তিমিত হইয়া আসিল।

কাজকর্মের কয়েকদিন জহর আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে কিন্তু মাঝখানে আসে নাই। ভিড়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ানো তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। একেবারেই সে চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু শ্রীমতী তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় নাই। জহরকে সে লখিয়ার মাস্টার নিযুক্ত করিয়াছে. লখিয়া ছাত্রীর মত ছাত্রী। শ্রীমতী তাহাকে মাহিনা দিতে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু জহর জানাইয়াছিল, বিনা বেতনে সে মাস্টারী করিবে না। পরিশ্রমের বিনিময়ে পয়সা দিবে না, একথা একমাত্র শ্রীমতীর মতো ব্যবসাদার মহাজনই বলিতে পারে। বেশ ত, পয়সা লইয়া ফাঁকি দিতে না পারি, কাজকর্ম তুমি বুঝিয়া লইয়ো। কিন্তু এ-কয়েকদিনের জন্যে আমাকে ছুটি দিতে হইবে।

শ্রীমতী তাহাকে ছুটি দিয়াছিল। ছুটি ফুরাইলে জহর আবার লখিয়াকে পড়াইতে আসিল। এমন অনুগত, ভদ্র, সুশিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী ছাত্রী পাওয়া যে-কোনো শিক্ষকের পক্ষে সৌভাগ্য। সকালে একঘণ্টা এবং রাত্রে একঘণ্টা, এই পড়ানো। এ-বাড়িতে জহরের আলাদা ঘর, আলাদা বাথ্-রুম এবং বারান্দা, শ্রীমতী নির্দেশ করিয়া দিয়াছে—একেবারে এক পৃথক ফ্ল্যাট। তাহার সমস্ত খরচ মাসিক মাহিনা হইতেই কুলাইয়া যায়, এমন কি বাসাভাড়া পর্যন্ত। সে বলিয়াছে, শ্রীমতীর কোনো অনুগ্রহ সে লইবে না।

অনুগ্রহ সে লইবে না এবং ইহাও জানাইয়া দিয়াছে, বিনা নোটিশে সে যে-কোনদিন এ চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিবে। চাকরি সে জীবনে বহুবার করিয়াছে এবং ছাড়িবার সময় বিনা নোটিশেই ছাড়িয়া দিয়াছে। অর্থের প্রয়োজন তাহাকে কোনদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

এ-বাড়িতে জহরের স্থান অনেক উঁচুতে। মাস্টারসাব্ বলিয়া তাহার পরিচয়। ফটকে ঢুকিতে এবং বাহির হইতে বন্দুকধারী গুর্খা-সিপাহীর সৈনিকের কায়দায় কুর্নিশ, দারোয়ানের সেলাম, দাসদাসীর যুক্তকর, সরকার মহাশয়ের আন্তরিক সম্মান—সমস্ত মিলিয়া তাহাকে একটি বিশেষ উচ্চাসনে বসাইয়াছে। প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যায় এক ফিরিঙ্গী ড্রাইভার মোটরে করিয়া তাহাকে মাঠে হাওয়া খাওয়াইয়া আনে, এ-গাড়িখানি শ্রীমতী বড় প্রিয়। দেখিয়া শুনিয়া এবং অখণ্ড বিলাসে গা ভাসাইয়া জহর একটি চমৎকার কৌতুক বোধ করে।

'আমার কাছে বৈষয়িক পরামর্শ চেয়ো না শ্রীমতী, ও আমি বুঝি নে। তুমি এ-বাড়িটাকে মেয়েদের হাসপাতাল না কি যেন করবার চেষ্টা করছ শুনতে পাই?' একদিন সে বলিয়া বসিল।

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, জনশ্রুতি এই রকম।'

'তা বেশ, স্ত্রীলোকের হাতে সম্পত্তি এলে একটু-আধটু স্বেচ্ছাচার হয়ই। তবু কি ধরনের হাসপাতালটা হবে শুনি?'

'শুধু ত হাসপাতাল নয়, ও-বাড়িটা হবে মেয়েদের ইস্কুল, দক্ষিণ দিকের বাড়িটা হবে তাদের বোর্ডিং আর আশ্রম।'

'তবে আর মন্দিরের দিকটা খালি পড়ে থাকে কেন?'

'খালি থাকবে না, ওখানে তাঁত বসবে, চরকা চলবে, মেয়েদের অর্থকরী কাজকর্ম হবে।'

'তাই ত এত বড় সম্পত্তিটা এমনি করে জাহান্নমে যাবে?'

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, 'আমিও তাই ভাবচি। এ ছাড়া এ-সব নিয়ে কী-ই বা করা যায়। যাক গে।'

'দানের মতো বিড়ম্বনা সংসারে আর কিছু নেই।' জহর বলিল, 'তার চেয়েও বিড়ম্বনা জনসাধারণের উপকারার্থে দান করা। কিন্তু এতদিনে তোমার এই পরিচয় পেয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল শ্রীমতী, তুমি একটা নগণ্য পরোপকারী ছাড়া আর কিছুই নও মনে হচ্ছে।'

শ্রীমতী কহিল, 'কি করবো, এ আমার শাস্তি, তুমি কি বল ভোগের মধ্যে ডুবে থাকতে?'

জহর তাড়াতাড়ি কহিল, 'আধ্যাত্মিক আলোচনা থাক্, ও আমার সয় না। আমি বল্‌চি তোমার আর কোন পথ খোলা নেই?'

'আমার সকল পথ খোলা আছে, কিন্তু এ-সম্পত্তির নেই। ঐশ্বর্য অনেকটা জলস্তম্ভের মতো। জীবন সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছোটে, ছুট্‌তে ছুট্‌তে এক জায়গায় চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে।'

'বুঝলাম, কিন্তু তার গতি ত তোমার হাতে—'

'সে তোমাদের ভুল। ঐশ্বর্যের উপলক্ষমাত্র হচ্ছে তার মালিক। তার হাতে রাশ থাকে না, ঐশ্বর্য নিজের পরিণতি নিজেই সৃষ্টি করে। সে কিছুতেই স্থায়ী নয়, একদিন টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বেই। এই তার নিয়ম।'

'আবার তোমার কথা অধ্যাত্মবাদ ঘেঁষে চলেছে। দোহাই তোমার, রসের আলোচনায় তত্ত্ব এনো না।'

শ্রীমতী হাসিল, 'রসও একটা তত্ত্ব, তবে এই সুবিধে যে সেটা রসতত্ত্ব।'

জহর তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া প্রথমে হাসিমুখে তাহার দিকে তাকাইল। তারপর বলিল, 'তাও না-হয় বুঝলাম, তবু একটা কথা থেকেই যায়, তোমার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে?'

শ্রীমতী কহিল, 'অত্যন্ত স্পষ্ট, পাঁচ বছরের ছেলেও বুঝতে পারে। দম দিয়ে যখন মেসিনটা চল্‌তে থাক্‌বে আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো।'

'তা ত দেখবে, কিন্তু তোমার ইহকাল পরকাল?'

শ্রীমতী পুনরায় হাসিয়া কহিল, 'পরকালের ব্যবস্থাটা ত হয়েই গেল। যেটা এ-জগতের বড় প্রিয়, বাকি থাকে ইহকাল, সেটা ত তুচ্ছ।'

জহর বলিল, 'তুচ্ছ কিন্তু তাচ্ছিল্যের নয়। পেটে চাই অন্ন, আর পেট ঢাক্‌তে চাই বস্ত্র, তার কি?'

শ্রীমতী হাসিয়া যুক্তকর ধ্যানস্তিমিত নেত্রে উপর দিকে তাকাইয়া কহিল, 'ভক্তকে রাখেন ভগবান।'

'আজকাল উল্টো কথা, ভক্ত রাখে ভগবানকে। দেখছ ত পৃথিবী জুড়ে ভগবানকে বয়কট চল্‌চে, তাঁর সৃষ্টির বিরুদ্ধে চল্‌চে পিকেটিং, তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রায় শেষ হয়ে এল, সভ্য সমাজে আর তাঁর স্থান নেই?'

শ্রীমতী রাগ করিয়া কহিল, 'তুমি কি বল্‌তে চাও যাদের জন্যে এত করবো তারা একমুঠো খেতে পরতেও দেবে না?'

'না, কারণ তারা জন-সাধারণ, তাদের মধ্যে মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। জন-সাধারণ উপকার পেয়ে এমনই আচ্ছন্ন থাকবে যে তোমার দিকে তাকাবার সময়ই তাদের হবে না। জন-সাধারণ শুধু অকৃতজ্ঞই নয়, তারা বিশ্বাসঘাতক। আজকে তাদের জন্যে তুমি যত বড় ত্যাগই কর না কেন, একদিন তোমার সামান্য ত্রুটির জন্যে তারা তোমাকে টেনে পাঁকের মধ্যে ফেল্‌তে দ্বিধা করবে না। তাদের শ্রদ্ধাও যেমন সুলভ, অশ্রদ্ধাও তেমনি সহজলভ্য।'

শ্রীমতী কহিল, 'বেশ, যদি ঝি-গিরি করি তা হ'লেও ত—?'

'হ্যাঁ, তাই বল। সেইখানেই তোমার সম্মান। পরিশ্রমের বদলে পয়সা সে পয়সায় তোমার জীবিকা। এবার বল ত, তোমার এই বিরাট ত্যাগটা কাদের জন্যে হবে?'

'বিরাট বলে ঠাট্টা ক'রো না, এ ত্যাগ ন্যায়-সঙ্গত। আমার যা কিছু হবে সমস্তই মেয়েদের জন্যে।'

'মেয়েদের জন্যে? মানে?'

শ্রীমতী কহিল, 'মানে স্ত্রীলোকদের জন্যে, অর্থাৎ যারা পুরুষ নয়।'

মুখের একটা শব্দ করিয়া জহর বলিল, 'নিজেদের দিকে এত ক'রে ঝোল-টানার আবদার কেন?'

'এ আ'দার নয়, ভুল বুঝো না, এ হচ্ছে বিচার।'

'বিচারই বটে, কাজীর বিচার মেয়েদের মাথায় ক'রে নাচা এখনকার নেশা। পুরুষরা তোমার কী করেছে শ্রীমতী যে, তারা তোমার সহানুভূতি হারালো?'

'পুরুষের কথা পুরুষেরা ভাবুক, আমি মেয়েমানুষ। আজ সব কাজ ফেলে মেয়েদের উন্নতির দিকটা দেখা দরকার।'

'মেয়েদের উন্নতি মানে তোমার সভা-সমিতি, পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার, বড়বাজারে পিকেটিং, জেলে গিয়ে স্ত্রীলোকদের সুবিধে নেওয়া—কোনটা?'

শ্রীমতী কহিল, 'তা নয়, তাদের বাঁচতে শেখানো। তাদের বলা যে, তোমরা শুধু মেয়েমানুষ নয়, তোমরা মানুষ। আমার কাজ তাদের নিয়ে যারা আলো দেখেনি, যারা আশাহীন, যাদের সকল স্বপ্ন, সব কামনা নষ্ট হয়ে গেছে।'

জহর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। শ্রীমতী কহিল, 'এমন মনে ক'রো না যে, আমি ছাঁচ তৈরি ক'রে স্বাধীন জেনানা তৈরি করবো। আমি এমন মেয়ে চাইনে যারা মাথার চুল পুরুষের মতো ছাঁটে, মুখে পাউডার ঘসে সিনেমায় ছোটে। আমি সে-সব মেয়ে চাইনে যারা সভায় দাঁড়িয়ে তোমাদের গাল দেয়, কাগজে লিখে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল হতে বলে, একটা আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে উদ্দেশ্য-হীন পথে দৌড়ায়। সে-সব মেয়ে আমি চাই নে। মেয়েদের আন্দোলনটা যারা সমাজের দিকে না ফিরিয়ে রাজনীতির দিকে ফেরাতে চাইছে, তারা এদেশের মেয়েদের বোঝে না। মেয়েদের চরিত্রের দৃঢ়তাই আমার স্বপ্ন। তাদের জন্যেই আমি সর্বস্ব বিলিয়ে দেবো—যাদের শরীরে স্বাস্থ্য নেই, নিশ্বাসের বাতাস নেই, শিক্ষার আলো নেই। পরিবারের অত্যাচার সয়েও যাদের মুখ ফোটে না, দারিদ্র্যে যারা শীর্ণ, অপমানে যারা নতমুখ, যাদের চারিদিকে সমাজ আর শাস্ত্রের শতকোটি বাঁধন, হৃদয়ের মূল্য যাদের কেউ স্বীকার

করে না, রোগ শোকে দুঃখে চিরদিন যারা অসহায়—আমার কাজ তাদের নিয়ে।'

'তাদের দেখা তুমি কোথায় পাবে?'

'তারাই ত আছে দেশ ছেয়ে। তারা মরে যক্ষ্মায়; তারা মরে স্বামীর লাথির তলায়। তাদের বিয়ের পাত্র জোটে না, পেটে অন্ন জোটে না, পরনে জোটে না কাপড়। চোখে ঠুলি বেঁধে তারা সংসারে ঘানি ঘোরায়, তারপর একদিন কোথা দিয়ে চলে যায় তাদের স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন, তেজ—তারা হয় ক্রীতদাসী। আজ এই অগণ্য ক্রীতদাসীর কান্নায় দেশ ভরে উঠেছে। এদের মধ্যে আনতে হবে সংযম, দৃঢ়তা, উঁচু আদর্শ, জ্ঞান, চরিত্রের দীপ্তি। তাদের মরণ আর আমি সইতে পারি নে।' বলিয়া শ্রীমতী থামিয়া ভাবাক্রান্ত চক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইল।

জহর একবার তাহার বক্তৃতাকে বিদ্রূপ করিতে গিয়াও চুপ করিয়া গেল। শ্রীমতীর কণ্ঠে যে আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আর ব্যঙ্গ করা চলে না। সে আস্তে আস্তে ডাকিল, 'শোনো?'

শ্রীমতী মুখ ফিরাইল। জহর বলিল, 'আজ বেশ লাগলো তোমাকে, চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

'চল, এ-বেলা আমার কোনো কাজ নেই। দাঁড়াও গাড়িখানা আনতে বলি।' বলিয়া সে বাহিরে মোটরখানাকে প্রস্তুত হইতে বলিতে গেল।

মোটরে চড়িয়া সেদিন দুইজনে অনেকদূর পর্যন্ত বেড়াইতে-বেড়াইতে চলিল। বার-কয়েক গড়ের মাঠটাকে পরিক্রম করিয়া তাহারা চলিল দক্ষিণ দিকে। ফিরিঙ্গি ড্রাইভার তাহার অভ্যাস-মতো ঠিক পথেই গাড়ি চালাইতেছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই সময় স্নিগ্ধ হওয়া এই দিকটায় প্রচুর। অত্যন্ত আরাম বোধ হইতেছিল। জহর একসময় হাসিয়া বলিল,

'এরকম মোটরে ত আমার চড়বার কথা নয়, চাপা যাবার কথা।'

শ্রীমতীও হাসিয়া জবাব দিল, 'চাপা যাও নি এতদিন, বোধ হয় এই মোটরখানায় চড়বার জন্যেই। দুঃখ ক'রো না, কলকাতা শহর, চাই কি একদিন সে ভাগ্য হতেও পারে।'

'তা বটে।'

টালিগঞ্জ ঘুরিয়া একটা সরু রাস্তা দিয়া তাহারা লেক্-এর ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। মোটর খানিকদূর পর্যন্ত যাইতেই শ্রীমতী ইঙ্গিত করিয়া গাড়ি থামাইল। লোকজনের ভিড় এ সময়টা একটু বেশি, অনেকে এই ফিরিঙ্গি ড্রাইভারযুক্ত মিনার্ভা-কারের মধ্যে বাঙ্গালী দুইটি সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতীর দিকে হাঁ করিয়া তাকাইতে লাগিল। বাস্তবিক, রূপের গর্ব ইহারা করিতে পারে বটে। অমর্ত্যলোকবাসী যেন কোন্ দেবতার ইহারা দুইটি সন্তান। একটি প্রৌঢ়া মহিলা ও-দিক দিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন 'আহা বেঁচে থাক, আশীর্বাদ করি।'

শ্রীমতী গাড়ি হইতে নামিয়া ঈষৎ হাসিমুখে কহিল, 'চল একটু ও দিকে যাই, এ-দিকে বড় লোকজন।'

দুইজনে বেড়াইতে-বেড়াইতে চলিল। দূরে জঙ্গলের ও-পারে তখনও সূর্যাস্তকালের আকাশটা রাঙা হইয়াছিল, তাহারই রক্তাভা মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হইয়া নিচে সুদীর্ঘ জলাশয়ের উপর নামিয়া আসিয়াছে। নিকটে বোধ করি ছোট একখানি গ্রাম, তাহারই উপর দিয়া একটা রেলপথ চলিয়া গিয়াছে, দক্ষিণ দিকে গাড়ি যায়।

কিছুদূর হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়া মানুষের সমাগম হইতে খানিকটা দূরে এক জায়গায় জলের ধারে তাহারা বসিয়া পড়িল। পূর্বদিক হইতে তখন সন্ধ্যার অল্প অল্প অন্ধকার অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সুমুখে পরিষ্কার জল ছল্ ছল্ করিতেছিল, শ্রীমতী

জুতা খুলিয়া তাহার সুন্দর সুকোমল দুইখানি পা জলে ডুবাইয়া দিল। নিকটেই কতকগুলি ঘাসের ডগার উপর একটা ফড়িং উড়িয়া-উড়িয়া বেড়াইতেছে। শ্রীমতী কহিল, 'আচ্ছা এ ফড়িংটার ঘর কোথায় বলো ত?'

জহর বলিল, 'তোমার উপযুক্ত প্রশ্ন বটে। কি ভাগ্যি জিজ্ঞেস কর নি, ঐ যে কাকটা উড়ে যাচ্ছে, ওর আত্মীয়স্বজন কুশলে আছে কি না?'

শ্রীমতী নির্মল হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া কহিল, 'অথচ এমনিই আমার মন। আমার জানলার ধারে একটা দেবদারু গাছ আছে দেখেচ ত? তার অন্ধকার কোলে যখন সকালের আলো এসে পড়ে, আমি আর থাকতে পারি নে—কী যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে আমার মন, ইচ্ছে হয় ছুটে কোথাও চলে যাই।'

জহর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'জলের ওপর থেকে পা তুলে নাও শ্রীমতী, কিছু কামড়াতে পারে।'

শ্রীমতী পা তুলিয়া লইল।

'আচ্ছা শ্রীমতী!' বলিয়া জহর তাহার একটি হাত ধরিয়া কহিল, 'আচ্ছা বলো ত, তুমি তখন যা বললে সে কি তোমার মনের কথা?'

শ্রীমতী কহিল, 'সংসারে তুমি কি কিছু বিশ্বাস করতে আসো নি?' 'না, সব কিছুর মধ্যেই আমার একটা সন্দেহ থেকে যায়। ভয়ানক সন্দেহ, ভয়ানক দ্বন্দ্ব। কিন্তু তোমাকে এক-একবার যে আমার কী ভালই লাগে, কী যে আনন্দ পাই তোমার পাশে এলে তা আমি বোঝাতে পারি নে।'

'সে আমি বুঝতে পারি।'

'বুঝতে তুমি পারো না শ্রীমতী, আমি তোমার সঙ্গে অন্য কথা বলি, অন্য আলোচনা করি, তোমাকে বার-বার আঘাত ক'রে বসি, কিন্তু তুমি বুঝতে পারো না, তোমার কাছাকাছি এলে কী আমার

হয়। আজ তোমার চারিদিকে অনেক মানুষ, অনেক জটলা, তারই একান্তে আমি থাকি তোমার কাছে। তোমার কাছে থাকাটা আমার যেন তপস্যা, আমার সকলের চেয়ে বড় কাজ। সেদিন তোমার এক টুকরো নিশ্বাস যখন আমার গায়ে লাগ্‌লো, আমার ভেতরে চারদিকে যেন বাঁশী বেজে উঠ্‌লো, চিৎকার ক'রে বলে উঠলাম, আমার জীবনেরও দাম আছে, ওরে আমাকেও বাঁচতে হবে।' বলিয়া সে নিজের কোঁচার খুঁট লইয়া শ্রীমতীর পা দুইখানি আস্তে-আস্তে মুছাইয়া দিতে লাগিল। আবেগে তাহার হাতখানা কাঁপিতেছিল।

শ্রীমতী হাসিল, কহিল, 'কি ভাগ্যি আমার, আজ হঠাৎ পায়ে হাত দিচ্ছ যে?'

'জল মোছ নি, পায়ে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

'আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। গায়ে হাত না দিয়ে যারা মেয়েদের আগে পায়ে হাত দেয়, তারা বেশি চালাক। চুপি চুপি বলে রাখি, মেয়েরা যেন না শোনে, আমাদের মুগ্ধ করার সকলের চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, আগে আমাদের পায়ে হাত দেওয়া।' বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

'তাই নাকি?' জহর হাসিয়া কহিল, 'এ ত জানা ছিল না?'

শ্রীমতী বলিল, 'মেয়েদের মন যে! যেখানে কড়া বাঁধন, সেইখানেই তার ফাঁস-আল্গা!'

আকাশের কোলে-কোলে ঘনায়মান অন্ধকার—আবছায়া অন্ধকার চারিদিকে নামিয়া আসিতেছিল। দূরে-দূরে এক-একটা গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বসন্তকালের সন্ধ্যা, পাশের জঙ্গল হইতে অখ্যাতনামা ফুলের মুখচোরা মিষ্ট গন্ধ থাকিয়া-থাকিয়া একটি ভীরু আবেদন জানাইয়া যাইতেছিল।

ইহারা পরস্পর পরস্পরকে একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছে একথা বলিলে কোথায় যেন একটা মিথ্যা থাকিয়া যাইবে। অথচ

তাহাদের এই নিবিড় বন্ধুত্বের অন্তরালে রহিয়াছে একটি দুরতিক্রম্য ব্যবধান। সেখানে তাহারা উভয়েই একা। এত কাছাকাছি আসিয়াও এত দূরে থাকা বোধ করি ইহাদের মতো নরনারীর পক্ষেই সম্ভব। জীবনে কোনো ক্ষেত্রেই যাহাদের কোনো বন্ধন নাই, তাদের ভালবাসার অর্থ কী ?

উঠিবার ইচ্ছা তাহাদের কাহারো দেখা গেল না। একজনের হাত আর একজনের হাতের ভিতর জড়ানো রহিল, একজন অন্য-জনের গায়ের উপর পা হেলাইয়া স্থির হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল। আকাশে একটি একটি করিয়া তারা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, নিষ্প্রভ সপ্তমীর চন্দ্র উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। চিরন্তন পুরুষ চিরন্তন নারীর পাশে বসিয়া যুগে-যুগে যেমন করিয়া আনন্দ ও বিষাদের মুহূর্তগুলি যাপন করিয়াছে, আজিকার এই নরনারীর পাশাপাশি বসিয়া থাকার চিত্রটি যেন তাহারই অনুরূপ।

প্রথমে জহরই কথা কহিল। বলিল, 'আমি তোমার কথাই ভাবচি শ্রীমতী।'

শ্রীমতীর ধ্যানভঙ্গ হইল। বলিল, 'কি আশ্চর্য, আমিও যে ভাবচি তোমার কথা ?'

'না, ঠাট্টা নয় শ্রীমতী। তোমার কথাই কেবল আমি ভাবচি। তুমি সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে তাতে আমার দুঃখ নেই, আমি ভাবচি, তার পরে কি ? পরোপকারের নেশা যখন কাটবে, নিজের দারিদ্র্যই যে তখন বড় হয়ে উঠ্‌বে। তখন তাকে সাম্‌লাবে কি দিয়ে ?'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ, শুধু ত জীবনটাই তোমার হাতে নেই, আর একটা বোঝা রয়েছে তোমার পিঠে। সে বোঝাটা যৌবনের। জীবনের একটা বিলিব্যবস্থা করা সহজ, না-হয় ঝি-গিরিই ক'রে কাটালে, কিন্তু যৌবনের ? তাকে ত আর ধাপ্পা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে না ?'

শ্রীমতী কহিল, 'তুমি কি বলতে চাইচ স্পষ্ট ক'রে বল, সাহিত্য ক'রে ব'লো না। তোমার কথার মানে সংসার পাতা? আর একবার বিয়ে করা? কী?'

জহর একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'তা বলি নি, আমি বল্‌চি ছোটবেলা থেকে তুমি কি এই স্বপ্নই দেখে এসেছ যে, পরের জন্যে জীবন উৎসর্গ করবে?'

শ্রীমতী কহিল, 'এই কথা? মিথ্যে বল্‌বো না, সে স্বপ্ন দেখলে আমি ধন্যই হতাম, হয় ত আমাকে দিয়ে আমার বিধাতা বড় কাজই করাতেন, কিন্তু মেয়েমানুষের মন, সংসারের বড় আদর্শ সে হয় ত ভাবতে পারে, বড় জীবনের আদর্শ তার কল্পনায় আসে না। ছোট-বেলা থেকে আমি দেখেছিলাম অন্য স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন তা হ'লে তোমার একটা কিছু ছিল?'

'ছিল, একটা অত্যন্ত সাধারণ স্বপ্ন, তার কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না।'

'কী সে? বলবে?'

শ্রীমতী কহিল, 'না। তাকে প্রকাশ করতে গেলে সে হয় ত মিথ্যে হয়ে যাবে। তবু এইটুকু জেনে রাখো, আমি যে আজ সব-স্বান্ত হতে যাচ্ছি সে শুধু অবস্থার দায়ে। পরের জন্যে সর্বত্যাগী হওয়া হয় ত দরিদ্রনারায়ণের পুজো হতে পারে, কিন্তু সে আমার আবাল্যের স্বপ্ন নয়।'

জহর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার একটা হাতের উপর চাপ দিয়া কহিল, 'তাই বল শ্রীমতী, তাই বল। বাঁচলাম। তোমাকে বুঝতে পেরে আমি বাঁচলাম। মানব-প্রীতির সুলভ উচ্ছ্বাসে যে তুমি আত্মহারা হও নি, তোমার মন যে অত্যন্ত সচেতন, এই জেনে আমি বাঁচলাম।'

শ্রীমতী কহিল, 'হ্যাঁ, অত্যন্ত সচেতন আমার মন, ঠিক সচেতন বললেও হয় ত ভুল হবে, স্পর্শাতুর। আমার মনকে যদি কেউ

ছোঁয়, আমার নেশা লাগে। অথচ ছোটবেলা থেকে এই মন নিয়ে আমি বড় হয়ে উঠলাম। মনের খোরাক যোগাতে যখন বেরিয়ে পড়তাম, বাবার এই বিপুল ঐশ্বর্য আমায় বেঁধে রাখতে পারতো না। ছুটতে-ছুটতে হায়রান হলাম কিন্তু আজো আশা আমার ভাঙলো না। এখনো সে গাঁয়ের পথে ছুটচে, যে-পথ গিয়ে মিশেছে কপোতাক্ষী নদীর তীরে, চারিদিকে তার নীল ফুল অপরাজিতার বন, যেখানে কাঠমল্লিকা আর রজনীগন্ধা গলাগলি ক'রে রয়েছে—'

'সেখানে? সেখানে তোমার কি শ্রীমতী?'

'সেখানেই ত আমার ঘর। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আমার আনন্দ সেইখানেই। সেখানে অশান্তি নেই, মানুষের কুটিলতা নেই, জীবনের কোনো সংগ্রাম নেই—নিভৃত। নিভৃত আর নির্জন। মেয়েদের মনে কত উদ্ভট কল্পনা থাকে, নানা বিষয়বুদ্ধিতে মন তাদের ভারাক্রান্ত, কিন্তু আমি ছিলাম স্পষ্ট। আমি চেয়েছিলাম সুন্দর সুন্দর আশ্রয়, ছোট্ট সংসার, সহজ জীবন। মালতী-লতায় আমার ঘরের চাল ছাওয়া থাকবে, আগড়ে থাকবে একটি হরিণের ছানা, উঠানে থাকবে তুলসীতলা, পথে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে পাবো নদী, কলসী নিয়ে নদীতে নাইতে যাবো, গলা জলে দাঁড়িয়ে শুনবো নদীর জলে মাঝির সারিগান।'

'তারপর?'

শ্রীমতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'তারপর তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, মনের মতো একটি পুরুষ, সে-পুরুষ হবে বন্য, বর্বর, অশিক্ষিত, সরল, কিন্তু সে হবে মনের মতো। আমাদের ভালবাসা অন্ধ অজ্ঞান, অকৃত্রিম। আমাদের বাইরে সমাজ নেই, সভ্যতা নেই, ধর্ম নেই। কোথায় হবে যুদ্ধবিগ্রহ, কারা করলো রাজ্যজয়, যন্ত্র-জগতের কোলাহল, সমাজের আন্দোলন, কোথায় হ'লো জাহাজডুবি, কারা ভাসলো দক্ষিণমেরুর পথে—তাদের কোন সংবাদ আমাদের

কাছে এসে পৌছবে না। নিরালায় আমাদের ঘর, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অকুণ্ঠ প্রেম, সুন্দর স্বপ্ন।'

জহর কহিল, 'এ ত তোমার কবিত্ব শ্রীমতী?'

শ্রীমতী কহিল, 'তা হতে পারে। মানুষের যে কোন সুন্দর কামনাই কবিত্ব, এতে লজ্জার কিছু নেই।'

'এ কামনা কি তোমার এখনো আছে?'

'চিরদিন থাকবে—চিরদিন। এর বিনাশ হবে আমার মৃত্যুর সঙ্গে।'

'এ আশা তোমার মরীচিকা। যত ছুটবে ততই দূরে সরে যাবে।'

শ্রীমতী কহিল, 'অথচ মরীচিকা নয়, বিধাতার কাছে এ-ভিক্ষা আমার অতি সামান্য। এই সেদিনো মানুষের মতো মানুষ হবার একটা বড় লোভ আমার ছিল, জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে মহত্বে সমাজের শীর্ষস্থানীয়া হয়ে উঠবো। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আকাশকে স্পর্শ করবো—কিন্তু কেন? মানুষের উচ্চ আশার পাশেই যে থাকে একটা ভয়ানক যুদ্ধ, কেন সে-যুদ্ধে আমি লিপ্ত হবো? আমি মেয়েমানুষ। আমার সব চেয়ে বড় কাজ যে, সুন্দর জীবন সৃষ্টি করা।'

দুইজনের কেহই এতক্ষণ দেখে নাই, কোমল, করুণ জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। যাহারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতেছিল তাহারা ইতিমধ্যে কখন যে-যাহার চলিয়া গিয়াছে। সুমুখে জলের ভিতর চন্দ্র প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের দুইজনেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতীর খোঁপাটা ভাঙ্গিয়া জহরের কোলের ভিতর একাকার হইয়া পড়িয়াছে। নরম আঙ্গুলগুলি দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া সে তাহার একটা হাত লইয়া দোলা দিতেছিল।

অনেক দেরিতে তাহাদের চমক ভাঙিল—হ্যাঁ, তখন অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে। অপ্রতিভ হইয়া আত্মসম্বরণ করিবার সময়ও

খন অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তবু শ্রীমতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল, বসিল, 'তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, দেখ ত খোঁপাটা আমার এলিয়ে দিয়েছ ?'

জহর বলিল, 'মেয়েদের খোঁপার ওপর আমাদের বড় রাগ !'

দুই হাত তুলিয়া শ্রীমতী চুলটা আবার ফিরাইয়া লইল, তারপর হঠাৎ জহরকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিল, 'তোমার জন্যে আমিও লজ্জা-সরমের মাথা খেলাম, ভাগ্যি এ-দিকে কেউ নেই ?'

'নেই কে বললে ? হয়ত কলেজের ছাত্র-টাত্র কেউ লুকিয়ে দেখছে।'

'ছি ছি, চল ওঠো, ও-দিকে যে রাত পুইয়ে গেল।' বলিয়া শ্রীমতী পায়ে জুতাটা পরিতে লাগিল। দিগন্ত জুড়িয়া জ্যোৎস্না-ময়ী সুন্দর বসন্তরাত্রি তাহাদের পথের দিকে হাসিমুখে তাকাইয়া রহিল।

ইহার পর একটি মাস চলিয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে এক মাসেরও বেশি হইবে। এ-বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা নিত্য নিয়মিত চলিতেছে। ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনীয়ার, ওভার-সীয়ার, কনট্রাক্টর এবং বহু ব্যবসায়ী আপন-আপন কাজের ভার লইয়া যাতায়াত করিতেছেন। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আসিতেছে, বাহিরে বড় একটা আফিস বসিয়াছে। সংবাদপত্রগুলিতে শ্রীমতীর ত্যাগের কথা বড় হরপে ছাপা হইতে লাগিল, প্রচারকার্য চলিতে লাগিল। সমুদ্রপারে বিদেশে ভারি-ভারি অর্ডার চলিয়া গিয়াছে।

এ-দিকে স্কুল বসিবে শুনিয়া ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে আবেদনপত্র আসিয়া জমিতে লাগিল, মান্যগণ্য ব্যক্তি-গণ নানা প্রস্তাব পাঠাইলেন। বোর্ডিংয়ের বনিয়াদ বসিল, তাহার সঙ্গে বসিল আর একটি আপিস এবং সর্বশেষে ইতিমধ্যেই জন-কয়েক বেকার লোকের বেশ একটা উপায় হইয়া গেল।

উপায় হইল না শুধু জহরের। বিধাতা তাহাকে সুবিধাবাদী করিয়া পাঠান নাই। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হইলে সে শ্রীমতীর মতো নির্বোধ মেয়েকে ভাঙাইয়া চিরজীবনের মতো বেশ কিছু গুছাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু হতভাগা মন সে দিক দিয়াই গেল না, ফাঁকা কতকগুলো বাক্সে তত্ত্ব লইয়া সে উচ্ছন্ন গেল। শুধু তাহাই নয়, একমাসের মাস্টারীর মাহিনা লইয়া সে যে সেই এ-বাড়ি হইতে উধাও হইয়াছে আর দেখা নাই। কোথায় সে গেল, কেন গেল, কবে ফিরিয়া আসিবে, কাহারও উপর তাহার অভিমান হইল কিনা কিছুই বলিয়া যায় নাই, হয় ত দুলালচাঁদের মতো বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া আবার হয় ত কোন্ মাসীর ওখানে সিন্দুর লইতে গিয়াছে। নরাধম, অভদ্র, ইতর! এক সপ্তাহ গেল, দুই সপ্তাহ গেল—কিন্তু কোথায় সে? হয় ত জুয়া খেলিয়া দিন কাটাইতেছে, হয় ত কোন্ সন্ন্যাসীর আশ্রমে বসিয়া, আশ্চর্য কিছুই নয়—গাঁজা টানিতেছে, নয় ত কোনো বস্তির ভিতরে ঢুকিয়া পোটো আর ভিখারীদের ভিতর কলহ বাধাইয়া দিয়াছে। কী কদর্য তাহার রুচি, কী ঘৃণ্য তাহার জীবন! কোথাও বিবাগী হইয়া চলিয়া যায় নাই ত?

শ্রীমতী তাহার অজস্র ব্যস্ততার মধ্যে তাহার পথের দিকে তাকাইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এতগুলি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত আলোক-প্রাপ্ত লোক লইয়াই তাহার কারবার কিন্তু ইহাদের কাহারও ভিতর সেই জীর্ণবেশ ছন্নছাড়া ও বিষয়বুদ্ধিহীন মানুষটিকে সে খুঁজিয়া পাইল না। ইহারা সবাই তাহাকে শ্রদ্ধা জানায়, প্রশংসা করে, সন্তুষ্ট করে, কুশল প্রশ্ন করিয়া তাহাকে খুশি করে, তাহার ফরমাস খাটে, কাগজে কাগজে তাহার ছবি ছাপিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া, তাহার বাণী প্রকাশ করিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই দয়া-মায়াহীন অকরুণ মানুষটি নাই। ইহাদের সম্মিলিত স্তব-স্তুতির ভিতর সেই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বাজিয়া ওঠে না, নির্মম ব্যঙ্গের

আঘাতে সে ছিন্নভিন্ন হয় না, অকুণ্ঠ সমালোচনার কশাঘাতে তাহার হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে না। ইহাদের সবাই তাহাকে ভালবাসে, স্নেহ করে, পূজা করে, তাহার কাছে আবেদন, নিবেদন, প্রার্থনা, ভিক্ষা জানায়, কিন্তু এমন একজন মানুষ ইহাদের মধ্যে দুর্লভ, যে তাহাকে ভালবাসে নাই, যে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে, প্রয়োজন হইলে ঘৃণা করিয়াছে, সুন্দরী রমণী বলিয়া যে-মানুষটি কোথাও তাহাকে কোন বিশেষ সুবিধা দেয় নাই। আজ তাহার চারিদিকে যে অসংখ্য নরনারীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে, ইহারা সকলে একই মক্ষিকা, একই জাত, একই রূপ ইহাদের, ইহাদের কণ্ঠে-কণ্ঠে একই গুঞ্জনধ্বনি!

প্রতীক্ষা—প্রতিদিন দীর্ঘ দিন ধরিয়া প্রতীক্ষা! এত কাজ, এত যানাগোনা, এত ঘোরাঘুরি তবু সময় কাটে না। কোথায় যেন শ্রীমতীর মধ্যে একটি মানুষ উপবাস করিয়া উপুড় হইয়া অভিমানে পড়িয়া আছে। প্রতীক্ষা, যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা! সেই বিপুল জীবনের স্পর্শ কোথাও নাই, তাহার পাশে থাকার সেই তীব্র আনন্দ, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা কোথাও নাই, সেই ঘাত-প্রতিঘাতের দুরন্ত উল্লাস, বক্ষরক্তধারার ব্যাকুল আন্দোলন, সে উদ্দাম অনুভূতি কোথাও নাই। এ যেন সমস্তটাই জলমিশ্রিত, কৃত্রিম, স্যাঁতস্যেঁতে, রং-চটা, বাজে, ইহাদের সবাই যেন আধমরা, ক্ষীণজীবী দুর্বল, ফাঁকা!

প্রতীক্ষা—প্রতি ক্ষণের, প্রতি পলের, প্রতি মুহূর্তের প্রতীক্ষা। আবেগ-উদ্বেলিত বিদীর্ণ বক্ষের প্রতীক্ষা! ক্লান্ত ক্লান্ত সে। বড় ক্লান্ত। বড় অবসন্ন! ক্লান্ত দিন, ক্লান্ত রাত। সূর্য ক্লান্ত, ক্লান্ত আকাশের তারকার ক্ষীণালোক বড় ক্লান্ত।

প্রেম? প্রেম নয়, প্রয়োজন। তাহাকে বড় প্রয়োজন। আকাশকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া পিষিয়া ফেলিলে সে প্রয়োজন মিটিবে না। দিনের উজ্জ্বল আলোক, রাত্রির কোমল অন্ধকার দুই অঞ্জলি ভরিয়া

নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেও সে প্রয়োজন ফুরাইবে না। সৃষ্টি যাক্ রসাতলে, প্রলয় হইয়া সমস্ত চুরমার হউক, ইহকাল-পরকাল যাক্, ইস্কুল-হাসপাতাল জাহান্নামে যাক্—তাহাকে আজ বড় প্রয়োজন। প্রেম ? প্রেম নয়, প্রয়োজন।

অবশেষে একদিন জহর ফিরিয়া আসিল।

'এলেন দাদা এতদিন পরে ? কোথায় ছিলেন বলুন ত ? এ কী হয়েছে আপনার ? এ কি চেহারা ? ঘরে আসুন।' বলিয়া লখিয়া তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া আসিল। তারপর বলিল, 'দিদি-মণিকে না-হয় ভুলে থাকতে পারলেন, কিন্তু ছোটবোনকে ? ছাত্রীকে ? আপনি বড় নির্দয়।'

জহর হাসিয়া তাহার চিবুকটি ধরিয়া নাড়িয়া দিল, কথা কহিল না।

অপরাহ্ন বেলা। শ্রীমতী তাহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। লখিয়া জহরকে ধরিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল। বলিল, 'চা না খেলে মুখ দিয়ে আপনার কথা বার করা কঠিন। দাঁড়ান।' বলিয়া দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

কেহ কোথাও নাই, এইবার একাকী পাইয়া মৃদু-কঠিন কণ্ঠে শ্রীমতী প্রশ্ন করিল, 'কোথায় থাকা হয়েছিল এতদিন ?'

জহর কথা কহিল না।

'অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হচ্ছিল বুঝি ? বোধ হয় অনেক গেল ?'

কি যেন বলিতে জহর আসিয়াছিল কিন্তু শ্রীমতীর এই বিদ্রূপে তাহার হঠাৎ রাগ চড়িয়া গেল। বলিল, 'হ্যা, অনেক গেল।'

শ্রীমতী কহিল, 'সে আমি জানি। দুলালচাঁদরা ভাল আছে ত ? কত টাকা জেতা হ'লো জুয়া খেলে ?'

তাহার কণ্ঠস্বরে ক্রুদ্ধ হইয়া জহর কহিল, 'সে হিসেব তোমাকে দিতে আসি নি।'

'তবে এলে কি মতলবে ? বড়লোকের বাড়িতে ঢুকে শরীরটা আবার সারিয়ে নিতে ?'

কী করিতে আসিয়া কী হইয়া গেল। অত্যন্ত শ্রান্ত, তবু হঠাৎ কলহ করিবার একটা উদ্দাম প্রবৃত্তিকে জহর আর সংযত করিতে পারিল না। নিতান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া ভদ্র তিক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, 'সে ছাড়া আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল, এই তোমারই সম্বন্ধে, কিন্তু সে রুচি আমার আর নেই।'

'নেই কেন? পেট ভরা আছে?'

'হ্যাঁ, সেইটা তোমাকে জানাতে এলাম। না এলেও পারতাম, এসে দেখি তোমার ত দিব্যি একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এত সোরগোল, এত হৈ-চৈ, এতগুলো ভক্ত, আমাকে ত এখন ছেড়ে দেওয়া সহজ। তবু বলে যাই, বেখে-ঢেকে খেও শ্রীমতী, তোমার যে-রকম হাঁকাই, হয় ত উদরাময় হতে পারে।'

শ্রীমতীর মুখখানা অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। একটা পায়ের উপর আর-একটা পা রাখিয়া সে কেবলই ঘষিতে লাগিল।

জহর তাহার উদ্যত চাবুকের আর-একবার শব্দ করিয়া কহিল, 'বড়লোকের মেয়ে কিনা তাই ভয় হয়, কত মাছির ডানা জড়িয়ে যাবে—আহা বেচারিরা। তবু তার জন্যে আমি ভাবি নে। আমার দুঃখ হয় লখিয়ার জন্যে। মেয়েটি বড় ভাল, অকলঙ্ক, নিষ্পাপ। যদি পারো, দৌত্যকার্যের কুৎসিত দাসত্ব থেকে ওকে মুক্তি দিয়ো।'

শ্রীমতী তীক্ষ্ণ শ্লেষ করিয়া কহিল, 'আমাকে অপমান করাটা না-হয় বুঝলাম, বুঝলাম না লখিয়ার জন্যে তোমার মাথা-ব্যথাটা। মতলবটা কি শুনি?'

জহর কহিল, 'এ জঘন্য প্রশ্ন মেয়েমানুষের পক্ষেই সম্ভব। আমার এই অকারণ ব্যথা কেন, সে-কথা শোনবার মতো সৎপাত্র তুমি নও শ্রীমতী, শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, লখিয়াকে আমি সত্যি ভালবেসেছি।'

ঠোঁট উল্টাইয়া গলার আওয়াজে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশাইয়া শ্রীমতী

কহিল, 'ভালবাসা! কার মতন ভালবাসা? স্পষ্ট ক'রে শুনতে পাই নে? ভালবাসার তুমি জানো কি?'

জহর মিনিট-খানেক নীরবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্, ঝগড়া থাকুক। ভেবেছিলাম যাবার সময় বেশ আনন্দ নিয়েই যাবো, তা আর হ'লো না!' ঘরের ভিতর কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া সে পুনরায় কহিল, 'হ্যাঁ, চা খাবার সময় আর আমার হয়ে উঠবে না, আমি এখনই চললাম! আমায় ক্ষমা করো শ্রীমতী।' বলিয়া সে উঠিয়া দরজা দিয়া বাহির হইল।

শ্রীমতী ছুটিয়া আসিয়া তাহার পথ আগলাইয়া কহিল, 'কোথা যাও?'

জহর কহিল, 'পথ ছাড়ো শ্রীমতী, জীবনে নাটক সৃষ্টি করা আমার বড় অপ্রিয়। নাটক নয়, জীবনটা উপন্যাস!'

রুদ্ধনিশ্বাসে শ্রীমতী কহিল, 'তুমি যখন সত্যি অপমান করো তখন আমার কথা ফুরিয়ে যায়। তবু, যাওয়া হবে না তোমার।'

'পথ ছাড়ো শ্রীমতী, মাঠের ওপর দিয়ে ওরা সব আনাগোনা করছে। কাজ করতে নেমে প্রথমেই যদি তোমার চরিত্র নিয়ে আন্দোলন ওঠে, তবে সমস্ত চুরমার হয়ে যাবে। পথ ছাড়ো শ্রীমতী, আমাকে যেতেই হবে।'

শ্রীমতী বিবর্ণমুখে সরিয়া দাঁড়াইল। তবু আর-একবার চেষ্টা করিয়া স্তিমিতকণ্ঠে কহিল, 'যেতেই হবে? বাইরে আমার চার জন দারোয়ান আছে, মনে রেখো।'

তাহার কণ্ঠের সেই দীনতা দেখিলে হয় ত যে-কোনো লোকেরই কান্না পাইত!

'তাই নাকি? চারজন?' বলিয়া জহর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'তা হ'লে ত ভয় পাবারই কথা! মার খেয়ে অপঘাতে মরতে পারবো না শ্রীমতী, তার চেয়ে এসো, প্রেমালাপ ক'রে তোমার সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে যাই, এসো।' বলিয়া কঠিন মুষ্টিতে শ্রীমতীর

হাত ধরিয়া সে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিল।

'কী হচ্চে, ছাড়ো, লখিয়া এসে পড়বে।' শ্রীমতী নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কাপড় গুছাইতে গুছাইতে সরিয়া গেল।

জহর কহিল, 'এসে দেখে ফেললেই ভাল হ'তো। দেখতো, ছদ্মবেশী একটা বন্য পশুকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারো না।'

'বন্য পশু বলে নিজের প্রশংসা ক'রো না।'

'বেশ ত, বন্য পশু এবং অসচ্চরিত্র—সোনায় সোহাগা। লখিয়াকে জানিয়ে যেতাম যে, আজ জহুরী জহর চিনেছে!'

নিজের পরিচয়টা নিজের মুখে বলিয়া সে এত রাগেও শ্রীমতীকে হাসাইয়া দিল। শ্রীমতী কহিল, 'চরিত্রহীন ছাড়া তোমার আর কি পরিচয়?'

'আর কিছু নয়, ওইটেই আমার সত্য পরিচয়।' বলিয়া সশব্দে একটা চেয়ার টানিয়া জহর বসিল। বলিল, 'চরিত্রহীন আমি বাল্যকাল থেকে, তখন আমি সাত বছরের ছেলে, শুনবে শ্রীমতী?' বলিয়া শ্রীমতীর উৎসুক দৃষ্টির দিকে ক্ষণকালের জন্য একবার তাকাইয়া সে বলিয়া যাইতে লাগিল, 'এই কলকাতা শহরে এক নগণ্য পল্লীতে দরিদ্রের ঘরে আমার জন্ম হলো। কী দুঃখে, কী আশায় বড় হলাম। সে কি উজ্জ্বল উন্মাদ স্বপ্ন, মানুষের মতো মানুষ হবো! বাল্যকাল কাটলো স্কুলে। অবোধ কতকগুলি তরুণ মুখ মাস্টার মশাইয়ের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকতো, আমিও ছিলাম তাদের একজন। জীবনের সম্বন্ধে কত আশা, কত সম্ভাবনা, কেবলই একটা সুদিনের অপেক্ষায় দিন গুনতাম। পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাশ ক'রে গেলাম কিন্তু কেবলই মনে হ'তো এ কিছু না, এ মিথ্যে, এরা আমার বড় হবার সহায় নয়, এভাবে আমার দিন কাটলে চলবে না। সেদিন থেকে কারো সঙ্গে আমার চরিত্র খাপ খায় নি, আমি চরিত্রহীন নয় ত কি?'

শ্রীমতী বিদ্রূপ করিয়া কহিল, 'কী পরিকল্পনাটা তোমার ছিল শুনি ?'

এমন সময়ে লখিয়া চা ও খাবার লইয়া সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিল। টিপয়ের উপর সেগুলি রাখিয়া সে কহিল, 'যতই রাত হোক, আজকে আমার পড়া নিতে হবে দাদা, আমি বসে রইলাম ও-ঘরে।'

জহর হাসিয়া বলিয়া দিল, 'আচ্ছা ভাই।'

লখিয়া বাহির হইয়া গেল।

জহর বলিতে লাগিল, 'হ্যাঁ, পরিকল্পনা একটা আমার ছিল, সেইটেই আজ তোমাকে শোনাবো। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হতে লাগলাম। সে কী দারিদ্র্য, সে তুমি বুঝবে না, কোনোদিন ভাত জুটতো, কোনোদিন জুটত না। সাদা কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে ইস্কুলেই পড়া লিখতাম. সে-লেখা যখন পুরানো হয়ে যেত, তখন রগড়ে মুছে ফেলে তার ওপর আবার লিখতাম। নতুন বছরে ক্লাসে উঠে বই কেনার সে কি ভয়ানক সমস্যা! আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত সকলের দরজায়-দরজায় কুকুরের মতো ভিক্ষা করতাম, অপমান আর উপেক্ষা আকণ্ঠ হয়ে উঠতো। ক্লাসে আমি ভাল ছেলেই ছিলাম কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতাম মাস্টারগুলো কী পড়ায়, এর সঙ্গে ত আমার মন সাড়া দেয় না। তাদের ধারণা, একদিন আমরা দেশের মুখোজ্জ্বল করবো। মুখোজ্জ্বল করবার কোনো উৎসাহ কিন্তু আমাদের সে-বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে ছিল না। যাক্, ইস্কুল থেকে ত বেরোলাম। কিন্তু কোথায় ? ছোট-ছোট ভাইবোনগুলি, বিধবা মা, সকলে পরম আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, দিন তাদের এবার ফিরবে। দিন ফেরাবার মূলধন ত আমার নেই। বই পড়ে শিখেছি কতকগুলো উপদেশ, নীতি, কুসংস্কার, আর পেয়েছি কতকগুলো বাজে ঐতিহাসিক তথ্য, বর্তমান জীবনে তারা মূল্যহীন, কিন্তু বড় হবার সেই উদ্দাম অনুপ্রেরণা তার মধ্যে কোথায় ? প্রথমেই এল জীবন সংগ্রাম, ঢেউয়ের পর ঢেউ, উত্তুঙ্গ,

উত্তাল, তার সঙ্গে লাগলো সংঘর্ষ, ক্ষতবিক্ষত হলাম। তখনো মন ছিল আমার নিষ্পাপ দৃষ্টি ছিল নির্মল। বিষয়-বুদ্ধি আমার নেই, সুবিধাবাদী আমি নই, তাই দেখলাম সবাই গেল এগিয়ে, আমি রইলাম পিছনে শুধু দেখলাম তাদেরই সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেছে যাদের জীবনের অতীত ইতিহাসে রয়েছে ছল, চাতুরী, কপটতা, ভণ্ডামী। এক জায়গায় কিছুদিন চাকরি করতে গিয়ে দেখলাম সে কী কদর্য জীবনযাত্রা! তোষামোদ, হীন স্বার্থবুদ্ধি, জঘন্য রুচি, অন্যায় অবিচার, অজস্র কাঙালপনা! যারা একটু ভাল লোক, অল্প পরিমাণ মহৎ, সাধারণ ভদ্র, যারা চলনসই মধ্যবিত্ত, সেই সাধারণ লোকগুলিই হচ্ছে তাদেরই ক্রীতদাস, যারা পরস্বাপহরণ ক'রে সমাজে বড় হয়েছে যাদের পিছনে আছে শয়তানি, কূটচক্র, সর্বনাশা স্বার্থপরতা, অকুণ্ঠ প্রতারণা। আমার সকল আশা চুরমার হয়ে গেল। পথে-পথে ঘুরে বেড়াই; ভাবি, সাধারণ হয়ে ভদ্র হয়ে জীবন যাপন করবার কি কোনো উপায় নেই? উপায় যে ছিল কত শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস যখন নষ্ট হয়ে যায় শ্রীমতী স্বপ্ন আর আদর্শ যখন ভাঙে, তখন বেঁচে কী সুখ? সমস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের জীবন এই য ব্যর্থ হয়ে গেল এর জন্যে সমগ্র মানব-সমাজ কি দায়ী নয়? আমাদের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, জীবনের উদার বিস্তৃতি নেই; এ কেন? ধর্ম আমাদের অকর্মণ্য করেছে, নীতি করেছে পঙ্গু, কুসংস্কার করেছে অন্ধ। আমাদের চারিদিকে জমেছে মানুষের হিংসা, বন্ধু-বান্ধবের প্রতারণা, পরিবার-পরিজনের অন্যায় শাসন, আমরা পরাধীন! আর পরপদানত। আত্মপ্রকাশ করবার পথ আমাদের বন্ধ, জীবনকে পরিব্যাপ্ত করবার পথ আমাদের কণ্টকাকীর্ণ। আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি শ্রীমতী, দেশের মৃত্যু, জাতির মৃত্যু, মানুষের মৃত্যু। পথে-পথে ঘুরে বেড়াই, নিজের চরিত্রকে উজ্জ্বল ক'রে সৃষ্টি করতে পারি নি, আমি ত নিশ্চয়ই চরিত্রহীন! আমার মতো আরো কয়েকজন

চরিত্রহীনের দেখা পেলাম, তারাও নষ্ট হয়ে গেছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি নে, প্রগতি আর সভ্যতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই. জীবনের বহুতর সৌন্দর্য আর সম্ভাবনার প্রতি আমাদের তিক্ত বিদ্রূপ তাই কেউ কোথাও নিঃস্বার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ করেছে শুনলে আমরা চমকে উঠতাম, কাউকে অকারণ ভদ্র ব্যবহার করতে দেখলে আমরা অবাক হয়ে যেতাম মানব-জাতির প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা। আমরা জেনেছিলাম এ পৃথিবী দুঃখের, পীড়নের, বেদনা ও নিরানন্দের। একদিন পরামর্শ করা গেল—চল, মদ খাওয়া যাক্. এ দুঃখ ভুলতে হবে। কিন্তু মাতাল হয়ে আরো দুঃখ বাড়লো, ভেতর আরো রিক্ত হয়ে উঠ্‌লো, সে আর সান্ত্বনা মান্‌লো না। আগে ব্যথা পেলে চোখে জল পড়তো, এবার অশ্রুও গেল শুকিয়ে। মদ্যপান ক'রে আমরা অনর্গল বক্তৃতা দিতাম, সে আমাদের মাতলামি নয় শ্রীমতী, আমাদের মর্মমূলের উন্মত্ত হতাশার কথা। মনে হ'তো, টুঁটি ছিঁড়ে সবাইকে জানাই কী যন্ত্রণা আমরা সইছি, বুকের হৃৎপিণ্ডটা কেটে বার ক'রে দেখাই কোথায় আমাদের অভাব, কোথায় আমাদের দারিদ্র্য। আমরা হলাম সমাজচ্যুত একদল ছন্নছাড়া। কিছুই আমরা মানতাম না। গুরুজনকে শ্রদ্ধা, ভদ্রলোককে সম্মান, স্নেহাস্পদকে প্রীতি—মনে হ'তো এ-সব অত্যন্ত বাজে, মৌখিক, বাহ্যিক, ফাঁকা—এগুলোকে আমরা নিতান্ত উপেক্ষায় এড়িয়ে গেলাম, কী হবে এদের প্রশ্রয় দিয়ে? লোকের অপ্রিয় হয়ে ওঠাই ছিল আমাদের গৌরব, কুখ্যাত হয়ে জীবনধারণ করাতেই ছিল আমাদের আনন্দ! আমাদের নিন্দায় যখন চারদিক মুখর হয়ে উঠতো, আমরা অতি আরামে তা উপভোগ করতাম, খুশি হতাম, গোপনে তাদের প্রশংসা করতাম। সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে কেউ একটা কুৎসিত কাজ করেছে শুনলে আমরা তৃপ্ত হতাম, একটা উল্লাস ভেতরে-ভেতরে আন্দোলিত হয়ে উঠতো। স্বদেশ, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, এদের সম্বন্ধে যখন

আমরা বক্তৃতা দিতাম, তখন আশেপাশে শ্রোতার দল মুগ্ধ হয়ে শুনে যেত, বলাবলি করতো, কী আমাদের গভীর পাণ্ডিত্য আর অন্তর্দৃষ্টি! তারপর তারা দেখতো আমাদের কথার সঙ্গে আমাদের কাজের মিল নেই, ভেতরের সঙ্গে বাহিরের ঐক্য নেই। তারা চটে যেত, আমাদের অধঃপতনের জন্যে দুঃখিত হ'তো, হয় ত বা একটু ব্যথাও পেয়ে যেত। কী করবো শ্রীমতী? যারা আমাদের সত্যি স্নেহ করতো আমরা তাদের সকলের চেয়ে বড় আঘাত করতাম, সে আঘাত ফিরে এসে আমাদেরই বুকে বাজতো, কিন্তু কোন উপায় ছিল না। যারা আমাদের শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো, তাদের উপর ছিল আমাদের হৃদয়হীন তাচ্ছিল্য, অকারণ অশ্রদ্ধা, মনে-মনে তাদের অনুকম্পা করতাম। পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। এ-পৃথিবীতে যে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ঋতুবালারা বরণডালা সাজিয়ে আনে, সোনার রোদ্দুরে যে শরতের নীল আকাশ ঝক্-ঝক্ করতে থাকে, এ আমরা ভুলে গেছি। বৈশাখের রোদে আমরা দেখেছি কুলি-মজুর কেমন সর্দিগর্মি হয়ে মরে, সাদা আকাশ তৃষ্ণায় কেমন হা-হা করতে থাকে, শ্রাবণের ঘন বর্ষায় দেখেছি ফুটো চালার নিচে জলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দরিদ্রেরা কেমন ক'রে দিন কাটায়, শীতে দেখেছি গায়ের কাপড়ের অভাবে ঠাণ্ডায় মানুষ কেমন করে কাঁপতে থাকে। মহামারীতে চোখের সুমুখে সব উজাড় হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষে, দুর্দিনে, মন্বন্তরে মানুষ শিশু-সন্তান বিক্রি করলো, পাছে অন্নের ভাগ দিতে হয় এজন্যে সন্তান হয়ে বৃদ্ধ পিতাকে গোপনে গলা টিপে হত্যা ক'রে দিল—শ্রীমতী, এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছি। দেখেছি আমরা অনেক। আমাদের হৃদয় মরে গেছে, মানুষের যত কিছু সুকুমার বৃত্তি সে আমাদের শুকিয়ে গেছে, আমরা ফতুর হয়ে গেছি! দেশের যৌবন আজ অবরুদ্ধ কারাগারে বন্দী হয়ে কাঁদ্‌চে, তার চোখে আলো নেই, তার নিশ্বাসের বাতাস নেই, তার প্রাণধারণের খাদ্য নেই। সে-যৌবন অপমানিত, লজ্জা তার চারদিকে, দৈন্য তার

পুঁজি, শাসন তার পাথেয়, সে মুক্তি পেল না। শ্রীমতী, মানুষের মতো মানুষ হয়ে সচ্চরিত্র হয়ে সুন্দর হয়ে বাঁচবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাঁচবার মত জায়গা কোথায়? এদের মধ্যে? এই দারিদ্র্য, এই লজ্জা, এই নৈতিক পঙ্গুতা, সংস্কারের গ্লানি, এই কদর্য রীতি, জঘন্য আচার—এদের মধ্যে বাঁচবো কেমন ক'রে? শ্রীমতী, অপমানে আত্মগ্লানিতে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মানুষকে মরতে দেখেছ? দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হতে দেখেছ? কেরোসিনের তেল গায়ে ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে নিরপরাধ নিরুপায় নর-নারীকে আত্মহত্যা করতে দেখেছ? দেখেছ শ্রীমতী, শিক্ষিত ভদ্র সম্ভ্রান্ত যুবক কেমন ক'রে রাত্রির অন্ধকারে রেল-লাইনের উপর গলা রেখে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকে? মা হয়ে সন্তানের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেয় কেন তা জেনেছ শ্রীমতী? তুমি কি জানো, এক মুহূর্তে কার জীবন কখন নির্মম ভাবে ব্যর্থ হয়, বিষাক্ত হয়?'

ঘরময় কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিয়া জহর উদ্বেলিত কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিল, 'পথে পথে ঘুরে বেড়াই শ্রীমতী, এখানে ওখানে বিদেশে বিভূঁয়ে পালিয়ে বেড়াই, ঝরা শুকনো পাতার মতো উড়ে বেড়াই। বনে, পাহাড়ে, সমুদ্রতীরে, নদীর চড়ায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাই, মানুষের মুখ দেখলে ভয় করে, বুকের মধ্যে একরকম শব্দ হতে থাকে। আমার স্বাস্থ্য যে তাদের হাতে, তারা ভাল না হলে আমার ত ভাল হবার উপায় নেই। তারা কুৎসিত বলেই ত আমার প্রাণ ধারণের এত গ্লানি। আবার ফিরে আসি, পরিবার-পরিজনের মধ্যে মিশে যাই, এদের জন্যে মায়া হয়। আমি একা—নিতান্তই একা। আমার সঙ্গে এদের সুদূর ব্যবধান, মাঝখানে আমাদের অপার সমুদ্র। ইচ্ছে করে সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরে একবার চিৎকার ক'রে বলি, আমাকে যা ভাবচ আমি নিতান্তই সে রকম মানুষ নই। আমিও ভালবাসতে পারি, সুন্দর সংসার রচনা করতে পারি, আনন্দ দান করতে পারি, এ পৃথিবীতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচবার

অধিকার কারো চেয়ে আমার কম নয়। কিন্তু না, তাদের ওপর ঘৃণা হয়! আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে জঘন্য অশিক্ষা, অজ্ঞান অনাচার, কদর্য ও অস্বাস্থ্যকর জীবন-যাত্রা। আমার আত্মীয়-স্বজন আমার জীবনের সব চেয়ে বড় লজ্জা শ্রীমতী। অথচ বেচারীদের কীই বা দোষ! তাদের এই অধঃপতনের জন্যে তারা যে একটুও দায়ী নয় এও ত সহজেই বুঝতে পারি! ঈশ্বরের নামে তারা শিখেছে ধর্মান্ধতা, সমাজের নামে শিখেছে মানুষকে উৎপীড়ন করতে, নীতির নামে শিখেছে আত্ম-প্রবঞ্চনা। দেবতা, মন্দির, লোকাচার, শাস্ত্র, নরকভীতি—এদের অত্যাচারে তাদের জীবন হয়েছে বিকল, যৌবন হয়েছে শক্তিহীন। অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রচার করতে এরা ভয় পায়, অপমানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে এদের সাহস নেই অবিচারের প্রতিকার করার সহজ শক্তি এদের ফুরিয়ে গেছে। শ্রীমতী, পরাধীন জাতি পদদলিত হয় তার নিজের অপরাধে, বহু যুগের পাপে, বহুকালের অন্ধতায়। তাই তাদের আত্মশুদ্ধি হয় পীড়ন এবং হিংসার ভিতর দিয়ে। তাদের হাতেই এদের মুক্তি যারা এদের চাবুক মারে, গলায় দড়ির ফাঁস টেনে প্রাণসংহার করে, জলে ডুবিয়ে খোঁচা দেয়, কুকুর দেয় লেলিয়ে, হিংস্র ক্রীতদাসকে উত্তেজিত করে ছেড়ে দেয় রাত্রির অন্ধকারে এদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার জন্যে।'

তাহার উত্তেজিত মুখখানার দিকে তাকাইয়া শ্রীমতীর চোখের দৃষ্টি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কম্পিত কণ্ঠে সে কেবল বলিতে পারিল, 'তারপর?'

'তারপর আর কিছু নেই শ্রীমতী, আমি একা, উদাসীন। সব থাকা সত্ত্বেও ভিখারী হয়ে রইলাম। যৌবন আমার গেল ব্যর্থ হয়ে। অনেক মেয়েকেও দেখলাম কিন্তু কী আছে তাদের? শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, হৃদয় তাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, জীবনের কোন উচ্চ আদর্শ তাদের নেই, তারা ভালবাসার কী বুঝবে? প্রেম বলতে

তারা বোঝে শুধু দুর্বল দেহ লালসা, আমিই বা ভালবাসবো কী দিয়ে শ্রীমতী? সর্বহারা নগণ্য বাঙ্গালীর ছেলে, যার অতীত জীবন অন্ধকার, আর ভবিষ্যৎ কুহেলিকাচ্ছন্ন, ক্লেদ-ক্লিন্নতা নিয়ে যার দিন কাটে, প্রেম সঞ্চারিত হবার মতো সেই উদার ব্যাপকতা তার বুকের মধ্যে কোথায়? আমি দেখলাম শুধু বন্দী সতীত্ব, কাম-জর্জরতা, সন্তান-ধারণের অক্লান্ত অধ্যবসায় আমি দেখলাম বিবাহিতা স্বামী-স্ত্রীর কুৎসিত জীবন-যাত্রা, প্রেম ত আমি জানি নে? প্রেম? সে ত শৌখিন সমাজের স্বপ্ন-বিলাস। এদেশে প্রেম কোথায়? যেটুকু আছে সেটুকু যে কাঁচা নাটক-নভেলের সামান্য পুঁজি মাত্র।

'ক্ষমা করো শ্রীমতী, কোনো ভদ্রমহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলাপ করা পর্যন্ত আমি ভুলে গেছি, ভেতরে মরচে ধরে গেছে। আমি ভালবাসবারো যোগ্য নই, ভালবাসা পাবারো উপযুক্ত নই। তোমাকে পেয়ে আমার কেবলি ভয় হয়েছে পাছে তোমার অসম্মান ক'রে ফেলি, পাছে তোমার এই সহৃদয় বন্ধুত্বের মর্যাদা না রাখতে পারি। তোমার দেওয়া কলঙ্ক আমি আজ মাথায় তুলে নিয়ে যাবো, আমি অসচ্চরিত্র, আমি চরিত্রহীন। এ আমার গৌরব নয় লজ্জা। যদি পারো আমায় ক্ষমা করো শ্রীমতী।'

ইতিমধ্যে শেষ চৈত্রের আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, অন্ধকারে কেহই এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য করে নাই। এবার অকস্মাৎ আকাশ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এক ঝলক বিদ্যুৎ ঘরের ভিতরটাকে ঝলসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল এবং দেখিতে-দেখিতে পরমুহূর্তেই গুরু-গুরু মেঘগর্জন করিয়া উঠিল।

বাহিরের দিকে তাকাইয়া শ্রীমতী ত্রস্ত হইয়া কহিল, 'কোথা যাবে তুমি?'

'নির্দিষ্ট কোথাও নয়, শুধু ঘুরে বেড়াবো ট্রেনে-ট্রেনে, মাসিক একটা মাইনেও পাবো।'

শ্রীমতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'আমি কী অপরাধ করলাম

তোমার কাছে? কী করেছি আমি তোমার? চলেই বা যাচ্ছ কেন?'

জহর একটু হাসিল। বলিল, 'তোমার অপরাধ নয় শ্রীমতী, আমার অযোগ্যতা। [illegible] আমার শ্রদ্ধা, তোমার অপূর্ব ব্যক্তিত্বকে নমস্কার করি। আমি আজ দূরে যাবো, পথে-পথে ঘুরে বেড়াবো নানা জটিল প্রশ্নের ভিড় ঠেলে চলবো, আর মাঝে-মাঝে এক-একবার মনে হবে তোমার কথা। তোমার সব থেকেও কিছু নেই, অথচ তুমি এত বড়। এমন নিষ্পাপ মেয়ে তুমি, অথচ এতখানি তোমার শাস্তি! তুমি কাজ করতে নেমেচ অথচ বাঁচবার আনন্দ তোমার নেই!' বলিয়া জহর উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে প্রবল ঝড়-ঝাপ্টার সহিত বড়-বড় ফোঁটায় চড় চড় করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ক্রুদ্ধ বন্য জন্তুর মতো বাহিরে বাতাসের প্রচণ্ড দাপাদাপি চলিতে লাগিল।

শ্রীমতী উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'আজ কি তোমায় যেতেই হবে? ডাকি আমি [illegible], [illegible] কথা ঠেলে যাও দেখি ত?'

জহর তাহার [illegible] তোমার অনুরোধই বড় শ্রীমতী। [illegible] আমাকে যেতেই হবে, আজই আমার সময়, দুর্যোগেই আমার [illegible]। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

'আর কি আসবে না? কবে আবার দেখা হবে?'

'হয় ত আবার আসতে হবে এবং সেই দিনই আসবো, যে দিন নিজের কাছে পরিষ্কার করেই জানবো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই শ্রীমতী। তোমার মতো নারীর পায়ে সেদিন নিজেকে আমি—' বলিতে বলিতে বারান্দা পার হইয়া জহর নীচে নামিয়া গেল।

দরজার একটা কপাটে গা হেলাইয়া শ্রীমতী নিশ্চল ও নির্জীব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, তাহার মুখে-চোখে রক্তের চিহ্নও নাই, জীবনের স্পন্দনও নাই।

চার বৎসর পরে

চার বৎসর পরে একদা রাত্রি জাগিয়া শ্রীমতী একখানি পত্র লিখিতেছিল :

প্রিয়—

এতকাল পরে তোমার পত্র পেলাম। পাবার আশা আমি করি নি; অস্বাভাবিক বলে নয়, অপ্রত্যাশিত বলে। চিঠি পেয়ে কি খুশি হয়েছি? জানি নে, বোধ হয় কতকটা দুঃখই পেয়েছি। তোমার ভাষা আমাকে নতুন কথা শোনালো, অর্থাৎ তুমি যা নয় তারই পরিচয় পেলাম।

যেদিন তুমি বিদায় নিয়েছিলে মনে পড়ে? নিশ্চয়ই পড়ে। পুরুষের মনে থাকে কেবল ঘটনাটা, আমাদের মনে থাকে ফলাফলটা। শুধু কি ফলাফলই? মেয়েরা ডুবে যায় আরো গভীরে। তারা চেয়ে থাকে ঘটনার পিছনে মনের দিকে, হৃদয়ের দিকে। এই জন্যেই তারা ভালবাসে গল্প, পুরুষেরা পছন্দ করে নাটক! চরিত্র-বিশ্লেষণে মেয়েদের একটা অদ্ভুত আনন্দ দেখা যায়, কিন্তু এখন থাক সে কথা। তোমার চিঠি আমার কানে কানে বললে, তুমি যা তুমি তা নও। কিছুকাল পূর্বে আমারও সে-কথা মনে হয়েছিল। তোমাদের চরিত্রের প্রোগ্রেস্ আছে, গতি আছে, আমাদের তা নেই। আমরা পাঁচেও যা, পঞ্চাশেও তাই। গোড়ায় আমাদের যে ফুল ফোটে, আগায় গিয়ে ধরে সেই ফুলেরই ফল। আমি জানি এই স্বীকারোক্তির ফলে মেয়েরা ছোট হবে না, তারা ছোট নয়, কিন্তু তারা সীমাবদ্ধ—যেমন সীমাবদ্ধ পৃথিবী। কিন্তু তোমরা? তোমরা হচ্ছ আকাশ—সীমাহীন। আমাকে পরিষ্কার ক'রে জানবার জন্যে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলে। তাই নয়? অপরকে জানতে গেলে নিজেকে আগে জানা দরকার। কিন্তু তার জন্যে বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়োজন ছিল না, নির্লিপ্ত হলেই চলতো। এক-

একজন মানুষ এমনি, তারা আত্ম-বিশ্লেষণ করে নিজেকে দূরে নিয়ে গিয়ে, গায়ে পথের হাওয়া লাগিয়ে। তাতে ফল হ'লো এই, তোমার কাছে আমি যা তাই রইলাম, তুমি গেলে আইডিয়ার দিক থেকে এগিয়ে। নিজের জীবনের সঙ্গে তোমার সমন্বয় ছিল না, এবার খুঁজে পেলে আইডিয়ার ঐক্য, আমিও তোমার মধ্যে পেলাম একটি সঙ্গতি। মেয়েমানুষ সঙ্গতির বড় ভক্ত।

কেমন আছি জান্‌তে চেয়েছ। ঠিক কেমন আছি বলা কঠিন। মেয়েরা কোন্ সময়ে কেমন থাকে বিধাতাও জানেন না। তার মানে এ নয় যে, তারা রহস্য দিয়ে ঘেরা, তারা যে রহস্যময় একথা তোমাদের মুখেই শুনি। ওটা তোমাদের কল্পনার চোখ। মেয়েদের রঙ নিত্যই বদলায়, সেটা রহস্য নয়, প্রকৃতি। আজ সন্ধ্যায় পাড়ার একটি মেয়ে বেড়াতে এসেছিল, যাবার সময় বলে গেল, পৃথিবীতে আমি সর্বাপেক্ষা সুখী। সেই কথাটা শোনা থেকেই ভাবচি আজই রাতে তোমার উত্তর দেবার সময়। তার কথাটা কেবলই খোঁচার মতো বিঁধছে। সুখী বলেও হয় ত স্বস্তি পাচ্ছি নে। অথচ দুঃখের চেহারাও ত চোখে পড়চে না, দুঃখ কিছু একটা থাকলেও না হয় তাকে নিয়ে একটু বিলাস করা যেতো, এখনকার দিনে ও া কাজেও লাগে; দুঃখের নানা ব্যাখ্যায় দেশের বাতাস আজকাল থম্-থম্ করছে। ফেনিয়ে একথা আমি বলতে চাই নে যে, আমার আরামের শয্যায় ফুটছে কাঁকর, সব থেকেও নেই—সেটা হবে সস্তার কবিত্ব। জীবনটা জীবনই—কবিত্ব তার একটা অংশ হতে পারে কিন্তু সমগ্রটা নয়। হ্যাঁ, আমি ভাল আছি। ভাল থাকবো না কেন বলো? আপাতত আমি শুধু নিশ্চিন্ত নয়, নিভৃত। তোমার পত্রখানি ঠিকানা-বদল হয়ে যেখানে এসে আমার হস্তগত হয়েছে, সে নতুন দেশ, নতুন তার পারিপার্শ্বিক। যে ঘরে শুয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি সে একটি পর্ণকুটীর, মাটি আর বাঁকারির দেওয়াল, বাঁশের খুঁটি, ভিতরে যৎসামান্য গৃহসজ্জা, টিম্-টিম্ ক'রে আলো জ্বলছে।

অবাক হ'লে—কেমন? অবাক আমিও হই। সর্বস্ব ত্যাগ করে এখানে এসে বাস করার একটা বিচিত্র আত্মপ্রসাদ আমি প্রায়ই অনুভব করি। এমন মনে ক'রো না, সব ছেড়ে দুঃখকে বরণ করেছি, সন্ন্যাস নিয়েছি—পুরুষের মত মেয়েদের ধাতুতে সন্ন্যাস নেই– ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে দারিদ্র্য বরণ করাটা উনবিংশ শতাব্দীর মনোবৃত্তি; দারিদ্র্য আমার নেই। হ্যাঁ, ঘর থেকে বেরোলেই দালান, দেশী ভাষায় এর নাম দাওয়া; তার নিচে মাটির উঠোন, কবিতায় যাকে বলে অঙ্গন। অঙ্গন-ভরা ফুল-ফলের গাছ, যেতে-আসতে ফুলের ছোট-ছোট গাছগুলো আমার আঁচল টেনে ধরে। বেড়ার গায়ে মাধবী-লতার ঝাড় মেঘের মতো ঘন হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। আগড় পার হলেই পথ। সেই পথ ধরে গিয়ে কাঁসাই নদীতে জল আনতে যাই, বেশ লাগে। কলসী ভাসিয়ে দিয়ে গলা-জলে নেমে জলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ছায়াও দেখি নে, তোমারও না দেখি আমারই চেহারা। ভিজে কাপড়ে যখন ফিরি, কাঁকালের ঘটজল উছলে গায়ে পড়ে। থাক্ আর ঠাট্টা নয়, কাছে থাকলে তুমি হয় ত একটা বেয়াড়া মন্তব্য ক'রে বসতে। কি করবো বল, কাব্যের মানবিক রূপটা মেয়েদের বড় প্রিয়।

আগে একটা বৈষয়িক কথা বলে নিই। আমি আমার ঐশ্বর্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। ও আমার ধাতে খাপ খায় না। রমাকে ডেকেছিলাম তার বিষয়ের ভাগ নিতে কিন্তু সে রাজি হয় নি! স্বামীর স্বোপার্জিত সম্পত্তি নিয়েই সে খুশি রইলো। আমার চারপাশে জনসাধারণের সমারোহটা তুমি দেখে গিয়েছিলে; জনসাধারণকে নিয়ে কারবার করার মত বিড়ম্বনা সংসারে আর কিছু নেই। সে-গল্পটা সামান্যই। লখিয়ার কথা তোমার মনে আছে ত? নিশ্চয় আছে; তুমি তাকে ভালবেসেছিলে। বাস্তবিক এমন সচ্চরিত্র, ভদ্র ও হৃদয়বতী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। বছর-দুই বাদে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম লখিয়ার গর্ভে একটি

সন্তান আসন্ন। আমি বুঝতে পারি নি আগে; যখন সত্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লো, এ-লজ্জা সে সইতে পারলো না, ভেবেছিল আমার কাছে তার মাথা চিরদিনের জন্যে বুঝি হেঁট হয়ে গেল সন্তান হবার পরেই হাসপাতালের ঘরে সে আত্মহত্যা ক'রে বসলো। এত কাছে থেকেও সে আমাকে চিনলো না, এত সহজেই বিচার ক'রে গেল। মানুষের নীতিবোধ এমনি। সামান্য প্রবৃত্তির জন্যে মানুষের বৃহত্তর উদারতাকে আমরা অপমান করি—এই বোধ হয় ছিল লখিয়ার বিশ্বাস। বিধবার সন্তান হওয়াও যে সংসারে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, এই কথাটাই সে নিঃশব্দে জানিয়ে গেল, জীবন দান ক'রে। লখিয়ার মরণে সেদিন বড় দুঃখ পেয়েছিলাম।

কিন্তু তার মৃত্যুর পরে হাওয়াটা গেল বদ্‌লে। আমার আশ্রয়ে সে ছিল, অতএব তার এই তথাকথিত দুর্নীতির জন্যে আমি দায়ী—এই বিশ্বাসে সকলের চোখে আমি ঘৃণ্য হয়ে উঠলাম। মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে কী ক্ষণভঙ্গুর তা সেদিন সুস্পষ্ট বুঝলাম। কলঙ্কের কালি তারা মাখালো আমার মুখে, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তুললো। তা তুলুক, কিন্তু যে-সন্তান লখিয়া রেখে চলে গেল তাকে আমি ফেলবো কেমন ক'রে? তার মা নেই, কিন্তু আমিও ত তার মা হতে পারি। সংসারের সকল দরজায় আমার মাথা হেঁট হয়েছে, মা হয়ে সে মাথা উঁচু হয় কিনা দেখা যাক্, তুমি কি বল? নারীপ্রকৃতির মধ্যে বাৎসল্যের স্থান সকলের আগে একথা যদি স্বীকার করি তবে আমাকে সেকেলে ব'লে ব্যঙ্গ ক'রো না, আমি প্রাচীন বৃক্ষের কোটরে নতুন বাসা বাঁধতে ভালবাসি। কিন্তু লখিয়ার ছেলেকে নিয়ে পড়লাম বিপদে—আশ্রয় নেই। বিস্মিত হ'য়ো না, সত্যই সেদিন মাথা রাখবার ঠাঁই ছিল না। অত বড় বাড়ি, জায়গা জমি, নগদ টাকা যা কিছু, যথাসর্বস্ব, সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে মহত্ত্ব দেখিয়ে গেছি, সব গেছে ট্রাস্টিদের হাতে—সেদিন তাই আমার দাঁড়াবার জায়গার অভাব। আর দাঁড়াবোই বা কেমন

ক'রে? নিন্দায় নিন্দায় আকণ্ঠ হ'য়ে তখন আমি সব ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

থাক্, বাকিটা তোমার আর শুনে কাজ নেই। দুঃখের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, তুমি বুঝবে আমার অন্তর-বাহিরের ইতিহাস।

আঘাতে আর সংঘাতে আমি পেয়েছি আমার জীবনের গতি। চারিদিকে এত সোরগোল, কিন্তু আমার মন তপস্যা করছে একটি নিভৃত জীবন—অনাড়ম্বর, নিশ্চিন্ত ও স্বল্পতুষ্ট। সংসারে এসে কোলাহল করেছি, দল গড়েছি, প্রচার করেছি, হৈ-চৈ করে লোক জড়ো করেছি, খ্যাতি ও যশ আদায় ক'রে বেড়িয়েছি, কিন্তু আমার মন তাতে বাঁধা পড়ে নি। আমার কেবলি ভাল লেগেছে একখানি একান্ত কুটীর, দু'একটি ফুলের গাছ, একটুখানি মিষ্টি আলো, সন্ধ্যার মেঘ—এরা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। আমি কেবলি চেয়েছি কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়, কেউ যেন আমাকে চিনতে না পারে, অপরিচিত নিরুদ্দেশে আমি যেন অদৃশ্য হয়ে থাকি।—একটুখানি কবিত্ব করলাম, ক্ষমা ক'রো।

তোমাকে চিঠি লিখ্‌ছি, চারিদিক আমার নিবিড় হ'য়ে এসেছে। এই চিঠি সাধারণ মানুষের হাতে পড়লে তারা মনে করবে, এ বুঝি বা একখানা শৌখিন প্রেম-পত্র। মনে তারা করুক, তাদের মনের দৃষ্টি নেই। তোমার সঙ্গে যে আমার ধাতুগত বিরোধ, আমাদের মধ্যে যে নিগূঢ় ভালবাসার সম্পর্ক নেই, এ কথা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিচার করার মতো নির্লিপ্ত মন আজকের দিনে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তোমাকে লিখ্‌ছি কিসের তাগিদে, ঘন অন্ধকার রাত্রি সে-রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে মুখ বুজে তপস্যায় বসেচে। রাতজাগা একটা পাখি ডাক্‌চে দূরে, বোধ হয় বাসা খুঁজে পায় নি; পোকা-মাকড়ের শব্দ শুন্‌চি, একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাক্‌চে, গাছের পাতার ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে চলেচে, একান্ত ক'রে কান পেতে

থাকলে কাঁসাই নদীর জলের শব্দও শোনা যায়। ঘরের মধ্যে টিম্‌-টিম্‌ ক'রে আলো জ্বলচে, সামান্য গৃহসজ্জা, খান-কয়েক সুন্দর বই, বিকালে-তোলা গুটিকয়েক গন্ধরাজ একটি গ্রামোফোন, মধ্যে কয়েকটি আমার প্রিয় পুতুল। ওদের মাঝখানে আমি নিজেও একটা বড় পুতুল। আমি ওদের নিয়ে খেলা করি, কিন্তু আমাকে নিয়ে যে খেলা করে তাকে আমি দেখতে পাই নে। আমার কোলের কাছে কে শুয়ে আছে, বুঝতে পেরেছ ত? দু'বছরের ফুটফুটে ছেলে, নাম রেখেছি সূর্যকুমার। ঘুমে কাতর, তবু হাসি ফুটে রয়েছে মুখে, মোমবাতির মতো নাক, বেগুনী রেশমের মতো চুল, চোখ দুটির উপর যেন দুটি কালো ভ্রমর এসে বসেছে। দেখে-দেখে তোমার মনে হবে যেন একটি নির্বাসিত রাজশিশু। এমন পরিচ্ছন্ন, এমন নিষ্পাপ, এ নির্মল রূপ আর কোথাও তোমাদের চোখে পড়বে না। এর পাশে শুয়ে কেমন একটা অদ্ভুত মোহ আমাকে পেয়ে বসে। নিজেকে চুপ-চুপি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি সত্যিই ওর মা নই? কে বলে? কেন ওর গায়ে গা ঠেকলে আমার বুকের দুই দিকে রোমাঞ্চ হয়? শরীরের স্নায়ুতন্ত্রীগুলোর মধ্যে কেন মধুর উত্তেজনা সঞ্চারিত হতে থাকে? কেন অপূর্বরসের আবেশে আমার সর্বশরীর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে? একে তোমরা কী বলো? বাৎসল্য? মাতৃত্ব?

মাটির সোঁদা গন্ধ পাচ্ছি; এই মাটিকে আমরা ভালবাসি, এ-মাটি পৃথিবীর। মাটির গন্ধ আমাকে ব্যাকুল করে, আমাকে দিশেহারা করে, আমার বন্ধনহীন আত্মাকে নিরুদ্দেশে নিয়ে যায়; এই আমার শিরায়-শিরায় সঙ্গীত জাগিয়ে তোলে, আমাকে বিভ্রান্ত করে, বিপর্যস্ত করে। যেদিন আমার দেহান্তর ঘটবে সেদিন এই প্রার্থনাই রেখে যাবো, ফের ফিরে এসে আমি যেন ঘাসের ডগায় একটি ফুল হয়ে ফুটি, বসন্তের ঝরাপাতা হয়ে যেন উড়ে বেড়াই, বালুকণার মত যেন কোথাও এই মাটিতে ছুঁয়ে থাকি—একে যেন

ছাড়তে না হয়। অযুত কোটি মানুষের পায়ের চিহ্ন রয়েছে এই মাটির বুকে, সেই অন্ধকার থেকে অন্ধকারের দিকে নশ্বর মানবজাতির পদরেখা যেন আমাকেও স্পর্শ ক'রে চলে যায়। এই মাটি আর এই পিতৃপরিচয়হীন শিশু— এই আজ আমার পথের পাথেয়, এদের নিয়েই আমি জীবনের দুঃখ ভুলবো। এ কথা বলতে আজ সঙ্কোচ করবো না, আমার জীবনের বসন্ত চলে গেছে, এবার নেমেছে বর্ষা; ফুলের দিন গেছে, এখন ফলের কাল—শস্য উৎপাদন হবার বেলা। নারীর জীবন এমনি। বসন্তে ছিল রঙ, বর্ষায় এলো রস। এই রসের দিগ্‌দিগন্ত প্রাণ-ধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে সৃষ্টি—পাই সঙ্গতি।

এইবার তোমার আসার সময় হয়েছে; প্রিয়, তুমি এসো। এই তোমার আসার কাল। তুমি কক্ষচ্যুত গ্রহ, পথের দিশা হারিয়েছে তোমার, তুমি অকৃতী ও অকরুণ, আমার কাছে এসো, আমি তোমার পরমায়ুকে সঞ্জীবিত করবো। তুমি আধুনিক যুগের প্রতীক—উৎপীড়িত ও অশান্ত, অতৃপ্ত আর বিক্ষুব্ধ—তোমাকে আমি চিনতে চাই, তুমি আপন সত্যকে প্রকাশ করো। জীবনকে বিকশিত করার সাধ্য তোমার নেই, আশায় জর্জর, ভাগ্যের দ্বারে চির-প্রত্যাখ্যাত—আলোকের পথ তোমার চোখে লুপ্ত হয়েছে, অনন্ত ক্ষুধা রুদ্ধ ক্ষোভে তোমার মধ্যে মাথা কুটে মরছে; হে পরাধীন, হে নবীন, হে ব্যর্থ তোমাকে আমি আশ্রয় দিতে চাই।

সত্যি, তুমি এসো। ঘর ক'রে রেখেছি তোমার জন্যে, ঘরের গায়ে আছে মালতীলতার বেড়া, দক্ষিণের পথ রেখেছি খোলা। সন্ধ্যার প্রথম তারা জেগে থাকবে তোমার জন্যে, প্রথম জ্যোৎস্না উঠে তোমার শিরশ্চুম্বন ক'রে যাবে; ধূপের ধোঁয়া আর কেয়াফুলের গন্ধে তোমার চোখে আসবে ঘুম। তৃষ্ণায় যখন জেগে উঠবে, মৃৎ-পাত্রে এনে দেবো ফলের রস, আমার যে সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে, তার জল এনে দেবো তোমার অঞ্জলিতে। শস্যময় প্রান্তরের তীরে

দাঁড়িয়ে নতুন ধানের মঞ্জরীর দিকে চেয়ে তোমার চোখে যখন লাগবে স্বপ্নঘোর, তখন গাছের ছায়ায় বসে বাজাবো রাখালিয়া বাঁশী। ঘৃণা রেখো না মানুষের প্রতি, অভিমান ক'রো না তাদের ওপর—তারা নির্বোধ, তারা অসহায়, অসীম সহানুভূতিতে তাদের সব অপরাধ ভুলে যেয়ো।

তোমার অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে তুমি লজ্জা পাও, কিন্তু সে তোমার মৃত অতীত, সে থাক্ পিছনে—সম্মুখের পথে সে যেন তোমার বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। তুমি অগ্রগামী, তোমার কাছে রহস্যময় ভবিষ্যৎ, সেই তোমার পাথেয়। আমি তোমার অতীতকে চাই নে, আমি চাই তোমার ভবিষ্যৎ, আলোকোজ্জ্বল অপূর্ব সম্ভাবনা। তোমার সেই অনাগত জীবন-গঠনের ভার আমি নিলাম।

আমার শরীর কেমন আছে জানতে চেয়েচ। থাক্ শরীর, আজ মনের কথা বলো। শরীরের হিসাব-নিকাশ আমি বন্ধ করেচি, এবার খুলেচি মনের খাতা; তার জমা খরচের তালিকা নতুন পথ ধ'রে চলে। রসের ভাষায় যাকে তোমরা বলো যৌবন, সে আমার শেষ হয়ে গেছে, এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ মেলে চাইতে পেরেছি। যৌবনে নানা সোরগোল, নানা চাঞ্চল্য—তখনকার জীবনে নিত্য উৎসব, নিরন্তর ব্যস্ততা, নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই, খরচের খাতা তখন খোলা। সেই যৌবনটাকে পার করে দিয়ে এবার স্বস্তি পেয়েচি, এবার হয়েচে ভাবাবিস্থিতি, নির্জন বিরাম। আমার শরীরে এখন আর কাব্যের প্রেরণা নেই, ইতিহাসের বৃত্তান্তই কেবল পাবে।

লিখেছ, আমি স্বপ্নবাদিনী। কথাটা মিথ্যা নয়। স্বপ্নই আমার সম্বল। স্বপ্ন দেখি নি এমন একটা দিন আমার বুকে পাথরের মতো চেপে বসে। প্রকাশ্য সংরক্ষণশীলতা এবং প্রচ্ছন্ন অসংযম মেয়েরা ভালবাসে—এও তোমার আর-এক অভিযোগ। কিন্তু এ-কথার উত্তর কাছে এলে দেবো। মেয়েরা ভক্ত আদর্শবাদের; তাদের

প্রিয়, আইডল্ আর আইডিয়াল। তোমাকেও জানি, তোমার আছে নিষ্ঠুর অবিশ্বাসবাদ, ঘোর সিনিক্ তোমার মন। ঈশ্বরের কথা তুমি হেসে উড়িয়ে দাও, মানুষ তোমার কাছে পাশবিকতার প্রতিমূর্তি, প্রেম তোমার চোখে অতি অসাধারণ দেহবিলাস, জীবন তোমার বিচারে কাঁচা-হাতে-লেখা বাজে একটা প্রহসন। কিন্তু এই সিনিসিজ্ম্-এর আয়নায় তোমার প্রতিফলিত চেহারা আমি দেখেছি। এ-পিঠে তুমি এই, ও-পিঠে তুমি ড্রীমার, রোমান্টিক, আবেগময়। কিন্তু এ-তর্কও তুমি এলে করবো।

আর নয়, রাত হ'লো ব'লে বলছি নে, বলছি যে তুমি আর দেরী ক'রো না, চলে এসো! বাইরের দিকে তোমার আর পথ নেই, তোমার শেষ আশ্রয় এবার অন্দরে। যুগসন্ধির তীরে দাঁড়িয়ে তুমি কী পেয়েছ? তোমার মধ্যে রয়েছে যে-শুভবুদ্ধি, কল্যাণ কামনা, তাকে প্রকাশ করবার পথ কি তুমি পাবে কোনোদিন? উদার মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের দরবারে নালিশ জানাবার আর শক্তি কোথায়?—একদিন যারা মানুষের অন্তরে বিচারবোধের দীপ জ্বালিয়েছিল, তাদেরই নির্বিচার বর্বরতায় সেই দীপের প্রাণ আজ কণ্ঠাগত; আশা করবার আর কিছু নেই। তাই আজ নিতান্ত কৃপণের মতো নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জীবনযাত্রার পথটা বেঁধে রেখেছি, এর বাইরে আর পা বাড়াবো না। দুঃখ যাদের আকণ্ঠ, অপমান ও লাঞ্ছনায় যারা চিরদলিত, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যারা সর্বস্বান্ত, এই প্রশান্ত সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দু'জনে যেন তাদের পক্ষে অলজ্জ অনাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারি, আত্মবিস্মৃত দম্ভের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার যেন বজায় রাখতে পারি। এই আমার শেষ কথা জানিয়ে তোমার পথ চেয়ে রইলাম। ইতি—

তোমার

বান্ধবী